প্রথম সংস্করণ

বৈশাখ ১৩৬৭

প্রকাশক :

রঞ্জন সেনগুপ্ত

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রণ :

প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

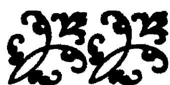
মানসী প্রেস

৭৩ মানিকতলা স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০ ০০৬

সুবীর রায় চৌধুরী
প্রিয়বরেষু

'আমার রবীন্দ্রনাথ'-এর পর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যা লিখেছিলাম, সে-সব ইতস্তত রচনা সংগৃহীত হল এ বইয়ে। এ বইয়ের 'রবীন্দ্রনাথ, না রবীন্দ্রনাথ' নামের প্রবন্ধটি কিন্তু আমার ঐ নামের সংকলনের ভূমিকা থেকে নেওয়া নয়। ঐ ভূমিকারই আরো বর্ধিত ও স্বতন্ত্ররূপ, পরিচয় সম্পাদক দেবেশ রায়ের অনুরোধে। ছাপতে দেওয়ার আগে কিছু প্রবন্ধে আরও কিছু সংযোজনের ইচ্ছে ছিল। ঘটনাচক্রে তার সময় জুটল না।



রবীন্দ্রনাথ : রক্তহীন স্মৃতি

সৃষ্টির যে-কোনো ক্ষেত্রে যাঁদের অবদান কালান্তরে হয়ে ওঠে সভ্যতার রূপান্তরেরই অপরিহার্য উপকরণ, সেই-সব বৃহৎ পরিধির মানুষকে কী ভাবে দেখব, অথবা দেখাব, এই সমস্যা, প্রায় বৃহৎ পরিধির মানুষের মতোই জটিলতর এবং বৃহৎ। নিজস্ব প্রাঞ্জল অথচ প্রগাঢ় ভঙ্গির 'দি আর্ট অব বায়োগ্রাফি' নামের লেখায় ভার্জিনিয়া উলফ একদা জানিয়েছিলেন—"জীবনচরিতকারকে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের অন্য সকলের চেয়ে আগে, অনেকটা খনিশ্রমিকের হাতের মুনিয়া পাখির মতো, পরিবেশকে যাচাই এবং মিথ্যা-অবাস্তবতা, গতানুগতিকতাকে অনুসন্ধান ও চিহ্নিত করে। তাঁর সত্যবোধ হবে জীবন্ত এবং জাগ্রত। এরপরও, যেহেতু আমরা এমন-একটা যুগে বসবাস করছি যখন হাজার ক্যামেরা তাক করে আছে প্রতিটি চরিত্রের উপর প্রতিটি কোণ থেকে, আর সেই সঙ্গে ঐ একই রকম কাজে লেগে আছে সংবাদপত্র, চিঠিপত্র এবং ডায়েরি, সেই কারণেই তৈরী হয়ে

থাকতে হবে চরিত্রদের একই মুখের নানা বিপরীত ভঙ্গিকে স্বীকার করে নিতে।'

জীবনচরিত রচনায় এর চেয়েও দুর্গম দিকের হদিশ পাই আমরা স্তেফান জাইগের "আডেপ্টস্ ইন সেলফ পোর্ট্রেচাস"-এর ভূমিকায়। আত্মচরিতের অসম্পূর্ণতা, গোপনতা অথবা ইচ্ছাকৃত মিথ্যাচারকে অতিক্রম করে একজন স্রষ্টার যথার্থ জীবনযাপনকে আবিষ্কার করার দুরূহ-দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ের দিকেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন তিনি সেখানে। আবার স্তেফান জাইগ যখন তাঁর অবিস্মরণীয় 'বালজাক' জীবনী রচনায় নিমগ্ন করেন নিজেকে, তখন তাঁর ঔপন্যাসিকসুলভ অনুসন্ধান ও অনুসন্ধিৎসার বিবরণ পেয়ে যাই আমরা ঐ বইয়েরই রিচার্ড ফ্রায়েডেনথলের ভূমিকা থেকে। বালজাক রচিত সমস্ত গ্রন্থাবলী আর মনোগ্রাফই নয় শুধু, তাঁর বিপুল পাণ্ডুলিপি-সংগ্রহের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায় বালজাকের সবচেয়ে মূল্যবান সেই সব ভল্যুমও, যেখানে নিজের পাণ্ডুলিপির সঙ্গেই বালজাক ক্রম অনুসারে সজ্জিত করে রেখেছেন ধারাবাহিক সংশোধিত প্রুফের কাগজও, যা সংখ্যায় গনণাহীন। তাব ফলে, নতুন-নতুন তথ্য আবিষ্কারের চাপেই, নিয়ত পরিবর্তিত হতে থাকে জাইগের মূল রচনা।

"The core of the book, which was continually being copied out fresh by his indefatigable wife and collaborator, was a mere nucleus for further additions. The note books and special files increased in number, lists and tables were prepared, the various Balzac editions and monographs in Zweig's possession were filled with underlinings, marginal comments, references and slips of paper. The small study of his house in Bath, into which he had moved shortly before the outbreak of war, became a Balzac Museum...a centre of information about Balzac."

এই সব অধ্যয়ন আমাদের চিন্তার অভ্যন্তরে এই ধারণাকেই সুস্থির করে তোলে, বড় মাপের কোনো মানুষের পূর্ণাঙ্গ এবং পরিপূর্ণ উদ্ঘাটন সম্ভব শুধু তখনই, যখন তাঁকে বিশদ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ জানার গরজটা হয়ে ওঠে আন্তরিকভাবেই প্রবল। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-রহস্যের পূর্ণাঙ্গ উন্মোচন বিষয়ে, যেহেতু আমাদের জাগ্রত বুদ্ধিকে আরো

গভীরতররূপে অভিজ্ঞ ও ঐশ্বর্যময় করে তোলার পক্ষে তাঁর ভূমিকা ব্যাপকতর হতে বাধ্য, এই বিশদ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ জানার গুরুত্ব প্রসঙ্গে প্রথম আন্তরিক আবেদন উত্থাপন করেছিলেন কবি বিষ্ণু দে। তাঁর সে রচনার নাম "রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসার গরজে"। নিজের মধ্যে, অবশ্যই নিজের সময়ের মননশীল পাঠক সমাজের প্রতিনিধিরূপেই, উৎসারিত ঐ গরজের সপক্ষে তিনি জানিয়েছিলেন—

"রবীন্দ্রনাথই একমাত্র জীবনের ও সাহিত্য-সংস্কৃতি-জীবনের কর্মী যিনি আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত বিকলাঙ্গ মানস জগতে সুস্থ আধুনিক মননের ও সভ্য-মানবতার বিস্তৃত উৎস-প্রতীক, যেন এক অবারিত বিশাল হ্রদ। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিজীবন ও মনোলোক প্রকাশ্য করায় নিজের একটা বাধা ও শালীনতার সীমা থাকায়, সে দায় আমাদেরই চেষ্টার দায়িত্বে বর্তেছে, আমাদেরই চেষ্টা করতে হবে সেই মনের বাস্তব জগত শ্রমে সন্ধানে চিন্তায় বিস্তৃতভাবে অন্তরঙ্গভাবে বোঝার জন্য হ্রদের গঙ্গা নামাবার জন্যে। অন্তত তাই হওয়া উচিত, আমাদের নিজেদের গরজেই, মানুষ হিসেবে, পাঠক-শ্রোতা-দর্শক হিসেবে, চৈতন্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে, বিশেষত এই কারণে যে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্বরূপ তাঁর উত্তরাধিকার—মহত্ব ও তাঁর

বৈশিষ্ট্য বা স্বাভাবিক সীমা-নির্দেশ আমরা এখনো যথোচিতভাবে মনেপ্রাণে জীবনে ব্যবহার করতে পারি নি।"

খুব সঠিকভাবেই বিষ্ণু দে তাঁর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার চরিত্রকে সুস্পষ্ট করে দিয়াছিলেন দুটি প্রায় বিপরীত বিশেষণে, মৌলিক এবং গৌণ। কারণ কবির জীবনের মোটা দাগের ঘটনাবলীর উপর নিবদ্ধ নয় তাঁর জিজ্ঞাসা এখানে। তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ কবির বৃহৎ জীবনের ছোট খাটো ঘটনার দিকেই প্রধানত, যাকে অলস প্রশ্ন মনে করলে ভুল হবে, কেননা নানাবিধ ছোট-মাপের ঘটনাবলীকে আবিষ্কার জানা এবং অধ্যয়নের মাধ্যমেই তাঁর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান পাবে নতুন শরীর, আমাদের জানা হয়ে যাবে, শুধু তাঁরই নয়, ঐ সুবাদে হয়তো বা' যে-কোনো মহৎ স্রষ্টারই নন্দনময়তার রহস্য। তাই বিষ্ণু দে তাঁর ঐ জিজ্ঞাসাজর্জর প্রবন্ধের সমাপ্তিতে পৌঁছে, শেষ স্তবকে, আমাদের আবশ্যিক রবীন্দ্রচর্চার পিছনে টাঙিয়ে দেন এক বিশ্ববোধের পটভূমি। 'অন্তত আমাদের পক্ষে বোঝা শক্ত নয় যে, একটা গোটা দেশের জীবনের এবং মানসের সত্তানির্ণয়ে রবীন্দ্র-কীর্তির বিস্তারের তুলনা দান্তের ইতালিতে নেই, যেমন নেই শেক্স্পীয়রের ইংলণ্ডে। রবীন্দ্র-চর্চা ব্যাপ্তিতে এক বিশ্বমানবের স্বদেশে ও বিশ্বে

একযোগে প্রয়োজনীয় পরিক্রমাই বটে—বিশেষ করে যখন আমাদের বিশ্বই বিমূঢ়, বেদনার্ত, মর্মে মর্মে উদ্‌ভ্রান্ত উদ্বাস্তু।'

অতি সম্প্রতি আমাদের হাতে এসেছে এমন দুটি বই যার বিষয় রবীন্দ্রনাথ এবং সেখানেও, বিষ্ণুদের মতোই, অবশ্য বিষ্ণু দের ব্যাপ্ত ও স্বভাবতই-গভীর উপলব্ধির সঙ্গে তুলনায় যা নিতান্তই আটপৌরে এবং শিকড়হীন, উত্থাপিত হয়েছে অজানা রবীন্দ্রনাথের উন্মোচন প্রসঙ্গ। বই দুটির লেখক-লেখিকা হলেন সৈয়দ মুজতবা আলী এবং মৈত্রেয়ী দেবী। মুজতবা অলীর বইটির নাম 'গুরুদেব ও শান্তি নিকেতন'। মৈত্রেয়ীদেবী-র 'স্বর্গের কাছাকাছি'। মুজতবা আলী তাঁর জিজ্ঞাসাকে পেশ করেছেন এইভাবে—

"আমার মনের উপর সবচেয়ে বেশি দাগ কেটেছে, গুণীজ্ঞানীর সঙ্গে তাঁর কথোপকথন, কখনো-কখনো সূর্যাস্ত থেকে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তর্ক, ভাবের আদান-প্রদান, আলোচনা। কিন্তু এই সমস্ত আলোচনায় তাঁকে সৃজনী সাহিত্যের (ক্রিয়েটিভ লিটারেচার) আঙ্গিকের (টেকনিক্যাল দিকের) আলোচনা করতে শুনি নি। যেমন 'বেলা'-র সঙ্গে 'খেলা' মিলের চেয়ে 'পূর্ণিমা সন্ধ্যায়'-এর সঙ্গে 'উদাসী মন ধায়' অনেক ভালো মিল কিংবা তার চেয়ে অনেক বড় সাধারণ,—লিরিকে কী গুণ থাকলে

কবি এমনই শব্দেরই সঙ্গে শব্দ বসাতে পারেন যার ফলে পাঠক-শব্দ-অর্থ-ধ্বনি সব-কিছু পেরিয়ে অপূর্ব নবীন লোকে উপনীত হয়। তাঁর বহু বহু গান শুনে মনে হয়, এই যে অভূতপূর্ব শব্দ-সম্মেলন, যার একটিমাত্র শব্দ পরিবর্তন করে অন্য শব্দ প্রয়োগ সম্পূর্ণ অসম্ভব—আর্টে এই পরিপূর্ণ সিদ্ধ হস্তের কৃতিত্ব আসে কি প্রকারে? তিনি কোন পদ্ধতিতে এখানে এসে পৌঁছলেন? কিংবা কোনো সুচিন্তিত পূর্ব-পরিকল্পিত পদ্ধতি যদি না থাকে তবে অন্তত সে পরিপূর্ণতায় পৌঁছবার পক্ষে নূতন-নূতন বাঁকে-বাঁকে তিনি কী দেখলেন, কী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন?...আমি যে পাঁচ বৎসর এখানে ছিলুম, তখন তাঁকে বহু-বহুবার সংগীতরাজ দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, খোশগল্প করতে শুনেছি। কিন্তু, যেমন মনে করুন, তাঁর প্রথম বয়সের অপেক্ষাকৃত কাঁচা কথাসুরের সম্মিলিত গান থেকে তিনি কি করে নিটোল গানের পরিপূর্ণতায় পৌঁছলেন সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে শুনি নি। স্বর্গত ধূর্জটিপ্রসাদ এবং শ্রীযুক্ত দিলীপ রায়ের সঙ্গে তিনি সংগীত নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন—এবং এখানকার শিক্ষক শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রীর সঙ্গে তো অহরহই হত—কিন্তু আমি এস্থলে যে বিষয়টি অবতারণা

আর মৈত্রেয়ী দেবীর অভিমান-মেশানো অভিযোগ
আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে, কবির ঘনিষ্ঠ
সান্নিধ্যলাভে কৃতার্থ যাঁরা, তাঁরা অনেকেই কবির
সম্পর্কে মৌন থাকাটাকেই মনে করে নিয়েছেন
যুক্তিযুক্ত। অর্থাৎ এ যেন পারস্পরিক লুকোচুরি।
এক পক্ষ ধরা দিতে অনিচ্ছুক। অপর পক্ষ যেন
বিগলিত করযোড়কে অধিকার অর্জনের মুঠোয়
রূপান্তরিত করতে না পেরে, ধরা ছোঁয়ার গণ্ডির
মধ্যে থেকেও, ধরতে অনাগ্রহী।
ধারনার এই রকম সংকটময়তায় পৌঁছে অন্য
একাধিক নতুন প্রশ্ন স্বভাবতই ব্যস্ত ডালপালা
ছড়িয়ে বসে আমাদের অনুসন্ধিৎসু ভাবনায়।
ঘটনাটা এমন নয়তো যে আমরা যাঁদের ভাবছি
কবির আপনজন অথবা কাছের অন্তরঙ্গ মানুষ,
তাঁরা কাছের মানুষ শুধুমাত্র দৈনন্দিনের
ব্যবহারিক সম্পর্কের সীমাবদ্ধতাতেই ?
ফলে এমন ঘটনা ঘটে নি তো যে, এই কাছের
মানুষগুলির অনেককেই কবির মনে হয়েছে তাঁর
নিজস্ব গভীরতর ভাষা-ভাবনা-সমস্যা-সংকট-
আলোড়ন-আন্দোলনের যোগ্য শ্রোতা, যথার্থ
সমঝদার ও উপযুক্ত বোদ্ধা হওয়ার পক্ষে অক্ষম
এবং অপ্রস্তুত ? আর তাহলে সেই
কারণেই কি তাঁকে সংগোপনে নির্বাচিত করে

নিতে হয়েছিল আপনজনের এমন একটি সংক্ষিপ্ত পরিমণ্ডল, অনেকখানি আত্ম-উন্মোচন সম্ভব শুধুমাত্র যাদের কাছেই ?

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করাটা অসঙ্গত হবে না যে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে প্রাথমিক আলাপের মুহূর্তেই স্বীকার করেছিলেন তাঁর ভীষণ নিঃসঙ্গতা। অবশ্য সেখানে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ছিল সারা এশিয়ার যোগ্য বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বশান্তি, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলন।

রোলাঁর মন্তব্য—

"আমার দুঃখ বেশি যে তিনি স্বীকার করেছেন তাঁর পাশে দ্বিতীয় হয়ে দাঁড়াতে কোনো ভারতীয় নেই, যে দুই শিষ্যের উপর তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস—তারা দুজনেই ভারতবাসী ইংরেজ।"

(সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অনুবাদ)

বলা বাহুল্য, এই দুই ইংরেজ আদৌ অপরিচিত নয় আমাদের। একজন এণ্ডরুজ, অপর জন এল্‌মহার্স্ট। আমাদের পক্ষে তাহলে কি এ-এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা নয় যে, সৃজনের নির্মাণের গঠনের ক্রমাগত রূপান্তরের সংঘর্ষ-সংগ্রামে নিয়ত-নিয়োজিত রবীন্দ্রনাথের একটি পূর্ণাঙ্গ অবয়বকে আকৃতিময় করে তোলার পক্ষে তাঁর নিত্য সহচররূপে পরিচিত ব্যক্তিদের রচিত অধিকাংশ স্মৃতিচিত্র এখন আর

ভূমিকা নিতে পারে না কোনো অপরিহার্য সহায়কের ? এক্ষেত্রে বরং ঘটে চলেছে উল্টোটাই। এই জাতীয় স্মৃতি-চিত্র এক আবোলতাবোল রবীন্দ্রনাথের অসম্পূর্ণ আকৃতিকেই আসল রবীন্দ্রনাথ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে ফুলের মালা, দীপের আলো, ধূপের ধোঁয়ার আড়ম্বরপূর্ণ আবহে। ব্যক্তিগত আবেগে আপ্লুত এই জাতীয় স্মৃতিচিত্রের রচয়িতারা কবির মহান এবং দিব্য সান্নিধ্যের তৃপ্তিকর বিবরণ শোনাতে যতখানি ব্যস্ত এবং শোনাতে পেরে যতখানি আত্মতৃপ্ত, ঠিক ততখানিই সুস্পষ্ট তাঁদের অনীহা কবির আত্মনির্মাণের সেই জাতীয় আনুপূর্বিক আলেখ্য রচনায়, যার প্রসঙ্গে বিষ্ণু দের উক্তি—"এ-রকম বিস্তৃতি ও সংলগ্নতা কোন্ ব্যক্তিস্বরূপ পেয়েছে কোন্ দেশে কোন্ যুগে ?"

একজন মহৎ স্রষ্টার সমগ্র কীর্তি চরম সার্থকতা লাভ করে তখন নয়, যখন পরবর্তীকাল প্রাথমিক পরিচয়ের বিহ্বলতায় তাঁর সৃষ্টির সম্মুখে অবনত হয় প্রণামে। সার্থকতা চরম উৎকর্ষে পৌঁছোয় তখনই, বৃহৎ স্থাপত্যের অভ্যন্তরে আরোহণ-অবরোহণের ভঙ্গিতে যখন শুরু হয় অনুপুঙ্খ প্রদক্ষিণ। অথচ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর এত বছর পরেও তাঁর সম্পর্কে পুস্তকাকারে যে-সব স্মৃতিচারণা, সেখানে উচ্ছ্বাসময় প্রণাম নিবেদনটাই প্রকট, অন্বেষণাতুর প্রদক্ষিণের

অভিপ্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। সেখানে তাঁকে দিব্য আভাময় দ্বিতীয় ঈশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত করার প্রধানতম আবেগই পাতায়-পাতায় টলোমলো যেন।

কোনো বৃহৎ মনীষা সম্পর্কে 'ঈশ্বর' এই উচ্চারণটিও নিতান্ত অজানা নয় আমাদের। ম্যাকসিম গোর্কি তাঁর 'লিটেরারি পোর্ট্রেটস'-এ টলস্টয় সম্পর্কিত স্মৃতিচারণার একেবারে শেষ পংক্তিতে উচ্চারণ করেছিলেন।

'This man is like God'

কিন্তু গোর্কির এই ঈশ্বর কোনো দিব্য আভার অবয়ব নয়। টলস্টয়কে যে গোর্কির ঈশ্বরসদৃশ্য মানুষ মনে হয়েছিল তার প্রধানতম কারণ এইটাই যে টলস্টয়ের রক্ত-মাংসময় জৈবিক অস্তিত্বেই তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন জীবন-সংক্রান্ত যাবতীয় অনুভূতি এবং সমস্যার নিছক প্রতিফলনই নয় শুধু, তাদের সঙ্গে বোঝাপড়ার রক্তাক্ত সংগ্রাম। গোর্কিকে শ্রদ্ধাবনত করে তুলেছিল টলস্টয়ের সত্তার অন্তর্গত সেই প্রবল প্রলয়, নিজের যাবতীয় স্ববিরোধিতাকে ভেঙে যথার্থ সত্য-উপলব্ধির সূর্য-কিরণে স্নাত হওয়ার দিকে যা তাঁকে এগিয়ে নিয়ে গেছে ছিন্নভিন্ন প্রশ্ন-যন্ত্রণার ধুলো-কাদার এবং পাঁকের পথরেখায়। টলস্টয় সম্পর্কে গোর্কির 'ঈশ্বর' উচ্চারণে আমরাও যে মিলিয়ে দিতে

পারি আন্তরিক সমর্থন, তার কারণ গোর্কির টলস্টয় আপাদমস্তক একটি মানুষ, যে মানুষ নিজের জীবনের নরক-পরিক্রমাকেও গোপন রাখতে কুণ্ঠিত নন কোনোখানে। আর এই সূত্রে গোর্কির মারফত আমরা যেন পেয়ে যাই বৃহৎ মানুষকে চিনে নেওয়ারও সংকীর্ণতামুক্ত এক বাস্তু-বোধ।

Lev Tolstoi was a great man, and the fact that nothing human was alien to him........ It would be psychologically perfectly natural for great artists to be greater in their sins than the common ruck of sinners. In some cases we see that this is so.'

২

মুজতবা আলীর 'গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন' বইটি দু-ভাগে ভাগ করা। প্রথমভাগেই 'গুরুদেব', যা চোদ্দটি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। সূচনাতেই, সম্পাদক পক্ষের নিবেদনে, আমরা পেয়ে যাই এই তথ্য যে বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘদিন রবীন্দ্র-সাহচর্যে ধন্য লেখকের সংখ্যা বড়ই সীমিত। আর এই প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশীর পরেই, তাঁদের সিদ্ধান্তে, দ্বিতীয় নাম মুজতবা আলী।

মুজতবা আলীর রচনার শুরুতেই, ব্যক্তিগত রবীন্দ্রনাথ না কাব্যতত্ত্বের রবীন্দ্রনাথ, কোন দিকটিকে বেছে নেবেন তা নিয়ে ঈষৎ দ্বিধাকাতরতা। তিনি নিজে চেয়েছিলেন যে, "কয়েক বৎসর রবীন্দ্রনাথকে যে তাঁর প্রাত্যহিক জীবনে সহজ, সরলভাবে পেয়েছিলুম সে কথা একেবারে অপ্রকাশিত রাখব।"

এবং একটু পরেই

"আপনারা বলবেন, রবীন্দ্রাথের সঙ্গে তোমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথা বাদ দাও, তাঁর কাব্য আলোচনা কর। উত্তরে আমি বিনীতভাবে বলতে চাই—সে তো সহজ কর্ম নয়....তবে আর কিছু না হোক, এ আমি নিশ্চয় করে জানি যে, আমার মনোজগৎ রবীন্দ্রনাথে গড়া। প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে বলুন, দর্শন, কাব্য, ধর্মের ভিতর দিয়ে বহুর মধ্যে একের সন্ধান বলুন, কালিদাস, শেলী, কীট্‌সের কাব্যের ভিতর দিয়ে বিশ্বসাহিত্যের রসাস্বাদই বলুন—আমার মনোময় জগৎ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। জানা-অজানায় গঠিত—আমার চিন্তা, অনুভূতির জগতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। জীবনের ক্রমবিকাশ পথে নানা দিক থেকে রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। কিন্তু সেই কাব্য-সৌন্দর্যের বিশ্লেষণ কতটুকুই বা করতে পারি? তাই এতদিন সে চেষ্টা করি নি।

কিন্তু 'দেশে'র ডাকে তো নীরব থাকতে পারলাম না। তাই রবীন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থায় আমার অক্ষমতা-নিবন্ধন যা করতে পারি নি, আজ তাঁর জীবনান্তে সেই ব্রত উদযাপন করতে ব্রতী হয়েছি।"

এই দু-দফা উক্তি থেকে আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের কাছে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে 'গুরুদেব' অংশে ব্রত পালনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, ব্যক্তিগত রবীন্দ্রনাথ নয়, তাঁর কাব্য-সৌন্দর্যের বিশ্লেষণটাই হয়ে উঠবে প্রধানতম বিষয়। কিন্তু পাঠ্যবস্তুর ভিতরে অগ্রসরতার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের বিস্মিত করে দুই বিপরীত ঘটনা। এক, তাঁর রচনায় এসে যাচ্ছে ক্রমাগতই ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ। দুই, তাঁর নির্দিষ্ট ব্রত-উদ্‌যাপনের প্রতিশ্রুতি থেকেও স্বেচ্ছায় সরে আসতে চাইছেন তিনি। নিজের স্বীকারোক্তিই তাঁর দ্বিধা-গ্রস্ততার চরম দৃষ্টান্ত। 'গুরুদেব' অংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতেই—

"রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য পেয়েছিলুম, তাই যদি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে দেখি তাহলে আশা করি, সুশীল পাঠক এবং সহৃদয়া পাঠিকা অপরাধ নেবেন না।"

তিন নম্বর অধ্যায়ের আরম্ভে—

"রবীন্দ্রনাথের শিষ্যদের ভিতর সাহিত্যিক হিসাবে সর্বোচ্চ আসন পান শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী। তিনি যে রকম রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য পেয়েছেন

সবচেয়ে বেশি, তেমনি বিধিদত্ত রসবোধ তাঁর আগের থেকেই ছিল। ফলে তিনি সরস, হালকা কলমে রবীন্দ্রনাথের দৈনন্দিন জীবন, খুশ গল্প, আড্ডা-মজলিশ সম্বন্ধে যা লিখেছেন তারপর আর আমার কিছু লিখবার মতো থাকতে পারে না।"

পঞ্চম অধ্যায়ে—

"আমার বলতে ইচ্ছে করে সেই জিনিস, ইংরেজিতে যাকে বলে লাইটার সাইড, এই যেমন মনে করুন, তিনি গল্পগুজব করতে ভালবাসতেন কিনা, প্রিয়জনদের সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করিতেন কিনা, ডাইনিং রুমে বসে চেয়ার টেবিলে ছুরি কাঁটা দিয়ে ছিমছাম ভাবে সায়েবী কায়দায় খেতেন, না রান্নাঘরের বারান্দায় হাপুস হুপুস শব্দে মাদ্রাজী স্টাইলে পাড়া সচকিত করে পর্বটি সমাধান করে সর্বশেষে কাবুলী কায়দায় ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে ঢেকুর তুলতে-তুলতে বাঙালি কায়দায় চটি ফটফটিয়ে খড়কের সন্ধানে বেরোতেন? কেউ তাঁকে প্রেমপত্র লিখলে তিনি কি করিতেন? কিংবা ডিহি শ্রীরামপুর দুই নম্বর বাই লেন তাদের কম্বল বিতরণী সভায় তাঁকে প্রধান অতিথি করার জন্যে ঝুলোঝুলি লাগালে তিনি সেটা এড়াবার জন্যে কোন্ পন্থা অবলম্বন করতেন? কিংবা কেউ টাকা ধার চাইলে?"

মুহূর্তেই তাঁর মনে পড়ে যায় টাকা ধারের
একটি কাহিনীর, যার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন
তিনি। প্রমাণ গুরুদেবের মুখ সে কাহিনী
শুনে—

"শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, নেপালচন্দ্র রায়
ইত্যাদি মুরুব্বীরা অট্টহাস্য করেছিলেন। আমরা
অর্থাৎ চ্যাংড়ারা থামের আড়ালে ফিক্‌ফিক্
করেছিলুম।"

অবশ্য এর পরেই তাঁকে যোগ করতে হয় আরো
কয়েকটি কথা।

"এ গল্পটি আমি একাধিক লোকের মারফত
পরেও শুনেছি। হয়তো তিনি (অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ)
গল্পটি একাধিক সভা-মজলিসে বলেছেন।"

মুজতবা আলীর ক্ষেত্রে এ-এক ট্রাজেডি যে,
প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হিসেবে তিনি আমাদের প্রায়শই
যা শোনান, তার অধিকাংশই শেষ পর্যন্ত হয়ে
যায় অন্যের মুখে শোনা কথা। 'দেশ' পত্রিকার
একটি বিতর্কিত আলোচনায় তার পাকাপোক্ত
সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়ে গেছে ছাপার হরফে।

ফলে কোনো-একটি ব্যক্তিগত কাহিনী শোনাবার
পরই তাঁর লেখায় 'শোনা কথা'-র ইশারা-
ইঙ্গিতটা এসে যায় অনেকটা আত্মরক্ষার
গরজেই। আর তাঁর এই ১৪৪ পাতার বইয়ে

খুঁজলে সম্ভবত "শোনা কথা"-র উল্লেখও পাওয়া যাবে ১৪৪ বার, বিশেষ করে 'শান্তিনিকেতন' অংশে।

ছড়ানো ডালপালা থেকে মূল বা শিকড়ের দিকে নামা যাক এবার। এ বইয়ের "গুরুদেব" অংশের চোদ্দটি অধ্যায়, কোথাও সুস্পষ্ট নামোল্লেখ না থাকলেও, অনুমান করে নেওয়া যায় বিবিধ পত্র-পত্রিকার তাগিদে বিভিন্ন সময়ে রচনা করা। তবে সব কটি রচনার মূল অভিপ্রায় যে রবীন্দ্রনাথের একটি পূর্ণাবয়ব আকৃতি-নির্মাণ, তা সম্পাদকদ্বয়ের "নিবেদন" এই স্বীকৃত।

"...যদিও তিনি বলিতেন, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিভিন্ন স্থানে প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সাজাইয়া সম্পাদন করিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ স্মৃতি-গ্রন্থের রূপ দেওয়া বিশেষ আয়াসাধ্য নয়।"

স্মৃতিগ্রন্থই যে এ-বইয়ের যথার্থ বিশেষণ, সে-বিষয়ে রচয়িতার এবং সম্পাদকদ্বয়ের ধারণার সঙ্গে একমত হতে বিশেষ বিলম্বও ঘটে না আমাদের। আচমকা শেলী, কীট্স, মহুয়া, বলাকা, জর্মনীর 'লীডর গান', বেটোফেন, বেদান্ত, কাণ্ট, গীতাঞ্জলি, ইয়োরোপ, ইয়েটস, ফ্লবের, মোপাসাঁ, চেখফ্, টলস্টয়, গোর্কি, রবীন্দ্র রচনাবলী-জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ ইত্যাদির প্রসঙ্গ সত্ত্বেও, এবং ঐ সব প্রসঙ্গে পারম্পর্যহীন ও

প্রাসঙ্গিকতাহীন, অনেকটা হরির লুটের বাতাসা ছড়ানোর মতো এলোমেলো ভঙ্গিতেই, বহুশ্রুত মামুলি এবং মোটা দাগের মন্তব্য অথবা দায় সারা তাত্ত্বিক সাজার কষ্টকর প্রয়াস থেকেই আমরা বুঝে যাই ব্যক্তিগত রবীন্দ্রনাথ অথবা কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে স্মৃতিচারণাই তাঁর মর্মমূলের প্রকৃত সদিচ্ছা। বারো নম্বর অধ্যায়ে অকপটে উল্লেখও করেন সে কথা, অনেকটা অভিযোগের মেজাজেই। 'রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বহু প্রতিষ্ঠান নানা পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করছেন। এঁদের অন্যতম প্রতিষ্ঠান এই সম্পর্কে একটি শর্ত আরোপ করেন যে, কোনো লেখক যেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ের উপলক্ষ করে কোনো রচনা না পাঠান। এই প্রতিষ্ঠানটির মনে হয়তো শঙ্কা ছিল, রবীন্দ্রনাথের নাম করে এঁরা হয়তো নিজেদের আত্মজীবনী লিখে বসবেন। শঙ্কাটা কিছু অমূলক নয়। কিন্তু এ-শর্তের ভিতরে একটা গলদ রয়ে গেল। এই প্রথম শতবার্ষিকী উপলক্ষেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথা উল্লেখ করা যাবে—দ্বিতীয় জন্মশতবার্ষিকীর সময় এত দীর্ঘায়ু কেউ থাকবেন বলে ভরসা হয় না। কাজেই এই শতবার্ষিকীতে কেউই যদি মানুষ

রবীন্দ্রনাথকে কী ভাবে চিনেছিলেন, সে কথা না লেখেন, তবে দ্বিতীয় শতবার্ষিকীতে যাঁরা আজকের দিনের প্রকাশিত প্রবন্ধাদি পড়ে মানুষ রবীন্দ্রনাথের মূর্তিটি নির্মাণ করতে চাইবেন, তাঁরা নিশ্চয়ই বিক্ষুব্ধ হবেন।”

মানুষ রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর এই অন্তঃশীল আগ্রহ এবং রচনার মধ্যে থেকে-থেকেই ব্যক্তিগত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় উদ্‌ঘাটনের সদিচ্ছা-ঘোষণা, আমাদের প্রত্যাশাকে ক্রমশই পুষ্ট করে তোলে দৈর্ঘে এবং প্রস্থে। কিন্তু তাঁর রচনার পর্ব-পর্বান্তরে যতই এগোতে থাকি, ততই আমাদের হতাশার রঙ, যেভাবে জাম পাকে, সেইভাবে ফ্যাকাশে হলুদ থেকে গাঢ় মেহগনির দিকে এগিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আমরা বুঝে উঠতে পারি না, এই ছেষট্টিটি পৃষ্ঠায় এবং চোদ্দটি পরিচ্ছেদে কোন্ অজানা রবীন্দ্রনাথকে জানানোর জন্যে ব্যগ্র তিনি এবং কেন বারংবার এত জানানোর ব্যাকুলতা। কয়েকটি অধ্যায়ে আবার ব্যক্তিগত রবীন্দ্রনাথের বদলে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন প্রসঙ্গে এমন আল্‌টপ্‌কা প্রসঙ্গে চলে আসেন, যথা কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যা, পুত্র-কন্যাদের অকালমৃত্যু, যা মূলত প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের

রবীন্দ্র-জীবনী থেকেই খামচা করে তুলে নেওয়া।
এমন-কি সেখানেও আলোড়িত-অনুভূতির এমন-
কোনো রোদ্দুর এসে পড়েনা, যার ফলে এইসব
মর্মান্তিক ঘটনায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ার
কোনো গোপন স্পন্দন অজানা-অন্ধকার থেকে
পেয়ে যাবে প্রকাশযোগ্য তাৎপর্য।
হাস্যকররূপে এলোমেলো, অপ্রাসঙ্গিক আত্মকথনে
অসংলগ্ন, উদ্দেশ্যের বীজ এবং নির্মিত ফসলের
মধ্যে নিরন্তর বিরোধিতায় বিশৃঙ্খল এই বইটি
শেষ পর্যন্ত আমাদের পৌঁছিয়ে দিতে চায় দুটি
সুস্থির সিদ্ধান্তে।
১। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ব্যাপক
দূরত্ব।
২। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর যৎকিঞ্চিৎ ধারণা এবং
যৎপরোনাস্তি অনাগ্রহ অথবা কৌতূহলহীনতা।
প্রমাণের জন্যে অন্য-কোনো দলিল-দস্তাবেজ
ঘাঁটার প্রয়োজন নেই, 'গুরুদেব' রচনাটিই
যথেষ্ট।
রবীন্দ্রনাথ তখন জার্মানের মারবুর্গে। কাছাকাছি
আছেন জেনেই অমিয় চক্রবর্তীর
মারফত ডেকে পাঠালেন মুজতবা আলীকে। এর
পরবর্তী দৃশ্য মারবুর্গের জনসভা। রবীন্দ্রনাথ
সেদিন সেখানে, মুজতবা আলীর ভাষায়, ঘন-ঘন

সাপ খেলানোর বাঁশি বাজালেন, জার্মানির তাবৎ গুণী-জ্ঞানী-মানী তত্ত্ববিদ্‌দের মন্ত্রমুগ্ধ করে, তাঁর দীর্ঘ এক ঘণ্টার বক্তৃতায়। সভাশেষে জনতার মাঝখানেই লেখক প্রণাম করলেন গুরুদেবকে। 'বিশাল জনতার উদ্বেলিত প্রশংসা-প্রশস্তি পাওয়ার পরও', গুরুদেব লেখককে প্রশ্ন করলেন, 'কি হল?' লেখক নিরুত্তর। পরবর্তী দৃশ্য, শহরের হোটেল, সেখানে গুরুদেব উজির নাজির-কোটাল পরিবৃত। লেখক হোটেল থেকে বিদায় নিতে চাইলে অমিয় চক্রবর্তীর মন্তব্য, 'সে কি কথা, দেখা করে যান।' লেখক—'তাহলে আপনি গিয়ে বলুন'। অমিয় চক্রবর্তী—'সে তো আর পাঁচজনের জন্য। আপনি সোজা গিয়ে নক্ করুন।'

গুরুদেব তখন ক্লান্ত। লেখককে দেখেই হাসিমুখে প্রশ্ন, 'এত রোগা হয়ে গিয়েছিস কেন?' লেখক নতমস্তক। এরপর কিছু কথাবার্তা হল, লেখকের লেখাপড়া সম্বন্ধে। লেখক যখন উঠতে যাচ্ছেন তখন গুরুদেব অমিয় চক্রবর্তীকে ডেকে, 'অমিয় একে ভালো করে খাইয়ে দাও।'

বাকি অংশ স্বয়ং লেখকের জবানিতে—

"জানি পাঠকমণ্ডলী এই তামসিক পরিসমাপ্তিতে ক্ষুব্ধ হবেন। কিন্তু সোক্রোতোসের চোখে যখন মরণের

ছায়া ঘনিয়ে এল আর শিষ্যেরা কানের কাছে চিৎকার করে শুধোলেন, 'গুরুদেব, কোনো আদেশ আছে?' তখন সোক্রোতেস বললেন, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। পরশুদিন যে মুর্গীটা খেয়েছিলুন তার দাম দেওয়া হয় নি। দিয়ে দিয়ো।' এই সক্রেতিসের শেষ কথা। সব দিকে যাঁর দৃষ্টি তিনিই তো প্রকৃত গুরু এবং তাও মৃত্যুর পূর্বে।"

এই তুলনামূলক মন্তব্যের ছেঁদোমি অথবা নিকৃষ্ট স্তরের দার্শনিকতাকে কটূক্তি হেনে বিদ্ধ করার পরিবর্তে বরং তুলতে চাই ভিন্ন প্রশ্ন। লেখক যে জার্মান ভাষা জানেন তা রবীন্দ্রনাথের অজানা নয়। রবীন্দ্রনাথ যে গ্যেটে এবং হাইনের অনুরাগী তাও অজানা নয় লেখকের। অথচ কী আশ্চর্য, লেখককে ডেকে পাঠিয়েও রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে জার্মান সাহিত্য-সংস্কৃতি-সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়ে বিন্দুমাত্র জানার আগ্রহ প্রকাশ করলেন না সেদিন অথবা জার্মান-বসবাসের অন্য কোনোদিন। কেন করলেন না? ভুল অভিজ্ঞতা লাভের সম্ভাবনা আছে ভেবে? লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার অপরিপক্কতা সম্বন্ধে তিনি বহু পূর্ব থেকেই সচেতন বলে? ম্যাকসিম গোর্কির 'লিটেরারি পোর্ট্রেট'-এ শুধুমাত্র টলস্টয় সংক্রান্ত রচনার পৃষ্ঠা সংখ্যা চুরানব্বই। সেখানে প্রত্যেকটি পৃষ্ঠায় গুরু এবং

শিল্পের ভঙ্গিতে যে অন্তরঙ্গ আলাপ, তার
প্রত্যেকটি অক্ষরে দু-পক্ষেরই জীবন এবং
সাহিত্য-বোধের কী আলোড়নময়, যেন
অন্তর্গত ঝঞ্ঝার শুদ্ধতার সন্ধানেই, আত্মউন্মোচন।
এই দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে যখন মুজতবা আলীর
'গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন'-এর বিশেষ করে গুরুদেব
অংশ পাঠ করি, তখন প্রবল আক্ষেপ চেতনার
ভিতরে ধিক্কারের ভঙ্গিতে বলে ওঠে, অক্ষমের এমন
বাগাড়ম্বর শুধু এই বাংলা ভাষাতেই সম্ভব।
আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই বইয়ের এক জায়গায়
মুজতবা আলী লিখেছেন—"আমার মূল বক্তব্য,
চিন্তার জগতে রবীন্দ্রনাথ কাদের সঙ্গে
বিচরণ করতেন।" আলী সাহেবের এই
বইটি পড়ে কাদের সঙ্গে বিচরণ করতেন
না তার একটি নির্দিষ্ট নাম জেনে যাওয়াটাই
শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে চূড়ান্ত লাভ। কারণ সমগ্র
বইটিকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলী সাহেবের চিন্তাশীল
আলাপ-আলোচনার, অগ্নিতাপ তো দূরের কথা,
কণামাত্র ফুলকিও ওড়ে নি কোনোখানে।

৩

'স্বর্গের কাছাকাছি'-তে মৈত্রেয়ী দেবী আদ্যোপান্ত
বড়ই অকপট। সরলপ্রাণা গ্রাম্য মহিলার যেমন

মনের অথবা পেটের যাবতীয় উদ্‌গত বাক্যরাশিকে সবিস্তারে উদ্‌গীরণে মহাসুখ, মৈত্রেয়ী দেবীর এ বইটিও সেই রকম সুখের কাছাকাছি। রবীন্দ্রনাথ একদা একটি কবিতায় লিখেছিলেন, 'আমার কবিতা জানি আমি, গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী'। সেটি পড়ে একদা মৈত্রেয়ী দেবী রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, কী দরকার ছিল আপনার এ-কথা লেখবার। আর কত বহুমুখী হতে পারে রচনা? নিন্দুকেরা সুবিধে পেয়ে যাবে, বলবে উনি তো নিজেই লিখে গেছেন সাধারণ মানুষের কথা উনি লিখতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের জবাব যাই হোক, মৈত্রেয়ী দেবী সম্ভবত তখন থেকেই মনে-মনে প্রস্তুত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত নিজের রচনায় সর্বত্রগামিতা সম্পাদনে, যাতে নিন্দুকেরা কোনো সুবিধে পেয়ে বলতে না পারে, রবীন্দ্রনাথের অমুক বিষয়টা তিনি লিখতে পারেন নি। তবে আগেই উল্লিখিত যে, এ বইয়ে তিনি আদ্যোপান্ত অকপট। তাই কী কী লিখতে পারেন না তা নয়, কী-কী লিখতে চান না তা নানাভাবে জানিয়ে দিতে দ্বিধা করেন নি বিন্দুমাত্র। ভূমিকা থেকেই এই জ্ঞাপনের শুরু।

"বইখানা আমার নিজের জন্যই লেখা, তবু রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে সব কিছুতেই বাংলাভাষী

মানুষের অধিকার আছে মনে করে ছাপানো গেল।"
অন্যত্র—
"কবির শেষ বয়সের চিঠিগুলি অবলম্বন করে এই যে চিত্রটি রচনা করছি তাতে পাঠক হয়তো কোনো গভীর জটিল তত্ত্ব পাবেন না। কোনো সমস্যার আলোচনাও পাবেন না। রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি কিছুই নেই—
আছে এক অস্তোন্মুখ বিরাট প্রতিভার অন্তরাত্মার সাক্ষ্য—রোগে-বার্ধক্যে যিনি অপরাজিত—ভালোবাসার অকৃপণ উৎসই যাঁর সমস্ত শক্তি, সমস্ত প্রেরণার মূল। আমার পাঠক সেই কবিকেই পাবেন যিনি ক্ষুদ্রতম মানুষের ভক্তি ভালোবাসাকে 'প্রকৃতির দানের' মতো 'রসপূর্ণ আকাশের বাণী'-র মতো গ্রহণ করতে পারেন।" আরেকবার—
"এই সময় (১৯৩৯-এ তৃতীয় বার মংপুতে যখন) দেশের রাজনীতি, জাপানের চীন আক্রমণ, ইয়োরোপের যুদ্ধের করাল ছায়া এই সব সর্বদা তাঁর মন অধিকার করে থাকত। যারা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে লিপ্ত আছেন তারাও এ-সবে ব্যক্তিগতভাবে বিচলিতি হন না। কবির কাছে দেশ-বিদেশ আপন-পর এক। এ-সব পরিতাপজনক কাহিনী তাঁর শরীরও ক্লান্ত করে দিত।

তবে যে দু-মাস মংপু ছিলেন, আনন্দে-উল্লাসে ভরে রেখেছিলেন আমাদের চারপাশ।

'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ'-এ আমি সেই বিষাদগ্রস্ত কবির কথা লিখি নি। লিখেছি তাঁর কথা যিনি চিরনবীন, যাঁর প্রাণলীলার আনন্দ বার্ধক্যেও অপরাজিত।"

একেবারে শেষ পৃষ্ঠায়—

"তবু যে এখানে কতকগুলি দুঃখজনক কথা লিখলাম তার কারণ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সত্য জানবার অধিকার বাঙালির আছে। অনেক রিসার্চ হবে। রিসার্চে কল্পনা মিশবেই, কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলি লিখে না গেলে প্রত্যবায় হবে। তাই আজ জীবন সায়াহ্নে এসে অকপটে সব লিখে গেলুম। যদি অনির্বচনীয় মানব-সত্তার রূপ এতটুকুও আমার অযোগ্য কলমে ধরা পড়ে থাকে, যদি তা অন্যের মনে আনন্দ বেদনার স্পন্দন জাগায়, তাহলে আমার আশা পূর্ণ হবে।"

পাঠক হয়তো এতক্ষণে কিছুটা আন্দাজ পেয়ে থাকবেন এ-বইটিতে কোন্ রবীন্দ্রনাথের পরিচয় উৎকীর্ণ। মৈত্রেয়ী দেবীর নিজের ভাষায় শুনতে চাইলে সেটা এই রকম—

"একথা আমি পূর্বেও নানা স্থানে লিখেছি। আবারও পুনরুক্তি করছি যে রবীন্দ্রপ্রতিভার একটি দৃষ্টিগোচর

রূপ ছিল, তা যে শুধু কাব্যে-গানে-চিত্রে উৎকীর্ণ হত তা নয়।"

কিংবা—

"যেমন তাঁর কাব্য, ছবি ও গান একটি অনির্বচনীয় শিল্পসত্তাকে ব্যক্ত করে পাঠককে স্পর্শ করে তেমনি তাঁর উপস্থিতি, শরীরী সত্তা, বাচনভঙ্গি সবই দর্শককে এক গভীরতম রূপের পরিচয় দিত যা কেবল আকৃতিতেই নেই। সৃষ্টিকর্তা তাঁর এই বিশেষ রূপটি ক্ষণস্থায়ী করেছেন তাই অনেকে তা দেখতে পেল না।"

সংক্ষেপে, এ বইটি রচনার পিছনে প্রধানতম উদ্দেশ্য দুটি।

(১) উপস্থিতি, শরীরী সত্তা, বাচনভঙ্গি ও বিশেষ রূপ সহকারে দৃষ্টিগোচর যে রবীন্দ্রনাথ, তাকে পাঠকের দৃষ্টিগোচরে আনা, ঘটনার ও দৃশ্যের ব্যাপকতর পটভূমিকায়।

(২) ভবিষ্যতে রিসার্চের কাজে লাগতে পারে যেসব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, সত্যের প্রতি নিদারুণ দায়বশতই, তা লিপিবদ্ধ করে যাওয়া। কারণ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সত্য জানবার অধিকার প্রত্যেক বাঙালির জন্মগত।

জানি কোনো কোনো মূঢ় পাঠক এক্ষেত্রে একান্তভাবে বাঙালির প্রতি পক্ষপাতিতায় ঈষৎ বিষন্ন অথবা

বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন, ভারতবাসী বা বিশ্ববাসী কী অপরাধে বিসর্জিত? আমার ধারনা সে-ক্ষেত্রে মৈত্রেয়ী দেবীর সহজ উত্তর হবে, আগে বাঙালি জানালেই পরে বিশ্ববাসী জেনে যাবে।

মূঢ় পাঠক সম্ভবত এখানেই থামবেন না। তাঁর ওষ্ঠে পরবর্তী খরশান প্রশ্ন ঝলসে উঠতে পারে, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি এমন-কি সভ্যতার যে-কোনো সংকটে তাঁর বিষাদ এবং যন্ত্রণার রক্তকল্লোলকে দূরে সরিয়ে রেখে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোন্ রক্তহীন সত্তা-পরিচয় উদ্ঘাটন করতে চান তিনি? এবং কার প্রয়োজনে?

যে-পাঠক এ-জাতীয় প্রশ্নে কাতর, তিনি হয়তো-বা বিষ্ণু দে-র "রবীন্দ্র জিজ্ঞাসার গরজে" প্রবন্ধটিতে পড়ে থাকবেন—

"আমরাই একটু শ্রম স্বীকার করলে উপলব্ধি করতে পারব 'কবি-কাহিনীর' আশ্চর্য বালক নিবিষ্ট কিন্তু স্বাভাবিক মননে ক্রমান্বয়ে নিজের ঐ উভয়ত অখণ্ড বিকাশে গভীরতা ও প্রসার অর্জন করেছেন, বাস্তব জীবনের সব দিকের সমস্যায় সংকটে লগ্ন হয়ে বিরাট রাষ্ট্রবিদের মতোই সমাধানের পথ ভেবে ভেবে, আবার ক্রমান্বয়ে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির নানান ক্ষেত্রে জীবনসংলগ্ন অভিজ্ঞতার ধাক্কাকে রূপান্বিত করে বিজেতা শিল্পকীর্তিতে। ক্রমান্বয়েই,

কোনো সিদ্ধি-সাফল্যে আবদ্ধ না থেকে সমাজ উত্তরণ
ও বিকাশ-ব্যাপ্তির মধ্যে দিয়ে ক্রান্তিপরম্পরায়,
মৃত্যুকাল অবধি।"
অর্থাৎ তিনি সেই রবীন্দ্রনাথকে চেনেন এবং
প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে সেই
রবীন্দ্রনাথকেই জানতে চান, এমন-কি মনে করেন
স্মৃতি-চিত্র রচয়িতাদের সেইটেই মহৎ দায় সেই
রবীন্দ্রনাথকে চিনিয়ে দেওয়া নিরবিচ্ছিন্ন রক্তক্ষয়ী
শ্রমে একই সঙ্গে নির্মিত হন যিনি নিজে এবং তাঁর
সমবয়স্ক দেশকাল, একান্ত ব্যক্তিগত ও বিশ্বজাগতিক
ক্রন্দনের সঙ্গে প্রতি মুহূর্তের সজাগ সম্পর্কে,
আত্মউত্তরণের সংকটের সঙ্গে বিশ্বসংকটকে মিলিয়ে
দিয়ে। আসল কথা, কাছের মানুষের স্মৃতিচিত্রে তিনি
দেখতে চান তাঁর প্রতিদিনের গড়ে-ওঠার সেই-সব
মুহূর্ত, যখন কোনো জাতীয় সংকটের চাপে তাঁর
কুঞ্চিত কপালের ভাঁজে, নিত্য-নৈমিত্তিক অপমান-
অপবাদের ঘায়ে নিজের মুখাবয়বের বিনষ্ট রেখায়,
ব্যক্তিগত কোনো আপাত উদ্ধারহীন যন্ত্রণায়
কাঁটা-ছড়ানো পথে হাঁটতে গিয়ে রক্ত-লাগা পায়ে,
কোনো-একটি রচনাকে কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী
অগ্নিময় করে তুলতে না-পারার অসহায়তায় ক্রমান্বয়
কাঁটা-ছেঁড়ার মধ্যে অস্তিত্বের অস্থিরতায়, যাপিত
করছেন পিষ্ট প্রহরগুলি, আবার অতিক্রমও করে

যাচ্ছেন খণ্ড-খণ্ড নিমেষের সে সব অগ্নিবলয়।
সংক্ষেপে, তাঁর প্রতিদিনের জন্মকাহিনী।

মৈত্রেয়ী দেবীর এই বইটিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিত অসংখ্য চিঠি আছে, একত্রে সংযোজিত হলে ভিন্ন একটি খণ্ড হয়ে যেতে পারে তাঁর পত্রাবলীর। অথচ এই সব চিঠি কত অন্যরকম, যদি মিলিয়ে দেখতে যাই অমিয় চক্রবর্তী অথবা এণ্ড্রুজ অথবা ইন্দিরা দেবী, এমন-কি, হেমন্তবালা দেবীকে লেখা পত্রাবলির সঙ্গে। আর এই প্রসঙ্গে মনে এসে যায় বালজাকের সঙ্গে তাঁর স্বভাবের বৈপরীত্য।

'In his narrow but constant circle of frinds the woman took the foremost place. Nine-tenth of his letters, perhaps even more, were written to women········after months of silence he would suddenly erupt with a temepst-uous urge to communicate his thoughts, and feelings frequently to a woman whom he had never seen or with whom he had merely a fleeting acquaintance. He never addressed an intimate letter to a man and he never brought himself

to speak of his inner conflicts or the problems of artistic creation even to to the greatest and most celebrated of his contemporaries, such as Victor Hugo or Stendal.

অস্তিত্বের সংকট অথবা সৃষ্টির ঘূর্ণি-ঘোর সমস্যার দিকে নজর রেখে আমরা যদি রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীকে বাছাই করতে বসি, দেখতে পাব তাঁর এই-জাতীয় চিঠির শতকরা আশিভাগ, হয়তো বা আরো বেশি, পুরুষদের উদ্দেশ্যেই। কেন কেবল মহিলাদের উদ্দেশই বালজাক ঝরিয়ে যেতেন অমন পত্রধারা,তার জবাবে স্তেফান জাইগ—

"Worn out with work, harassed by his obligations, living under a crushing weight of debt, caught up again and agnin in the current of his 'vie torrentielle'."

তিনি চিঠি লিখতেন কোনো 'amorous adventure'-এর আকাঙ্খায় নয়, লিখতেন 'on the contrary a passionate need of tranquility'-র আস্বাদনে।

রবীন্দ্রনাথেরও, অবশ্যই, বালজাকের তীব্র আবেগের মতোই, প্রয়োজন ছিল স্নায়ু-শান্তি। তফাত এই,

স্নায়ু-শান্তি মেটানোর তাগিদে নিজের সমস্যা-সংকটের চেহারা-চরিত্রকে ভাগ করে নিয়েছিলেন দু-ভাবে। মহিলাদের সঙ্গে ঘরোয়া সমস্যা। আর পুরুষদের সঙ্গে সৃষ্টি-সম্পর্কিত। এর মধ্যে নড়বড়ে কিছু ব্যতিক্রম ঘটলেও, মূল কাঠামোর খুঁটিটা শক্তই। মৈত্রেয়ী দেবীকে মারাত্মকভাবে জখম করেছে মূলত রবীন্দ্রনাথের চিঠি-গুলোই। একটু নিবিষ্ট হয়ে এই বইটির দিকে তাকালেই ধরা পড়বে দুটি ভিন্ন স্বাদের আলোচনা, যেহেতু বইটির গঠনেই রয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের দু-জাতের চিঠি। প্রথম অংশের চিঠি সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে লেখা। দ্বিতীয় অংশে মৈত্রেয়ী দেবীকে। যেহেতু সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে লেখা চিঠিতে, ঈষৎ পাশ-কাটানোর প্রবণতা সত্ত্বেও, কিছু তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ এসে গেছে স্বভাবতই, তাই সে চিঠির আলোচনায় মৈত্রেয়ী দেবীকেও বাধ্য হতে হয়েছে কিছুটা তত্ত্বালোচক। কিন্তু মৈত্রেয়ী দেবীকে লেখা চিঠিতে যেহেতু স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের দীর্ণ-বিদীর্ণ সত্তার পরিবর্তে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের তাৎক্ষণিক ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট, তাৎক্ষণিক সুখ-দুঃখের গড়ানে অনুভূতিমালা, তাৎক্ষণিক কিছু চাহিদার চরিত্রটাই প্রধান, যেহেতু এণ্ডরুজকে লেখা চিঠির আর্তনাদ নেই এ-সব পত্রাবলীতে, নেই অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠির আত্মনির্মাণের সংকট, নেই ধূর্জটিপ্রসাদকে লেখা

সাহিত্য-সঙ্গীতের বহুমুখী সমস্যার অগ্নিঝলক, তাই মৈত্রেয়ী দেবীও, চিঠির ধারা-ভাষ্য প্রসঙ্গে অবিরত আমাদের শুনিয়ে যান, আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে তৃপ্তিবোধ করেন, হয়তো বা ঈষৎ অহঙ্কারও, প্রধানত এক সীমাবদ্ধ রবীন্দ্রনাথের একপেশে গৃহস্থালি ঘেঁসা গল্প-গুজই কেবল। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, সর্বত্রও হয়তো-বা, রবীন্দ্রনাথের উন্মোচনকে ছাড়িয়ে মুখর হয়ে ওঠে লেখিকারই আত্মকথন। অবশ্য এ-ব্যাপারে তাঁকে অভিযুক্ত করার রাস্তা তিনি নিজেই বন্ধ করে দিয়েছেন আগে-ভাগে। রচনার এক জায়গায় অকপটে বলে নিয়েছেন-- "এর আগে আমি কয়েকটি বইতে রবীন্দ্রনাথের কথা লিখেছি কিন্তু সেখানে যথাসাধ্য আমি নিজে অনুপস্থিত থাকতে চেষ্টা করেছি। 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' আমার সংসারের পরিবেশের বই হলেও সেখানে আমার নিজের মন, অনুভূতি ও ভাবনা সবই অনেকটা প্রচ্ছন্ন রেখেছি—সম্ভবত সেই কারণেই ঐ বইটি পাঠকসমাজে আদৃত হয়েছে। সেই বয়সে তাই উপযুক্ত ছিল, কিন্তু এখানে যে ইতিহাস লিখতে বসেছি তা কতকটা আমার নিজেরই কথা রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলো নিয়ে, আমার নিজের জীবনকেই আমি পিছন ফিরে দেখব এই আমার অভিপ্রায়।"

যেহেতু নিজের কথা, তাই মাসি-পিসি, কাঁথা-কানি, জামা-জুতো, আম-জাম, চাঁদি-পাতর জাতীয় খুঁটিনাটির বাদ পড়ে নি কিছুই। আর তাঁর এই প্রচ্ছন্ন আত্মচরিতে প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে নি আরো একটা জিনিস, যাকে সাদা কথায় বলা যেতে পারে, মেয়েলি ঈর্ষা। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যলাভে ধন্যা মহিলাদের মধ্যে তিনিই যে শ্রেষ্ঠা, নানা সংগোপন-মন্তব্যে অর্থাৎ ঠারে-ঠোরে সেটাই মৈত্রেয়ী দেবীর এই আত্মকথনে পড়তে পড়তে এক সময়ে শিউরে উঠেছি দুটি ভয়াবহ প্রশ্নে। রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয় ভৃত্য বনমালী যদি, 'ঠাকুরের কাছাকাছি' বা অন্য-কোনো নামকরণে, রবীন্দ্রনাথ কী খেতেন এবং কিসে খেতেন থেকে শুরু করে, তাঁর জীবন-যাপনের যাবতীয় দৈনিক ফিরিস্ত-সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থ রচনা করত, আমরা কী ভাবে গ্রহণ করতাম সেটাকে? দ্বিতীয় প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথ যদি টলস্টয়ের মতো দেখতে হতেন, তাহলে কী অবস্থা ঘটত তাঁর সেইসব ভক্ত ও ভক্তাবৃন্দের, যাঁদের রচনায়, এলিয়টের সেই 'ইন দি রুম দা উওম্যান কাম এণ্ড গো টকিং অ্যাবাউট মাইকেলেঞ্জেলো'-র, রিফ্রেনের মতো, আমাদের অবিরল শুনে যেতে হয় তাঁর দৈবীরূপের পুনরুক্তিময় উচ্চারণ।

রবীন্দ্রনাথের শারীরিক ঐশ্বর্য যে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখার মতোই, সেই সত্যকে মানি বলেই আমাদের বিরক্তি কখনো-কখনো শুধু বাঁকা ভুরুতে আবদ্ধ না থেকে মনের ভিতরেও যে একটা ধনুক তৈরী করে নিতে চায় তার কারণ, তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের রচনায়, নিতান্তই ভাসা-ভাসা এবং ভারি অথবা মুখরোচক কিছু বিশেষণের বাইরে, উপলব্ধির ঝংকারে বেজে ওঠা কোনো-কোনো গভীরতর অনুভূতিরও উন্মোচন ঘটে না কখনো। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো কতটুকু সময়ের জন্যে কাছে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। অথচ তাঁর কত সামান্য শারীরিক বর্ণনা আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে মানুষের শারীরিক আলেখ্যকেও পাঠ করার ভাষাটা ছিল তাঁর মননের আয়ত্তে, যখন পড়ি "তাঁর প্রকাশময় দুটি অতুলনীয় শুদ্ধ হাতের সুষমা যেন অবাক করে দেয়, মনে হয় যেন এদের নিজেদের কোনো ভাষা আছে।" মৈত্রেয়ী দেবীর রচনায় রবীন্দ্রনাথের হাতের বর্ণনা এসেছে বহুবার। একবার চেয়ারের হাতলের উপর তাঁর হাত রাখার ভঙ্গি এবং গান গাইবার সময় চোখ-মুখের রূপান্তর বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন "তবু আমি লিখছি এই জন্য যে ভবিষ্যতে যখন কেউ নাটক করবেন রবীনন্দ্রাথের জীবন নিয়ে— এ-সব বর্ণনা হয়তো তাঁর কাজে লাগবে।

ভাস্করেরও লাগতে পারে। যদি অবশ্য সে ভাস্কর্য আকৃতির পরোয়া করে।"

আকৃতির পরোয়া না করলে কী তিনি ভীষণ ব্যথা পান? তাহলে কী করে ঘটেছিল, আমার এবং আমাদের চোখের সামনে, রবীন্দ্রসদন সংলগ্ন মাঠে রবীন্দ্রনাথের ঐ পূর্ণাবয়ব মূর্তি প্রতিষ্ঠার দিনে মূর্তিটির প্রশংসায় তাঁর মুগ্ধ মুখরতা? এমন-কি, নির্বাচকমণ্ডলীতে তিনি ছিলেন অন্যতম সদস্য।

বইটির একেবারে শেষ দিকে আরো একবার এসেছে হাতের প্রসঙ্গ। তবে সেটা অম্বিকার নিজের হাত। "আমি অনেক সময় খাটের পাশে বসে সেই মৃত্যুচুম্বিত, আচ্ছন্ন, অনিন্দ্য শরীরের উপর একখানি হাত রেখে চোখ বুজে অন্য-এক জগতে চলে যেতাম—উনি যা এতদিন শিখিয়েছেন, তাই ভাবতে চেষ্টা করতাম।"

রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ী দেবীকে কি কি শিখিয়েছেন তার সব তথ্য আমাদের জানা না থাকলেও, কি শেখান নি তা এই বই থেকেই জানা হয়ে যায়। আর এ-বিষয়ে প্রথমেই যা আমাদের মনে পড়ে, সেটি গদ্য কবিতা। গদ্য-কবিতার প্রসঙ্গে বিষয়ে মৈত্রেয়ী দেবীর দুটি উক্তি উল্লেখ করছি পর পর।

১। "রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বারবার নুতন-নুতন ফর্মের পরীক্ষা করেছেন—প্রতি বইতে তাঁর রচনাশৈলী

বদলেছে। সেটা কলাকৌশলের কারণে নয় ভাবের পরিবর্তনের জন্য।"

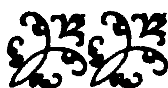
২। "আমার নিজের পক্ষে অবশ্য ব্যাপারটা ছিল বিপরীত—আমার কবিতা নয়, আমার কাব্যজীবনকে বাঁচাতে হলে, অর্থাৎ কবিতার স্বকীয়তা হোক বা না হোক, কবিতার আনন্দকে রক্ষা করতে হলে চিন্তায়, মননে, ধ্যানে, জ্ঞানে তাঁর থেকে দূরে যাবার কোনো উপায় ছিল না।"

এই সব স্ববিরোধী উক্তি পড়তে-পড়তেই যিশুখ্রীস্টের কথা মনে পড়ে যায়, কেননা তাঁরও নির্মম মৃত্যুর পিছনে তাঁর কোনো কোনো ভক্তের অবদান।

৪

তাঁর দৃষ্টান্তময় অথবা জিজ্ঞাসাবহুল "রবীন্দ্র জিজ্ঞাসার গরজে" প্রবন্ধটিকে বিষ্ণু দে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক অথচ গৌণ যে-সব উদ্‌ঘাটন-উন্মোচনের আর্তি পেশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে ঘনিষ্ঠরূপে জানা মানুষদের দরবারে, আলোচ্য দুটি বইয়ে তারই অনুসন্ধান করতে গিয়ে পরিবর্তে যা পেলাম তার আসল স্বরূপ প্রকাশের গরজে এখানে আরো একবার বিষ্ণু দে-র কাছেই হাত পাততে হচ্ছে আমাকে, "মামুলি গড্ডল গয়ংগচ্ছ

রাবীন্দ্রিকপনা" বাক্যবন্ধটি কর্জ নেওয়ার জন্যে। হয়তো এ-ছাড়া উপসংহারে পৌঁছনোর আর-একটি মাত্রই পথ খোলা ছিল আমার কাছে, যা অতি-সংক্ষিপ্ত একটি দীর্ঘশ্বাসময় উচ্চারণ—হায় রবীন্দ্রনাথ !



রবীন্দ্রনাথের গ্যেটে

চিঠির সময়কাল, ১৯৩৬। প্রেরক, অ্যালবার্ট সোয়াইৎজার। প্রাপক, রবীন্দ্রনাথ। উপলক্ষ, ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি বিষয়ে ইংরেজি অনুবাদে নিজের 'ইণ্ডিয়ান থট্ অ্যাণ্ড ইটস্ ডেভেলপমেণ্ট' বইটি কবিকে উপহার দেওয়া। আর সেই চিঠিতে কবির প্রতি সম্বোধনে ঘটে গেল সম্পূর্ণ নতুন এক উচ্চারণ, 'গ্যেটে অফ ইণ্ডিয়া'। সোয়াইৎজারের যুক্তি—

"আমি যে আমার এই বইটিতে আপনাকে ভারতবর্ষের গ্যেটে হিসেবে সম্বোধন করছি, তার কারণ, আমার মতে, য়ুরোপের ক্ষেত্রে গ্যেটে ছিলেন যতখানি গুরুত্বময়, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আপনি ঠিক ততখানি।"

অবশ্য এর পাঁচ বছর আগেই হেরমান কাইজারলিং-এর 'গোলডেন বুক অব টেগোর'-এর প্রবন্ধেই যেন আভাস পাওয়া গিয়েছিল এই জাতীয় সম্মাননার সম্ভবপরতা। কাইজারলিং জানিয়েছিলেন,

জার্মান জাতির ক্ষেত্রে গোটে বলতে যা বুঝি,
ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বলতে বোঝায়
ঠিক ততখানি।

আর ঐ গোল্ডেন বুক-এরই আর এক প্রবন্ধে
থিওডোর ফন উনটারস্টাইনও রবীন্দ্রনাথের সত্তা-
পরিচয়ের বিশ্লেষণে তাঁকে দেখেন এবং দেখান
গ্যেটের eternal urge and unceasing
exertion'-এর মূর্ত মূর্তির মতোই। তাঁর
রচনায় ছিল আরও এক অভাবনীয়
যোগাযোগের উল্লেখ। রবীন্দ্রনাথের
সপ্ততিতম জন্মদিবস উদ্‌যাপনের
প্রদীপ নিভতে না নিভতেই সারা পৃথিবীতে শুরু
হয়ে যাবে গ্যেটের শততম মৃত্যুবার্ষিকী পালনের
উৎসব।

যত স্বচ্ছন্দ এবং যে স্বতঃস্ফূর্ততায় জার্মান-
মনীষীদের কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হয়েছে গোটে এবং
রবীন্দ্রনাথের এই একাত্মতা, প্রথম কোনো
ভারতীয় কণ্ঠস্বরে তা ঘটলে অন্তত
বাংলা সাহিত্যের বাতাস যে তুমুল না
হলেও বাঁকা হসির বিদ্রূপে কেঁপে উঠতো
থরথরিয়ে, বাংলা সাহিত্যের নিতান্ত
সাধারণ পাঠক হিসেবে সেটা অনুমান করে
নেওয়া এমন কিছু পারিশ্রমসাধ্য নয়। আর

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর বহু বছর পরেও আমরা তো প্রত্যক্ষও করলাম স্বদেশী সমালোচকদের মসীর অসি-তুল্য রূপ, বিনা তর্কযুদ্ধে গ্যেটে-রবীন্দ্রনাথের এই একাত্মতায় সূচ্যগ্র পরিমাণ সম্মতি-সমর্থন জ্ঞানের অনিচ্ছায়। বিতর্ক, সন্দেহ নেই, সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষায় সর্বদাই একান্ত উপকারী। কিন্তু ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে-বোধ আর আমূলসঞ্চারী প্রখর অনুভূতির দক্ষতা, এই দুয়ের শূন্যতা শুধুমাত্র গর্বিত পঠনের চর্বিত-চর্বণ উদ্‌গারে ভরাট করতে গেলে মুদ্রিত অক্ষরের অনর্থক অপচয় ঘটে যত, তার চেয়ে ঢের বেশি ক্ষতিকর বিভ্রান্তি ঘটে সাহিত্য-চর্চার ধারাবাহিক উত্তরণে অথবা পুরুষার্থ নির্ণয়ের ক্রমিক অগ্রসরতায়। সন্তপ্ত হয়েও তবুও যে আমরা সুখী, তার কারণ পৃথিবীর অন্য সব সংস্কৃত সমৃদ্ধ দেশের মতোই আমাদের দেশেও সাহিত্য-শিল্পের প্রগতি-চিন্তায় তোতাপাখি সমালোচকদের ডিঙিয়ে তাঁদেরই সমসময়ের পুরোধা কবিরাই, তাঁদের মননের মৌলতার জোরেই অর্জন করে নিতে পেরেছেন আধুনিক ভাষ্যকারের ভূমিকা। এ মন্তব্য সমগ্র রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নদের ক্ষেত্রে যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি রবীন্দ্রনাথ ও গ্যেটের একাত্মতা নির্ধারণেও।

উৎসুক পাঠক ইচ্ছে করলেই পড়ে নিতে পারেন বুদ্ধদেব বসুর 'রবীন্দ্রনাথ : বিশ্বকবি ও বাঙালি' নামের প্রবন্ধটি। আর সম্ভবত ঐ প্রবন্ধটিতেই ঘটেছে গ্যেটে বনাম রবীন্দ্রনাথ বিতর্কের আপাত-শেষ আলোকসম্পাত।

এ আলোচনার বিষয় অবশ্য ভিন্ন, যা শিরোনামেই সুস্পষ্ট। অর্থাৎ গোটে ও রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ-নির্ণয় নয়, রবীন্দ্রনাথের গ্যেটে-চর্চার তথ্যানুসন্ধানেই সীমাবদ্ধ শুধু। আরো সংক্ষেপে, রবীন্দ্রনাথের রচনায় গ্যেটে-প্রসঙ্গের সংকলনই প্রধানত।

জীবনের একটা পর্বে রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছিলেন জার্মান ভাষা শিক্ষায় একান্ত উৎসাহী এবং গ্যেটের ফাউস্ট অধ্যয়নে গভীরতর আগ্রহী, সে-সংবাদ এখন আর অজানা নয় আমাদের। জার্মান ভাষা ঈষৎ আয়ত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাইনের এক গুচ্ছ অনুবাদও উপহার দিয়েছেন তিনি আমাদের। হাইনের চেয়ে অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী তাঁর গোটে পাঠ। অথচ আমাদের বিস্মিত করে তুটি বিষয়। এক, তাঁর কলমে গ্যেটে অনুবাদের অনুপস্থিতি। তুই, যত আগ্রহাতুর কথাবার্তা শুধু চিঠিপত্রেই।

ঠিক কোন সময় থেকে গ্যেটে সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের শুরু, তার ঝাপসা একটা আভাস পেয়ে

যাই আমরা ক্ষিতিমোহন সেন-এর 'মহাপুরুষ গোটে ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধের শেষাংশে :

"রবীন্দ্রনাথ কোনো এক প্রসঙ্গে এই বিষয়ে বলিয়াছিলেন, দাদাদের কাছে পূর্বে আমি ইংরেজী ভাষায় ফাউস্টের কথা সামান্যভাবে শুনিয়াছিলাম মাত্র। ঠিক পরিচয় তাহাতে আমার হয় নাই। লোকেন্দ্রনাথ গ্যেটের সহিত আমার এই সাম্যের কথা আমাকে বলিলে আমি জার্মান ভাষাতে ফাউস্ট পড়িতে প্রবৃত্ত হই। তাহাতে সফল হই নাই। জার্মান ভাষা আমার তেমন জানা ছিল না। তাই প্রমথনাথকে তখন বারবার স্মরণ করিয়াছি। কিন্তু তিনি আসিয়া আমাকে সাহায্য করিতে পারেন নাই।"

বয়স যখন মোটে সতের, তখনই যে গ্যেটের জীবনকাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে গেছে তাঁর, ভারতী পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের কার্তিক সংখ্যায় 'গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ' নামের দীর্ঘ দশ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধে তার সাক্ষ্য। এমনকি এই প্রবন্ধের জন্যে একটি নয়, একাধিক গ্যেটে-জীবনী পড়তে হয়েছিল তাঁকে, পূর্বসুরিদের গবেষণায় ধরা পড়েছে সে তথ্যও। ঐ প্রবন্ধের প্রথম স্তবকটি এইরকম—

"গেটের বোধ হয় বিশেষ পরিচয় দিবার আবশ্যক

নাই। যিনি জার্মান-সাহিত্যের অহঙ্কার ও অলঙ্কার স্বরূপ—যিনি 'ফস্ট' নামক নাটক লিখিয়া মানব হৃদয়ের সূক্ষ্মতম শিরা পর্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন, যিনিই প্রথমে ইউরোপমণ্ডলে আমাদের শকুন্তলার আদর বর্ধিত করিয়াছিলেন, তাঁর আর নূতন পরিচয় কি দিব?—কিন্তু তিনি অদ্বিতীয়রূপে সূক্ষ্মদর্শী ও বহুদর্শী হইয়াও জীবনে কতদূর দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন তাহা দেখাইবার জন্য পাঠকদের সম্মুখে তাঁহার প্রেম-কাহিনী আজ উদ্‌ঘাটিত করিতেছি।—"

এখানে উঠতে পারে ভিন্নতর প্রশ্নও। ঐ সতের বছর বয়সে তাঁর গ্যেটে-জীবনী অধ্যয়ন কি গ্যেটে-রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার গরজে, নাকি নিছক গ্যেটের জীবনের প্রেম-কাহিনী সংগ্রহের সাময়িক উৎসাহে? কারণ ঐ ভারতীর পাতাতেই, আগের দুটি সংখ্যায় দান্তে-বিয়াত্রিচে এবং পেত্রার্ক-লরা-র প্রণয় জীবন নিয়েও লিখেছেন দুটি প্রবন্ধ। কারো কারো অনুমান, গ্যেটে, দান্তে এবং পেত্রার্কের জীবন কাহিনী সংক্রান্ত বই তিনি পেয়ে থাকবেন 'এখনকার কালের পড়াশুনোওয়ালা' মারাঠি মেয়ে আন্না বা অন্নপূর্ণা তরখড়কর-এর সংগ্রহ থেকে, তারই সৌজন্যে ও পারস্পারিক সহৃদয় সম্পর্কের

সুবাদে। এখানেও তাকিয়ে দেখার বিষয়, দান্তে-পেত্রার্কের প্রবন্ধে তিনি বাংলায় অনুবাদ করে দিয়েছিলেন ঐ দুই কবির কবিতার দীর্ঘ অংশ। আর গ্যেটের বেলায়, প্রবন্ধের শেষে, শুধু লিলির গানের একটিমাত্র পংক্তি। অনুমানের সুযোগ এখানে দু'রকমের। এক, তখনও তিনি যথেষ্ট অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন নি গ্যেটের রচনাবলীর। তখন ও তাঁর ধারণা ছিল গ্যেটের কবিতার সঙ্গে গ্যেটের প্রেম বা প্রেমের ব্যর্থতা সম্পর্কহীন। 'গ্যেটে ও তাঁর প্রণয়িনী'-এর এক জায়গায় জানিয়েও দিয়েছিলেন তাঁর সে ধারণা—

"দান্তে ও পেত্রার্কার প্রেম প্রেমের আদর্শ, আর গ্যেটর প্রেম পার্থিব অর্থাৎ সাধারণ।....গ্যেটের জীবনে এক-একটি প্রেম-আখ্যান শেষ হইলে, অমনি তাহা লইয়া তিনি নাটক রচনা করিতেন। দান্তে বা পেত্রার্কার ন্যায় কবিতা লিখিতেন না।"

'ফাউস্ট' সম্বন্ধে তাঁর স্বতন্ত্র আগ্রহের সূচনাকাল সম্ভবত ১৮৮৭ থেকে। বিভিন্ন রচনা থেকে এও জানতে পারা যায় এখন যে, 'ফাউস্ট'-এর একাধিক সংস্করণ কিনেছেন, পড়েছেন এবং অন্যকে উপহার দিয়েছেন তিনি। এবং রবীন্দ্রভবনের সংগ্রহশালায় কবির নিজের হাতে স্বাক্ষর করা সে বইগুলো এখনো

সংরক্ষিত। এ পর্যন্ত মোট তিনটি স্বতন্ত্র 'ফাউস্ট'-এর খোঁজ পাই আমরা বিভিন্ন গবেষকের রচনায়।

মূল জার্মান থেকে John Anster-এর পদ্যে অনুবাদ করা ফাউস্ট-এর প্রথম খণ্ড। সচিত্র শোভন সংস্করণ। ভূমিকা হেনরি মার্লির। বন্ধু লোকেন পালিতের সঙ্গে যখন লণ্ডন য়ুনিভার্সিটির ছাত্র, এই মার্লিই তখন ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। 'ছেলেবেলা'-য় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা তাঁর পঠন-পদ্ধতির। প্রকাশের বছর, ১৮৮৭। এ বইটির প্রচলিত নাম ছিল আরভিং সংস্করণ, যেহেতু হেনরি আরভিংকে বইটি উৎসর্গ করা।

১৮৮৭-র ২৭ জুলাই জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে, সম্পর্কে যিনি মেজ বৌঠান, রবীন্দ্রনাথ নিজের নাম লিখে উপহার দিয়েছিলেন সংস্করণটি। তারও আগে কিনেছিলেন The Dramatic works of J. W. Goethe। অনুবাদক একাধিক। কিন্তু এ বইটিতে ফাউস্টের কোনো অনুবাদ ছিল না। এ ছাড়া ফাউস্ট-এর Abraham Hayward-এর গদ্যানুবাদ। মূল জার্মান, বাঁ দিকের পাতায়। ডাইনে, ইংরেজি অনুবাদ। প্রকাশের বছর, ১৪৯২। রবীন্দ্রনাথ কেনেনও ঐ বছরে। নাম এবং তারিখ লেখা এই সংস্করণের ভিতরের পাতার মার্জিনে

অনেক জায়গায় তাঁর নিজের হাতে জার্মান শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ।

তাঁর গ্যেটে-অধ্যয়ন শুধু ফাউস্ট পাঠেই সীমাবদ্ধ, এমন ভাবনায় সায় দিতে অসম্মত তাঁর কিছু কিছু গবেষক। 'এ্যাকেরমানের সঙ্গে গ্যেটের কথোপকথন'ও যে কোনো এক সময়ে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে তাঁর পঠনের তালিকায়, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ার মতো প্রমাণও পেশ করেছেন তাঁরা। জীবনস্মৃতির 'ভগ্নহৃদয়' পরিচ্ছেদের এক জায়গায় কবির উক্তি—

"মজা এই তখন আমারই বয়স আঠারো ছিল তা নয়—আমার আশেপাশের সকলের বয়স যেন আঠারো ছিল।"

ইংরেজি অনুবাদে, এ্যাকেরমানের সঙ্গে কথোপকথনের এক জায়গায় গ্যেটের উক্তি—

"When I was eighteen, all my country was eighteen too." আরো নানা রচনায় নানাভাবে উঠেছে, গ্যেটে-প্রভাবের প্রসঙ্গ। কাজি আবদুল ওদুদের অনুমান, 'চোখের বালিতে' গ্যেটে-র Elective Affinities-এর ছায়া। প্রমথনাথ বিশী ফাউস্টের প্রভাব খুঁজে পেয়েছেন 'প্রকৃতির পরিশোধ'-এ। 'ভগ্নহৃদয়' গীতিকাব্যে Werther-এর অনুপ্রবেশ খুঁজে পেয়েছেন কেউ কেউ। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' Mahomets

Gesang বা মহম্মদের গান-এর। 'প্রকৃতির
পরিশোধ'-এ ফাউস্টের ছায়াপাত
নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন আরও একজন।
তিনি গুজরাটনিবাসী নরসীভাই প্যাটেল,
শান্তিনিকেতনে জার্মান ভাষার অধ্যাপক। বাংলা
শিখে 'প্রকৃতির পরিশোধ' পড়ে ক্ষিতিমোহন
সেন প্রমুখদের কাছে প্রশ্ন তুলেছিলেন—"গুরুদেব
কি ফাউস্ট দেখিয়া 'প্রকৃতির পরিশোধ' লেখেন?"
ক্ষিতিমোহন পক্ষের উত্তর ছিল, না।
ক্ষিতিমোহনবাবুরাই প্রশ্ন তুলেছিলেন একবার
রবীন্দ্রনাথের উপর গ্যেটের প্রভাব নিয়ে জার্মান
পণ্ডিত, আবার সংস্কৃতজ্ঞও, উইনটারনীৎস-এর
কাছে। তাঁর উত্তর—
"ফাউস্টের প্রেম-বৈরাগ্যের ও সীমা-অসীমের
মিলনের এই বিশেষত্বটি তো আমাদের দেশের
নহে, তাহা ভারতীয়। গ্যেটে অনুবাদের অনুবাদ
দেখিয়া তাহার সন্ধান পাইয়াছিলেন। ইহাতেই
গ্যেটের মহত্ত্ব। আর রবীন্দ্রনাথের তাহা ঘরের
জিনিস, তাঁহার পরিবারের মধ্যে প্রতিক্ষণে তাহা
পৈতৃক ধন। ইহা কি জন্য তিনি সেখানে ধার
করিতে যাইবেন।"
দুই কবির 'বিশ্ববোধ'-এর প্রসঙ্গেও বুদ্ধদেব বসুর
অনুভবে উইনটারনীৎস-এরই প্রতিধ্বনি শুনি যেন।

"যে-বিশ্ববোধ গ্যেটে আয়ত্ত করেছিলেন সচেতন ও সচেষ্টভাবে তা ছিলো রবীন্দ্রনাথে স্বজ্ঞাপ্রসূত ; গ্যেটের পক্ষে যা বার্ধক্যের উপার্জন, তা রবীন্দ্রনাথে আযৌবন অবিচ্ছেদী। এ দিক থেকে আমরা বলতে পারি যে গ্যেটের স্বপ্ন যে-মানুষের মধ্যে প্রথম সার্থক হলো তিনিই রবীন্দ্রনাথ·····।"

জানি, ছাপানো পুঁথির অক্ষর খুঁটে খুঁটে এক কবির জীবনে আরেক কবির প্রভাব-প্রতিক্রিয়া পরিমাপের প্রমাণ সংগ্রহ, গবেষণা হিসাবে সার্থক হোক যতই, সে-উদ্‌ঘাটনেও অনুপস্থিত থেকে যেতে বাধ্য অনেক চোরা স্রোত, অনেক যৎকিঞ্চিৎ সুরের সুদূরপ্রসারী অনুরণন, এমন দু-একটি মৃদু টোকা যা একই সঙ্গে খুলে দিতে পারে একটা নয়, বিরাট অন্দরমহলের অনেক ভেজানো দরজাই হয়তো বা। এলিয়টের স্বীকারোক্তিকে মনে রাখলে আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে যায় এই দুরূহ জানা যে, এক কবির মানসিক ভূমণ্ডলে আরেক কবির বৃক্ষরোপন যতটা প্রত্যক্ষগোচর, বীজবপন তার চেয়ে অনেক বেশি ফলপ্রসূ হলেও সনাক্তকরণ থেকে যায় অধিকাংশ সময়েই অনির্ণেয়, এমন কি স্বয়ং কবির স্মৃতি-সত্তাতেও।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় গ্যেটে প্রসঙ্গ

১। গেটের জীবনটা তোর ভালো লাগছে? একটা তুই লক্ষ্য করে দেখে থাকবি—গেটে যদিও এক হিসেবে খুব নির্লিপ্ত প্রকৃতির লোক ছিল, তবু সে মানুষের সংশ্রব পেত, মানুষের মধ্যে মগ্ন ছিল। সে যে রাজসভায় থাকত সেখানে সাহিত্যের জীবন্ত আদর ছিল, জার্মানীতে তখন খুব একটা ভাবের মন্থন আরম্ভ হয়েছিল—হের্ডের শ্লেগেল হুম্বোল্‌ট শিলার কান্ট্ প্রভৃতি বড়ো বড়ো চিন্তাশীল এবং ভাবুকগণ দেশের চারিদিকে জেগে উঠেছিল, তখনকার মানুষের সংসর্গ এবং দেশব্যাপী ভাবের আন্দোলন খুব প্রাণপরিপূর্ণ ছিল।—গেটের পক্ষেও যদি শিলারের বন্ধুত্ব আবশ্যক ছিল, তা হলে আমাদের মতো লোকের পক্ষে একজন যথার্থ খাঁটি ভাবুকের প্রাণসঞ্চারক সঙ্গ যে কত অত্যাবশ্যক তা আর কী করে বোঝাব।

ছিন্নপত্রাবলী থেকে

২। আমি আলো এবং আকাশ এত ভালবাসি। বোধ হয় নামের সার্থকতার জন্য। গেটে মরবার সময় বলেছিলেন; More light। আমার যদি সে সময় কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করবার

থাকে তো আমি বলি : More light and more space !

ছিন্নপত্রাবলী থেকে

৩। চিত্তের দর্শন স্পর্শন শ্রবণ মনন-শক্তিকে যদি সচেতন রাখতে হয়, যা-কিছু পাওয়া যায় তাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করবার শক্তিকে যদি উজ্জ্বল রাখতে হয়, তা হলে হৃদয়টাকে সর্বদা আধ-পেটা খাইয়ে রাখতে হয়—নিজেকে প্রাচুর্য থেকে বঞ্চিত করতে হয়।
Goethe-র একটি কথা আমি মনে করে রেখে দিয়েছি—সেটা শুনতে খুব সাদাসিধে, কিন্তু আমার কাছে বড়ো গভীর বলে মনে হয়—
Entbehren sollst du, sollst entbehren.
Thou must do without, must do without.

ছিন্নপত্রাবলী থেকে

[রবীন্দ্রনাথ : শতবার্ষিকী গ্রন্থে অধ্যাপক তারকনাথ সেন-এর 'ওয়েস্টার্ন ইনফ্লুয়েন্স অন দা পোইট্রি অফ টেগোর' প্রবন্ধের ফুটনোটে আমরা পাই আরও একটি তথ্য। চিঠিতে উদ্ধৃত গ্যেটের এই কবিতাংশটি তিনি নিজের হাতে লিখেছিলেন 'সোনার তরী'-র প্রচ্ছদে। এই তথ্য তিনি পান ক্ষিতীশ রায়-এর কাছ থেকে।]

৪। কাল সন্ধ্যেবেলায় গেটের উপর ডাউডনের একটি প্রবন্ধ পড়ছিলুম—তাতে দেখছিলুম গেটে দুই বৎসরের জন্যে সমস্ত ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে

ইতালীতে গিয়ে নিবিষ্টমনে শিল্পালোচনা এবং সৌন্দর্যসম্ভোগ করে কী-এক নূতন প্রাণ এবং নূতন সম্পদ লাভ করেছিলেন, তাতে করে তাঁর প্রতিভা সহসা কী-এক অপূর্ব পরিণতি প্রাপ্ত হয়েছিল, তাঁর সমস্ত প্রকৃতি কী-একটা বিস্তীর্ণ শান্তি এবং বৃহৎ মর্যাদা অর্জন করেছিল। পড়লে আমাদের মতো কারাবাসীর চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে—মনে হয়, যা হতে পারা যেতো তার অর্ধেকও হওয়া যায়নি, শিক্ষা এবং সাধনার অনেক বাকি আছে। মনে হয়—যদি গেটের মতো শুভদৃষ্ট আমার হত, যদি এই বাংলাদেশে আমি জন্মগ্রহণ না করতুম, যদি এ দেশে মানবপ্রকৃতি বিকাশের উপযোগী সমস্ত খাদ্য থাকত, তা হলে আমি সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে অমরতা লাভ করতে পারতুম—এখন আমি অনেকটা পরিমাণে কৃপাপাত্র, দান। যদি পারি তো আমিও এক সময়ে জগতে বেরিয়ে পড়ব—এই আমার নিতান্ত ইচ্ছা।

ছিন্নপত্রাবলী থেকে

৫। এই আমার সমস্ত জগৎ। এরা দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছে, স্নান করছে, কাপড় কাচছে, ছোটো ডোঙায় চড়ে হাত দিয়ে জল কেটে কেটে ছোট নদী পার হচ্ছে, অপরাহ্নে গৃহভিত্তির

যে দিকটাতে ছায়া পড়ে সেই দিকে দীর্ঘকাল স্থিরভাবে বসে দুই-একটি কর্মহীন মেয়ে সম্মুখজগতের চলাচল দেখে বেলা কাটিয়ে দিচ্ছে, গ্রাম্য পাঠশালার ছেলেরা মলিন খাতাপত্রের পুঁটলি হাতে বাড়ি ফিরছে—সন্ধ্যাবেলার ঘরে আলো জ্বলছে, গোয়ালে ধোঁয়া দিচ্ছে, দুটি গ্রাম দুটি নাড়ের মতো নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে—আমি খড়খড়েগুলো তুলে দিয়ে ভাইমার রাজসভায় গেটের কীর্তিকাহিনী অধ্যয়ন করছি। কোথায় সাগর-নদীতীরে পতিসর, বোটের মধ্যে আমি, আর কোথায় বিচিত্র কর্মসংকুল ভাইমার রাজসভার রাজকবি গেটে!

ছিন্নপত্রাবলী থেকে

৬। শকুন্তলার সরলতা অপরাধে দুঃখে অভিজ্ঞতায় ধৈর্যে ও ক্ষমায় পরিপক্ক, গম্ভীর ও স্থায়ী। গেটের সমালোচনার অনুসরণ করিয়া পুনর্বার বলি, শকুন্তলায় আরম্ভের তরুণ সৌন্দর্য মঙ্গলময় পরম পরিণতিতে সফলতা লাভ করিয়া মর্তকে স্বর্গের সহিত সম্মিলিত করিয়া দিয়াছে।

প্রাচীন সাহিত্য, 'শকুন্তলা' প্রবন্ধ থেকে

৭। জর্মান মহাকবি গেটে তাঁহার ফাউস্ট নাটকে দেখাইয়াছেন, যে-ব্যক্তি মানব-প্রবৃত্তিকে উপবাসী রাখিয়া সংসারের লীলাভূমি হইতে উচ্চে নিভৃতে

বসিয়া জ্ঞানসংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিল, সংসারের ধুলার উপরে বহুজোরে আছাড় খাইয়া তাহাকে কেমনতরো শক্ত জ্ঞান লাভ করিতে হইয়াছিল।

ধর্ম। 'ততঃ কিম' প্রবন্ধ থেকে

৮। গেটে উদ্ভিদতত্ত্ব সম্বন্ধে বই লিখেছেন। তাতে উদ্ভিদরহস্য প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু গেটের কিছুই প্রকাশ পায়নি অথবা সামান্য এক অংশ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু গেটে যে-সমস্ত সাহিত্য রচনা করেছেন, তার মধ্যে মূল মানবটি প্রকাশ পেয়েছেন। বৈজ্ঞানিক গেটের অংশও অলক্ষিত মিশ্রিতভাবে তার মধ্যে আছে।

সাহিত্য 'সাহিত্য' প্রবন্ধ থেকে

৯। য়ুরোপের কবিকুলগুরু গেটে একটিমাত্র শ্লোকে শকুন্তলার সমালোচনা লিখিয়াছেন; তিনি কাব্যকে খণ্ড খণ্ড, বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন নাই। তাঁহার শ্লোকটি একটি দীপবর্তিকার শিখার ন্যায় ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহা দীপশিখার মতোই সমগ্র শকুন্তলাকে এক মুহূর্তে উদ্‌ভাসিত করিয়া দেখাইবার উপায়। তিনি এক কথায় বলিয়াছিলেন, কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত ও স্বর্গ একত্রে দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।

অনেকে এই কথাটি কবির উচ্ছ্বাসমাত্র মনে করিয়া

লঘুভাবে পাঠ করিয়া থাকেন। তাঁহারা মোটামুটি মনে করেন, ইহার অর্থ এই যে, গেটের মতে শকুন্তলা কাব্যখানি অতি উপাদেয়। কিন্তু তাহা নহে। গেটের এই শ্লোকটি আনন্দের অত্যুক্তি নহে, ইহা রসজ্ঞের বিচার। ইহার মধ্যে বিশেষত্ব আছে। কবি বিশেষ ভাবেই বলিয়াছেন শকুন্তলার মধ্যে একটি গভীর পরিণতির ভাব আছে, সে পরিণতি ফুল হইতে ফলে পরিণতি, মর্ত হইতে স্বর্গে পরিণতি, স্বভাব হইতে ধর্মে পরিণতি।

প্রাচীন সাহিত্য/'শকুন্তলা' প্রবন্ধ থেকে

১০। বন্ধন ও অবন্ধনের সঙ্গমস্থলে স্থাপিত হইয়াই শকুন্তলা-নাটকটি একটি বিশেষ অপরূপত্ব লাভ করিয়াছে। তাহার সুখদুঃখ মিলনবিচ্ছেদ সমস্তই এই উভয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে। গেটে যে কেন তাঁহার সমালোচনায় শকুন্তলার মধ্যে দুই বিসদৃশ্যের একত্র সমাবেশ ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা অভিনিবেশপূর্বক দেখিলেই বুঝা যায়।

প্রাচীন সাহিত্য/'শকুন্তলা' প্রবন্ধ থেকে

১১। কালিদাস দুষ্মন্ত-শকুন্তলার বাহিরের মিলনকে দুঃখে-কাটা পথ দিয়া লইয়া গিয়া অভ্যন্তরের মিলনে সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। এইজন্যই কবি গেটে বলিয়াছেন, তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, মর্ত স্বর্গ, যদি কেহ

একাধারে পাইতে চায় তবে শকুন্তলায় তাহা পাওয়া যাইবে।

প্রাচীন সাহিত্য/'শকুন্তলা' প্রবন্ধ থেকে

১২। জর্মান Faust অল্প অল্প করে পড়তে চেষ্টা করছি। তুমি থাকলে তোমাকে সহপাঠী করা যেত। এ রকম পড়া দুজনে মিলে লাগলেই তবে এগোয়। পড়ার মাঝে মাঝে মৌলবীর বক্তৃতা নায়েবের কৈফিয়ৎ প্রজাদের দরখাস্ত এসে পড়লে জর্মান ভাষা বুঝে ওঠা কি রকম ব্যাপার হয় তা তুমি সহজেই অনুমান করতে পারবে।

চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড

১৩। পড়িতেছিলাম গ্রন্থ বসিয়া একেলা
সঙ্গীহীন প্রবাসের শূন্য সন্ধ্যাবেলা
করিবারে পরিপূর্ণ। পণ্ডিতের লেখা
সমালোচনার তত্ত্ব ; পড়ে হয় শেখা
সৌন্দর্য কাহারে বলে—আছে কী কী বীজ
কবিত্বকলায় ; শেলি, গেটে, কোলরীজ
কার কোন শ্রেণী !

চিত্রা, 'পূর্ণিমা' কবিতার অংশ

১৪। তুমি যে লিখিয়াছ, "উর্বশী বহুকাল পরে একটা কবি-কম্‌প্লিমেণ্ট পাইয়াছেন" সে কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নহে। পৌরাণিক উর্বশী নাম অবলম্বন করিয়া আমি যাহাকে কম্‌প্লিমেণ্ট দিয়াছি,

তাহাকে অনেকদিন হইতে অনেক কবি কম্প্লিমেণ্ট দিয়া আসিতেছেন। গেটে যাহাকে বলেন The Etrnal Woman—Ewig Weibliche, আমি তাহাকে উর্বশী মূর্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছি।

[শিলাইদহ কুমারখালি থেকে ১৩০২ ; ৬ই চৈত্র ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠির অংশ।]

১৫। Then I tried Goethe. But that was too ambitious. With the help of the little German I had learnt. I did go through Faust. I believe I found my entrance to the palace not like one who has keys for all the doors, but as a casual visitor who is tolerated in some general guest room, comfortable but not intimate. Properly speeking, I do not know my Goethe, and in the same way many other great luminaries are dark to me.

'Talk in chine' থেকে

১৬। Dear Sir, I am gladly consent to

become a Patron of the World-Goethe-Honouring which you are organising in Germany. I feel proud to associate myself with your project and thus render my homage to the undying memory of Goethe.

[১৯৩২-এ গ্যেটের মৃত্যুশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে World Goethe Honouring (Welt-Goethe Ehrung) এর পক্ষ থেকে Prof Ch. Kleukens এর আমন্ত্রণের উত্তরে ১১।১০।৩১ তারিখে শান্তিনিকেতন থেকে লেখা চিঠি।]

১৭। কোনো কোনো দেশে যখন অতিমাত্রায় প্রয়োজনের কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায় তখন সেখানে সাহিত্য নির্জীব হইয়া পড়ে। কারণ, প্রয়োজন পরকে আঘাত করে, পরকে আকর্ষণ করে না। জর্মনিতে যখন লেসিং গেটে, শিলর, হাইনে, হেগেল, কাণ্ট, হুমবোল্‌ড সাহিত্যের অমরাবতী সৃজন করিয়াছিল তখন জর্মনির বাণিজ্যতরী-রণতরী ঝড়ের মেঘের মতো পাল ফুলাইয়া পৃথিবী আচ্ছন্ন করিতে ছুটে নাই। আজ বৈশ্য যুগে জর্মনির যতই মেদবৃদ্ধি হইতেছে ততই তাহার সাহিত্যের হৃৎপিণ্ড বলহীন হইয়া পড়িতেছে।'

সাহিত্য/সাহিত্য সম্মেলন

১৮। আমি মনে জানি, অহংকার প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় আমার ছিল না। বহুদিন হইল জর্মন কবিশ্রেষ্ঠ গ্যয়টের কোনো রচনার ইংরেজি তর্জমাতে একটি কথা পড়িয়াছিলাম, যতদূর মনে পড়ে, তাহার ভাবখানা এই যে, বাগানের মধ্যে যে শক্তি গোলাপ হইয়া ফোটে সেই একই শক্তি মানুষের মনে ও বাক্যে কাব্য হইয়া প্রকাশ পায়। এই বিশ্বশক্তিকে নিজের জীবনের মধ্যে ও রচনার মধ্যে অনুভব করা অহংকার নহে। বরঞ্চ অহংকারের ঠিক উল্‌টা, কেননা, এই বিশ্বশক্তি কোন ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ সম্পত্তি নহে, তাহা সকলের মধ্যেই কাজ করিতেছে।

আত্মপরিচয়-এর গ্রন্থপরিচয়

রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে গ্যেটে

যাহা কিছু জ্ঞানের কথা তাহা পূর্বেই চিন্তিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের কাজ, তাহাদিগকে পুনর্বার চিন্তা করা।

যাহা আমাদের বুদ্ধিকে মুক্তিদান করে অথচ সেই সঙ্গে আমাদের আত্মসংযমকে বলদান করে না, তাহা অত্যন্ত অনিষ্টকর।

ঝড়ের আরম্ভে ধুলা অত্যন্ত বেশি করিয়া আলোড়িত হইয়া উঠে—সেই ঝড়ই ধারাবর্ষণের দ্বারা তাহাকে সম্পূর্ণ শান্ত করিয়া দেয়।

আমরা পরস্পরকে অনেক বেশি ভালো করিয়া জানিতে পারিতাম যদি না আমরা পরস্পরের সহিত আপনাকে সমতুল্য করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতাম। বড়লোকের মুশকিল সেইখানে—লোকে নিজের সহিত তাহাদের তুলনা করিতে পারে না, এইজন্য দোষ বাহির করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া থাকে।

যাহা ভালো তাহাই করা কাজের লোকের পক্ষে উচিত বটে, কিন্তু যাহা ভালো তাহা কৃত হইল কিনা তাহা লইয়া নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করিয়া তোলার প্রয়োজন নাই।

অনেক লোকে দেয়ালের উপরে হাতুড়ি ঠুকিয়া

বেড়ায়, মনে করে প্রত্যেক আঘাতটিই বুঝি ঠিক পেরেকের উপর পড়িতেছে।

কোনো সত্য অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে যাহারা চেষ্টা করে তাহারা জ্বলন্ত অঙ্গারকে আঘাত করে—এমনি করিয়া যাহাকে আঘাত করে তাহাকেই চারিদিকে ছড়াইতে থাকে।

পৃথিবীতে মানুষ মহত্তম জীব হইত না, যদি তাহার মহত্ত্ব পৃথিবীর প্রয়োজনের অপেক্ষা অতিরিক্ত না হইত।

অত্যন্ত সদ্ভাব ও সদিচ্ছা সত্ত্বেও প্রতিবেশীকে সহজে জানা যায় না, অসদ্ভাবে যদি আসিয়া পড়ে তবে ত সমস্ত বিকৃত হইয়া যায়।

যে ব্যক্তি নিজের ভাষা ছাড়া কোনো ভাষা জানে না, সে নিজের ভাষাও ভালো করিয়া জানে না।

অল্প বয়সে ভুল-চুকে বিশেষ ক্ষতি করে না, কিন্তু সাবধান হওয়া চাই অধিক বয়সে সেগুলিকে যেন টানিয়া আনা না হয়।

শূন্য আত্মপ্রশংসা সুগন্ধ না হইতে পারে জানি, কিন্তু অন্যের নিন্দার দুর্গন্ধের বেলায় লোকের নাসিকার খোঁজ পাওয়া যায় না কেন?

আমি বলি সকলের চেয়ে সুখী মানুষ সেই—যে জীবনের আরম্ভের সহিত জীবনের পরিণামকে সুগ্রথিত করিতে পারে।

মানুষ এমনি একগুঁয়ে বিপরীত বুদ্ধির জীব যে,
জোর করিয়া তাহার ভালো করিতে গেলে
সে সহিতে পারে না, কিন্তু যাহাতে তাহার
মন্দ করে এমন বহুতর বন্ধন স্বীকার
করিয়া আসিতেছে। সত্য মতকে সাহস
করিয়া প্রকাশ করা কেমন, যেন দাবা বড়ে
খেলার প্রথম বড়েকে ঠিক মত চালা,
সে বড়েটা গোড়াতেই মারা যাইতে পারে
কিন্তু খেলার জিত হইবে।

সত্য জিনিস মানুষের, আর ভ্রম জিনিসটা
ও মানুষের। যথার্থ যত বড় তিনি, তাহার
চেয়ে নিজেকে যিনি বড় না মনে করেন,
তবে তাঁহাকে যত বড় মনে করা যায়,
তাহার চেয়ে তিনি বড়।

যে ইন্দ্রধনু পনেরো মিনিট কাল ধরিয়া টিকিয়া
থাকে তাহার প্রতি কেহ তাকায় না।

যে ব্যক্তি নিজের কথা ঠিক মত করিয়া বলিতে
পারে নাই তাহার কথা ঠিক মত করিয়া
ব্যাখ্যা করিতে না জানাতেই অনেক
বুদ্ধিমান লোকের সুবুদ্ধির অভাব
প্রকাশ পায়।

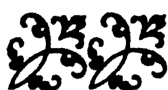
যে সত্যকে অন্যে স্বীকার করিয়াছে তাহাকে
স্বীকার করিলে পাছে স্বাতন্ত্রের খর্বতা হয় এই

আশঙ্কা করার মত প্রমাদ বুদ্ধিমান যুবকের পক্ষে অল্পই আছে।

[প্রবাসী। ১৩১৭। "সংকলন ও সমালোচন" বিভাগ থেকে। স্বাক্ষরহীন।]

শকুন্তলা-শ্লোক

নব-বৎসরের কুঁড়ি তারি এক পাতে
বরষ শেষের পক্ক ফল,
প্রাণ করে চুরি আর তারি এক সাথে
প্রাণে এনে দেয় পুষ্টি বল ;
আছে স্বর্গলোক আর সেই এক ঠাঁই
বাঁধা যেথা আছে মহীতল,
হেন যদি কিছু থাকে তবে তুমি তাই
ওহে অভিজ্ঞান শকুন্তল।



রবীন্দ্রনাথের দান্তে

তাঁর ভাগ্য নিয়ে জন্মানোর সুযোগ পেলে, তাঁর দুর্বহ দ্বীপান্তর, এমনকি তাঁর নৈতিকতার জন্যে, বিনিময় করতে রাজি ছিলাম পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী দেশকেও ; অন্য আরো অনেক কবিতায় বন্দনা গানের মধ্যে একটা বিশেষ কবিতায় এই রকমই ছিল দান্তের সম্পর্কে মাইকেলেঞ্জেলোর প্রশস্তি। যদিও মাইকেলেঞ্জেলোর কবিতাকে দান্তে যা জুগিয়েছে তা 'এসেনসিয়াল বিল্ডিং মেটিরিয়ালস'-ই শুধু, 'স্ট্রাকচারাল বেস' নয়। কিন্তু ছবির বা ভাস্কর্যের মাইকেলেঞ্জেলো দান্তের কাছে পদে পদে কৃতজ্ঞ। সৃজনের সূচনা পর্বের ছবিগুলো ছিল গিয়োতোর কপি, আর দান্তের কবিতাই ছিল তাঁর চিরন্তন প্রেরণা। রঁদার আজীবনের সঙ্গী যে দুজন কবি, তার প্রথম জন হলেন দান্তে, দ্বিতীয় জন বোদলেয়ার। রঁদার কোনো একটা বিশেষ ভাস্কর্যকে যদি আমরা মেলাতে

চাই মহাকাব্যের তুলনায়, পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে উত্তর আসবে একটাই, গেট অফ হেল। সে ভাস্কর্যে দান্তের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ যতখানি, ততখানিই নতজানু কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন চির-প্রিয় ইনফার্নো-কে। নিও-ক্লাসিসিজমের স্তম্ভকে চৌচির ফাটিয়ে নিজের রোমান্টিসিজমের কেশর-ফোলানো ঘোড়াকে বিশ্ববিজয়ের ভঙ্গিতে ছোটাতে চেয়েছিলেন যে দেলাক্রোয়া, জীবনের প্রথম প্রদর্শনীতে টাঙানো তাঁর ছবির নাম 'দান্তে অ্যাণ্ড ভার্জিল, গাইডেড বাই ফ্লেগিয়াস, ক্রস দা লেক হুইচ সারাউণ্ডস দা ওয়ালস্ অফ দা ইনফারনাল সিটি অফ ডিস।' চব্বিশ বছর বয়সে আঁকা তাঁর ঐ প্রথম প্রদর্শিত ছবির দিকে তাকিয়েই বুঝবার মতো সমালোচকেরা বুঝে গিয়েছিলেন যে ফরাসি দেশ জন্ম দিতে চলেছে আর-এক মর্ত-সূর্যের। কিন্তু দেলাক্রোয়ার ছবিতে দান্তের আবির্ভাব ঐ একবারই নয়। স্বয়ং দান্তে এসেছেন বহুবার। আর দান্তের কবিতা তাঁর সংখ্যাতীত শ্রেষ্ঠ চিত্রমালার প্রধানতম অবলম্বন।

মৃত্যুর আগের শেষ দুটো বছর দান্তেকেই উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন ব্লেক। একদিকে ব্যস্ত ইতালীয়ান ভাষা শিক্ষায়, যাতে দান্তেকে পড়তে পারেন তাঁর মাতৃভাষায়, অন্যদিকে দান্তের কবিতাকে চিত্ররূপময় করে তোলার প্রয়াসে দিন ও রাতের প্রহর জোড়া

তপস্যা। শেষ পর্যন্ত আঁকা ছবির সংখ্যা দাঁড়াল একশ দুই। আর তা থেকে এচিং-এর সংখ্যা সাত। কিছু রয়ে গেল অসমাপ্ত, মৃত্যু নির্মম হাতে তাঁর হাতের তুলিকে ছিনিয়ে নেওয়ায়। যে ছবিতে দান্তে ও ভার্জিল এসে পৌঁচেছেন নরকের দ্বারদেশে, তার শিরোভাগে দান্তের কবিতার পংক্তি উদ্ধৃত করলেন তিনি নিজের হাতে লিখে এবং তা ইতালীয়ান অক্ষরে।

সত্তরে পা দিয়ে নিজের আত্মচরিত লিখছেন যখন উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়ামস, তাঁর মনে পড়ছে শৈশবের সেই সব দিন : মা আঁকছেন ছবি, আর নারী-শরীরের রহস্যময় গড়নের খোঁজে ঘেঁটে চলেছেন গুস্তাভ ডোরে-র অলঙ্কৃত 'ডিজাইন কমেডি'র পাতাগুলো।

ভারতীয় শিল্পীদের কেউ কি কখনো চিত্রায়িত করেছেন দান্তেকে ? এর সঠিক উত্তর হবে হয়তো 'না'-ই। তবে একজন ভারতীয় শিল্পীকেই জানি শুধু আমরা, যিনি জাপান থেকে ফেরার সময় স্টিমারে বসে এঁকেছিলেন দান্তের একটা প্রতিকৃতি। সে ভারতীয় শিল্পীর নাম, রবীন্দ্রনাথ। তখন তাঁর বয়স উনসত্তর।

ভারতীয় কবিদের মধ্যে প্রথম দান্তে-বন্দনা সম্ভবত মাইকেল মধুসূদনের কলমে, চোদ্দটি পংক্তির

সনেটে আর সেই সঙ্গে ইতালির রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলকে পাঠানো সাত/আট পংক্তির চিঠিতে। আরও একটু পরে মাইকেলের কবিতায় দান্তের অনুপ্রবেশ। মেঘনাদবধ কাব্যের অষ্টম স্বর্গের ভিতরে আক্ষরিক অনুবাদও ঢুকে পড়েছে দান্তের দুটি পংক্তির। আরও একটু পরে, আরো কিছু কবি সবিনয়ে স্বীকার করেছেন দান্তের কাছে তাঁদের ঋণভার। হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের 'ছায়াময়ী' আর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ'-এর অনেক অংশ দান্তের নরকের আলোয় রক্তিম। কিন্তু, খণ্ডিত হলেও, কেউ কি তখনো পর্যন্ত লিখেছিলেন দান্তের জীবনকাহিনী, অথবা তাঁর জীবন-ছোঁয়া কোনো পর্যালোচনা? হ্যাঁ, মাইকেলের দান্তে-বন্দনার তেরো বছর পরে একজন অভিভূত ভারতীয় কবির রচনায় আমরা পেয়ে যাই 'বিয়াত্রিচে দান্তে ও তাঁহার কাব্য' নামের একটি প্রবন্ধ, ইতালীর স্বপ্নময় কবির জীবনগ্রন্থের মূল কেন্দ্রে ক্রমাগত মৃদু রক্ত ক্ষরণের মতো প্রেম-কাতরতাকে স্বর্গীয় শান্তিতে স্নান করিয়ে নেওয়ার যে আত্মদীর্ণ অধ্যায়, তারই উন্মোচনে। সে ভারতীয় কবির নাম, রবীন্দ্রনাথ। তখন তাঁর বয়স আঠারো।

ঐ আঠারোতেই দান্তের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। তখন আমেদাবাদে। বিলেত যাওয়ার

প্রস্তুতি-পর্ব চলেছে সেখানে। ইংরেজিতে কাঁচা, বই পড়েন ডিকশনারি পাশে রেখে। সেই সময়ই শখ হল, বাংলায় লিখবেন ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস। মেজদা সত্যেন্দ্রনাথকে বই-পত্রের জন্যে অনুরোধ। এসে গেল রাশি রাশি ইংরেজি ভাষা আর সাহিত্যের বই। পড়ার সমান্তরালে চলল লেখা। আর সে সব লেখা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছাপা হল 'ভারতী'তে। ভারতী একই সঙ্গে তাঁর আত্মনির্মাণের গ্রীনরুম, আবার প্রথম প্রবল আত্মপ্রকাশের মুক্তমঞ্চও। বাংলা-ভাষায় প্রথম তুলনা-মূলক সাহিত্যালোচনার সূচনাও ঘটিয়েছেন তিনি সেইখানে, মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনায়, আগের বছর। সে-রচনায় প্রসঙ্গ সূত্রেই মিলটন, শেকস্‌পীয়র, রামায়ণ, আর জোসেফ অ্যাডিসনের ট্র্যাজেডি 'কেটো' থেকে উদ্ধৃতি। দান্তের ডিভাইন কমেডি তাঁর হাতে এসেছে একটু পরে। বিশ্বভারতীতে পাওয়া সে বইয়ে দেখা যায় 'নরক' পর্বের এক জায়গায় পেন্‌সিলের দাগ, মাইকেলের নরক-বর্ণনার উৎস বুঝতে পেরে।

১২৮৫-র ভারতীতে, এর পরেই, পরপর ৬টা প্রবন্ধ। যার তৃতীয় প্রবন্ধের নাম, 'বিয়ত্রিচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য'। তার পরের দুটো প্রবন্ধ 'পিত্রার্কা ও লরা' আর 'গ্যেটে ও তাঁহার

প্রণয়িনীগণ'। এ দুটো রচনাতেও অভ্রান্তরূপে এসে গেল দান্তের কথা। আর দান্তে সম্পর্কিত প্রবন্ধটিতে 'ভিটা নুওভা' এবং 'ডিভাইন কমেডি' থেকে অনুবাদও করলেন তিনি একাধিক।

অনতিস্ফুট ঐ আঠারো থেকে সুপরিণত উনসত্তরের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথে ইতস্তত ছড়ানো কিছু মন্তব্য বাদ দিলে আর কোথাও তেমনভাবে চোখে পড়ে না দান্তের উপস্থিতি। ১৯২৪-এ চীনদেশের ভাষণে তিনি দান্তে না-পড়ার পক্ষে যে যুক্তি দেখালেন, সেও খুব বিস্মিত করে আমাদের। ইংরেজির মাধ্যমে তিনি তো আরো অজস্র বই-এর সঙ্গেই বন্ধুত্ব পাতিয়েছেন জীবনে। তাহলে দান্তের বেলাতেই কেন মনে হল যে নিবৃত্ত হওয়াটাই কর্তব্য? কেন ভেজিয়ে দিলেন খোলা বইয়ের দরজা, স্বেচ্ছায়?

আবার এও বুঝতে পারি দান্তেকে 'closed book' বলেছেন তিনি যদিও, তাঁর অতল-চেতনায় নিশ্চয়ই বোঝাপড়ার একটা মৃদু স্রোত থেকে থেকেই বয়ে চলেছিল, নইলে হঠাৎ যখন দান্তেকে আঁকলেন, কি করে ফুটে উঠবে তাঁর প্রোফাইলে অমন স্বর্গ-মুখী উন্মুখতা, কেনই বা তাঁকে স্থাপন করবেন স্বর্গমর্তের মাঝখানে, কেনই বা ছবির সমগ্র পরিধির নীচের অংশে ছেড়ে রাখবেন অতখানি ফাঁকা জায়গা,

কেনই বা জ্যোতিস্নাত মেঘলোকের কাছাকাছি
পেঁাছে দেবেন তাঁর মুখাবয়ব ?

২

রবীন্দ্রনাথ, তাঁর সমগ্র জীবনের প্রেক্ষিতে আমাদের
প্রত্যাশা না মিটিয়ে দান্তে সম্পর্কে মিত-কথন করে
থাকুন যতখানি, তাঁর সমগ্র সৃষ্টির আলোচনায়
দান্তের কথা এসে যায় তবু বারবার।
দেশকালে বিচ্ছিন্ন দুই মহাপ্রতিভার
সাদৃশ্য সন্ধানে কখনো, কখনো বা পার্থিব
অচিরস্থায়ী, আকাঙ্ক্ষা উদ্বেল প্রেমের শাশ্বতরূপের
দুই দক্ষ চারণ হিসেবে। আবার দান্তের পাশে
যখন শুধু বিয়োত্রিচে, অর্থাৎ সংকটটা শুধুমাত্র
পরমাকে পাওয়া, না পাওয়ার ; তখন রবীন্দ্রনাথকে
যদি বা কিছু ঘনিষ্ঠ মনে হয় দান্তের, দান্তের পাশে
যখন নরক অর্থাৎ অভিজ্ঞতাকে প্রজ্ঞায়
রাঙানোর সুকঠিন তপশ্চর্যা পালনের দায়, তখন
রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় নিষ্করুণ হয়ে ওঠেন কেউ
কেউ, নরক-পর্যটন-তুল্য অভিজ্ঞতার তীব্র দহন
ছাড়াই তাঁর শুদ্ধি-স্বর্গে পেঁাছে যাওয়া দেখে।
শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, বোদলেয়ারের প্রসঙ্গেও এরই
উল্টোদিকের প্রশ্নটা তুলেছিলেন এলিয়ট, যার
জবাবে বুদ্ধদেব বসুকে লিখতে হয়েছিল যে,

এলিয়টের প্রস্তাবে—"বোদলোয়ারে নরক-পরিক্রমা থাকলেও স্বর্গ নেই, আর সেখানেই তাঁর কাব্যের ঊনতা। কিন্তু নরক, শোধনগার ও স্বর্গের বিভেদ দান্তের মনে যেমন গাণিতিকভাবে সত্য ছিল, আধুনিক বোদলেয়ারের পক্ষে তেমনটি সম্ভব ছিল না···"

এছাড়াও দান্তের প্রসঙ্গে আসে অন্যভাবে, দান্তের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের স্বগত-ভাষণ বা স্বাগত-সম্ভাষণের অনুরণন তাঁর নিজের সাহিত্যের ভিতর মহলে কোথায় কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত, সে অনুসন্ধানের দায়িত্বেও।

এলিয়টের মতো রবীন্দ্রনাথ কোথাও বলে যাননি তাঁর সারা জীবনের কবিতায় দান্তে কীভাবে ধূপের মতো জ্বলে গেছেন নীরবে, সংগোপন সৌরভ ছড়িয়ে। এলিয়ট তাই নাম করতে পারেন নি কোনো বিশেষ কবিতার, দান্তের কাছে তাঁর পরোক্ষ-ঋণের পরিমাণ এত বেশি বলেই। রবীন্দ্রনাথ বলে যাননি, তবুও আজকের সমালোচকেরা অনুমান করে নিতে পারেন অনেকখানি। সাহিত্য সমালোচনার সঙ্গে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের গভীর সাদৃশ্য এইখানে যে তাকেও না-থাকার অনেক টুকরো-টাকরা খুঁড়ে খুঁজেই গড়ে তুলতে হয় এক বিরাট থাকার

সম্ভাব্যতা। সেইভাবেই, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-অভ্যন্তর খুঁড়ে পাওয়াও গেছে অনেক দান্তে চিহ্ন।

১। "রবীন্দ্রনাথের চব্বিশ বছর বয়সে লেখা 'পুষ্পাঞ্জলি'-র কল্পনাপটে কি 'ভিতানুওভা'-র প্রচ্ছায়া ছিল কিছু ? এ প্রশ্নটা এখানে মনে ওঠে। দান্তে বিষয়ক রচনাটিতে তিনি ভিতা নুওভার অনুবাদ ব্যাখ্যা করেছেন এর মাত্র সাত বছর আগে। পুষ্পাঞ্জলি-র পাণ্ডুলিপিতে গদ্যাংশের সঙ্গে একটি গানও দেখা যায় ('কেহ কারো মন বোঝে না') এবং 'যে গেছে সে সমস্ত জগৎ হইতে তাহার লাবণ্যচ্ছায়া তুলিয়া লইয়া গেছে' ধরনের উচ্চারণ অনিবার্যভাবে মনে ধরিয়ে দেয় দান্তেকে : After this gentlest of women had left this world, our city remained as though widowed and despoiled all dignity.'
(গ. ৩১)

অথবা আরও দু-একটি অংশ : 'সে আমার জীবনের খেলাঘর এখান হইতে ভাঙিয়া লইয়া গেছে— যাবার সময় সে আমার কাছে কাঁদিয়া গেছে, যাবার সময় সে আমাকে তার শেষ ভালোবাসা দিয়ে গেছে' এর সঙ্গে যদি তুলনা করি 'Since she fled to heaven so suddenly leaving love here to

lament with me' (কা. ৪)

বা 'তবে এই অতিশয় কঠিন নিয়মের মধ্যে আমি থাকতে চাই না। আমি সেই বিস্মৃতদের মধ্যে যাইতে চাই—তাহাদের জন্য আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে'-এর সঙ্গে :

'So now I call Death here
As my sweet and soothing rest.
Crying 'come' ; with so
impassioned a sigh
I am jealous of all men who die'.

(কা.৫.)

শঙ্খ ঘোষ। 'চণ্ডীদাস বা দান্তে'র পাদটীকা থেকে

২। "রবীন্দ্রনাথের নৈতিক দৃষ্টিতে নরকের কোন স্থান ছিল না—তাঁর কাছে কল্যাণের অর্থ ঐশ্বরিক করুণাপ্রভাবে স্বর্গলোক উত্তরণ নয়, বরং তা হচ্ছে পূর্ব নির্দিষ্ট সৃষ্টি শৃঙ্খলার অবদান ; যন্ত্রনাদায়ক কঠোর নিগ্রহের সুখপ্রসূ উপসংহার নয়, বরং স্বর্গীয় বিধানে নির্ধারিত মানবাত্মার এক উন্নয়ন যেখানে পাপের স্থান নেই।····তথাপি অংশত ব্রাহ্মনীতিবাদে পাপ চেতনার জন্য এবং অংশত উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় জীবনধারার আত্মিক জটিলতার জন্য মাঝে মধ্যে ও সীমাবদ্ধ পরিমাণে রবীন্দ্র-চিত্তেও পাপ ও প্রায়শ্চিত্তের

উপলব্ধি ছিল। এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ১৮৯৭-এ রচিত ও 'কাহিনী'-র অন্তর্ভুক্ত হয়ে ১৯০০-তে প্রকাশিত নাট্যকাব্য 'নরকবাস'। এ এক রাজার কাহিনী যিনি পুরোহিতের নিষ্ঠুর আদেশে নিজ শিশুপুত্রকে অগ্নিযজ্ঞে আহুতি দিয়ে আপন রাজধর্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। পরে অনুতপ্ত পিতা উপলব্ধি করতে পারেন এই পুত্রাহুতি কেবল তাঁর রাজকীয় আত্মাভিমান ছাড়া আর কিছুই নয় এবং নিজ গৌরব বৃদ্ধির জন্যে তিনি পিতৃস্নেহের পবিত্র নীতিই লঙ্ঘন করেছেন। যখন তিনি স্বর্গাভিমুখে চলেছেন তখন পথে নরকে তাঁর পুরোহিতকে দেখতে পেলেন এবং নিজেকেও সমতুল্য পাপী বিবেচনা করে নরকবাসের সিদ্ধান্ত করলেন। এখানে নরকের বর্ণনায় ইন্‌ফেরনো-র ভয়ঙ্কতার কিছুটা ফুটেছে। এডওয়ার্ড টমসন এটা লক্ষ্য করেছেন ও বলেছেন :

Nothing could be better than the atmosphere of vagueness a misty reigion of voices of Dante's Hell, with which 'A Sajourn of Hell' opens."

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ।। বাংলা সাহিত্যে দান্তে

৩। "রবীন্দ্রনাথের রচিত দান্তেচিত্র তাঁর মনের অনাবিষ্কৃত প্রবণতা ও অভিমুখিতার একটি স্মৃতিধার্য নিদর্শন।

অন্তত সতেরো বছর বয়স থেকেই এই গোপন গঙ্গোত্রীর সূত্রপাত। সেই সময়ে 'বিয়োত্রিচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য' (ভারতী, ভাদ্র ১২৮৫) প্রবন্ধটি যে নিছক আকস্মিক বিস্ময় থেকে রচিত হয়নি, উদ্ধৃতির সাহায্যে সেটা প্রমাণ করা যেতে পারে— অতিকল্পনার আশ্রয় না নিয়েও এই সিদ্ধান্তে নীত হওয়া সম্ভব, এই পর্যালোচনায় রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের কাব্যমীমাংসার অস্থির সূচনা ব্যক্ত হয়েছে। প্রথমত, জীবন ও কবিতাকে একটি অবিভাজ্য রচনাকর্ম হিসেবে গণ্য করার যে-আগ্রহ পরবর্তীকালে তাঁর নন্দনতত্ত্বে অন্যতম উচ্চারণ হয়ে উঠেছে, এখানে তার পূর্বলেখ দেখতে পাওয়া যায়। দুই, প্রদত্ত বিশ্লেষণের শেষ অংশের ঘনিষ্ঠ পাঠকের পক্ষে এটি এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব যে এখানে জাতক-কবিগুরুর অতৃপ্ত, আত্মবিব্রত, সংগ্রামলাঞ্ছিত মনের উত্তরণের কান্না সংহত হয়ে আছে। অতঃপর এই উত্তেজনার শান্তায়ন (sublimation) ঘটেছে এবং দান্তের কাব্যে কবির রূপকসন্ধান ও 'ভিটা নুওভা' থেকে তাঁর তর্জমা পর পর পাঠ করলে বোঝা যায় তিনি নিজেও এর সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন—"

আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ॥ দান্তে ও আমাদের আত্মপ্রতিকৃতি

কিন্তু, এসব সত্ত্বেও, দান্তে এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ব্যবধানও দুস্তর। সে-ব্যবধানও অনালোচিত থাকেনি আমাদের সাহিত্যে। 'ইঙ্গিতের মহান শিল্পী' রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বাসের ভূমিতে নেই দান্তের মতো কোনো ধর্মতত্ত্ব' এ কথা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু। পরে আবো একবার, তাঁর 'কবি রবীন্দ্রনাথ'-এর এক জায়গায় জানিয়েছিলেন—

"উপনিষদের ব্রহ্ম, গীতার পরামাত্মা, দান্তের 'চরম', জয়দেবের গোবিন্দ—এবং কোনোটার সঙ্গেই রাবীন্দ্রিক ভগবানের সাদৃশ্য নেই";

বিষ্ণু দে আমাদের নজর টানতে চেয়েছিলেন আরো গোড়ায়, শিকড়ে—

"দান্তের কাব্যের গভীর রসাভাসের সুগঠিত বিন্যাস একালের কবির মধ্যে এখনো পর্যন্ত আশা করাটাই মূঢ়তা।"

অবশ্য বিষ্ণু দে যখন তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ, ইয়েটস, পাউণ্ড' নামের দীর্ঘ রচনায় 'গীতাঞ্জলি' বিষয়ে পাউণ্ডের 'আশ্চর্য গভীর' এক প্রবন্ধের অনুবাদ করে শোনান, সেখানে দান্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একাত্মতার ছবি ফুটে ওঠে, অনেকটা মাতিস-পিকাসোর এচিং-এর মতো, অল্প কয়েকটি কিন্তু তীক্ষ্ণ ও সরল রেখার টানে।

১। "এতে প্রমাণ হয় যে, দান্তে-কথিত তিনটি মহাকাব্যের বিষয়ই রবীন্দ্রনাথের আয়ত্তে : প্রেম, জাতীয়তা বা যুদ্ধ, আর আত্মিক মহাত্ম্য।"

২। "এখনো ঠাকুর মশায়ের অননূদিত অন্যানা রচনা সম্বন্ধে বলবার সময় আসে নি। যে বইটি সামনে রয়েছে, তার সঙ্গে তুলনায় আমার জানা একটি বইই শুধু মনে পড়ছে, দান্তের পারাডিসো।

Ecco chi crescera linostri amori

(ঐ দেখ ! আমাদের প্রেমগুলি যিনি বিকশিত করেন) দান্তে চতুর্থ (?) স্বর্গে ঢুকে সহস্র আত্মার এই গান শোনেন। অবশ্য ব্রাহ্ম সমাজের কণ্ঠস্বর অন্যরকম, তার অতিন্দ্রীয় ভক্তি ততটা আবেগময় নয়, বরং শান্ত। এ রকম কথা—
Poiche fur gioconde della faccia di dio (যেহেতু ঈশ্বরের মুখশ্রীতে এদের আনন্দ) প্রাচ্যের স্তব্ধতা ভেঙে দেবে বলেই মনে হয়। বোধহয় স্বর্গের মৌমাছিরা গোলাপের মধ্যেই অস্ফুট, এই দিব্যচিত্রই রবীন্দ্রনাথের মানস-লোকের চাবি।"

এমন প্রশান্ত প্রশস্তির পরও জিজ্ঞাসা জেগে থাকে কোথাও, কেউ কেউ জেগে ওঠেনও জিজ্ঞাসায়। জানতে চান, কোন্ দান্তে

রবীন্দ্রনাথেই উন্মীল নয় শুধু, শেষ পর্যন্ত, কোন্ দান্তে বাংলা সাহিত্যে পেল চিরস্মরণীয়তার উদ্ভাস। প্রজ্ঞার, না প্রেমের। কি জোগাল চিরপাথেয় হিসেবে, 'প্রেমের তাপ, না প্রজ্ঞার প্রভা?' কিন্তু কেন হয়ে উঠল না প্রেম ও প্রজ্ঞার মিলনক্ষেত্র, সে ব্যথিত প্রশ্ন শঙ্খ ঘোষের। তারও আগে তোলেন পাপ-বোধের প্রশ্ন, খ্রীস্টীয় পাপ ও পরিত্রাণের ছবি আমাদের মনে ও শিল্পে কোনো স্পষ্ট আলোড়ন তোলেনি কখনো কেন? তাঁর অনুমান, এর শিকড় আমাদের অতি-সরল ধর্মবিশ্বাসে, যা সব সময়েই এড়িয়ে যায় অস্তিত্বের জটিলতা। দৃষ্টান্তের জন্যে তিনি টেনে আনেন সুপ্রাচীন গীতাকেও, গীতার অর্জুনকেও, যার মহান নৈতির সমস্যাও মিটে গিয়েছিল নিমেষে, অভিজ্ঞতাময় উত্তরণ-পর্বকে এড়িয়ে।

দান্তের সঙ্গে চণ্ডীদাসের, আর সেই সূত্রে বিয়াত্রিচের সঙ্গে রামীকে মিলিয়ে বিষ্ণু দে'র স্তোত্র 'চির অস্থির উদাত্ত এক শান্তি/যেমন জেনেছে চণ্ডীদাস বা দান্তে', আবার রবীন্দ্রনাথেও এর হুবহু সমর্থন খুঁজে পেয়ে, তাঁর সংক্ষোভ গড়ে তোলে এইরকম প্রশ্নময় সিদ্ধান্ত।

"এখনও পর্যন্ত তাহলে আমাদের কাছে মরমী প্রেমের এই বোধের মধ্যেই গচ্ছিত আছে দান্তের পরিচয়। মধুসূদন-দ্বিজেন্দ্রনাথ-হেমচন্দ্রের বিলাসী নরকভাবনা সরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু হয়েছিল, প্রেমিক দান্তের গান। তাই নরকে নয় আর, আলোড়িত হৃদয়ের জটিল ছবি আনতে গিয়ে এই শতাব্দী বারংবার ফিরে তাকিয়েছে পাওলো-ফ্রাঞ্চেস্কার প্রেমকাহিনীতে।"

এসব যেমন সত্যি, তেমনি আরো সত্যি দান্তেরও নবজাগরণ। দান্তেও আজ আর থাকছেন না কেবল প্রেম ও প্রজ্ঞার সমন্বয়ের কবি। অথবা প্রেতলোক, শুদ্ধিলোক আর স্বর্গলোক উদ্‌ঘাটনের কবি। মধ্যযুগের সীমায় আটকানো তাঁর নানা অসংগতিময় মহান আশা আজ হয়ে উঠেছে রেনেশাঁসী মানব-বিশ্বাসের আদি-মন্ত্র। এরিখ অয়েরবাখ-এর 'দান্তে পোয়েট অফ দা সেক্যুলার ওয়র্ল্ড'-এর শেষ পর্বে আমাদের পৌঁছে দেন যেখানে, তার থেকে কিছু উদ্ধৃতি এখানে অবশ্যই প্রাসঙ্গিক।

"It is generally acknowledged that the Renaissance represents a unit in the history of European culture

and that the decisive element of its unity was the self-discovery of the human personality ; and it is also generally recognized that, despite Dante's medieval view of the world, the discovery began with him."

একটু পরেই—

"In the early Middle ages the historical sense had been dulled—the image of man was reduced to a moral or spiritualist abstraction, a remote legendary dream, or a cosmic caricature ; in short man was removed from his natural historical habit. With Dante the historical individual was reform in his manifest unity of body and spirit ; he was both old and new, rising from long oblivion with greater power and scope than ever before".

আবিষ্কারের সূচনা হতে পারে এখান থেকেই
আবার, ব্যক্তিমানুষের মর্যাদাময় ঐতিহাসিক
অভ্যুত্থানকে মনে রেখে। হয়তো পাউণ্ড এরই
আভাস দিয়েছিলেন আরো আগে, বিষ্ণু দে'র
অনুবাদে যা আমরা পড়ি—
"তাঁর মধ্যে প্রকৃতির স্তব্ধতা সমাহিত।
কবিতাগুলি মানসিক জলঝড় বা আগুনে তৈরি
নয় বলে লাগে, মনে হয় তাঁর স্বাভাবিক
মনের ধারণাটাই এইরকম। প্রকৃতিতে তিনি
মিল পেয়েছেন, সেখানে তাঁর কাছে কোনো
বৈষম্য বা বিরোধ নেই। প্রতীচ্য রীতির
সঙ্গে এইখানে তাঁর দারুণ তফাৎ,
'মহৎ নাটক' আমরা লিখতে পারি মানুষ
আর প্রকৃতি দ্বন্দ্বের বিষয়েই।
হেলেনিক ধারণা যে, মানুষ দেবতার হাতের
পুতুল মাত্র, এবং কি দেবতা কি মানুষ, উভয়েই
ভাগ্যের ক্রীতদাস, এ ধারণা প্রাচ্য কবিতার
বিপরীত।
ছ মাস আগে আমি রেনেশাঁসের মানবধর্ম প্রসঙ্গে
লিখেছিলুম মানুষ মানুষ নিয়েই জড়িত, ভুলে
যায় সমগ্রকে, দেশকাল সন্ততি। ফলে পাই
প্রথমে নাট্যের যুগ, তারপরে গদ্যের।
এ জাতের মানবধর্ম আজ স্রোত হারিয়ে শুকনো,

মনে হয় বাংলা থেকে বুঝি তার সংশোধন ও
সুসমীকরণ এল।”
দান্তে এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যোগসূত্র গেঁথে
দিতে পারে হয়তো আরো এক উদ্যম।
রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি শরীরের চারপাশ থেকে
সবরকম দিব্য দ্যুতির টাঙানো মশারীটাকে
গুটিয়ে-সরিয়ে আজ তো আমরা গড়ে তুলতে
চাইছি সেইরকম এক রবীন্দ্রনাথকে, অয়েরবাখের
দান্তের মতোই যাঁকে আমরা মিলিয়ে দেখতে
পারি ‘a physical, an ethical and a
Historico-Political system’-এর ত্রিধারায়।
দান্তে ডিভাইন কমেডি লেখেন নি। লিখেছিলেন
শুধু কমেডি, কম্মেদিয়ানা। ‘ডিভাইন’ বিশেষণটা
আরোপিত হয়েছে দু শতাব্দী পরে, স্খালনহীন
অপরাধ সম্পর্কে সহসা-সজাগ-হয়ে-ওঠা
স্বদেশবাসীর প্রায়শ্চিত্ত-প্রয়াসের অতি গরজে।
সুতরাং তাঁর সম্পর্কেও আমরা তো ভুলে থাকতে
পারি সবরকম দিব্যতা। আর ওরকম ভুলে থাকার
পরিণামে ক্ষতির চেয়ে লাভের ঘরেই জমা পড়বে
বেশি, কারণ ক্রমশই তো উদ্‌ঘাটিত হয়ে
চলেছে স্বর্গে-মর্তে-নরকে মানুষ এবং প্রকৃতি,
প্রেম এবং যন্ত্রণা, জল এবং আগুনের যা কিছু
বুনেছেন সে কমেডিতে, তার সবই প্রখর বাস্তব

থেকে খুঁটে নেওয়া। কিংবা তারও চেয়ে বেশি। কেননা ঐ কমেডিই একদিকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অন্যদিকে তাঁর সমকালের পাঁচশোরও বেশি সমাজিক এবং রাজনৈতিক মানুষের ঠিকুজী-কাষ্ঠী। তাঁব সৃষ্টি-সাফল্যের জোর, বাস্তবতাবোধেরই জোর। উইল ডুরাণ্ট যখন বলেন, দান্তে যে পরবর্তীকালে নবক বর্ণনা করবেন তার কারণ জ বিতাবস্থায় প্রতিদিনই পুড়িয়ে মারা হয়েছে তাঁকে নরকের আগুনে আর এই পৃথিবীতে নরকের প্রায় সমস্ত স্তর ভেদ করেই ছিল তাঁর চলা-.ফরা, আর প্যারাডাইস যে তাঁর বর্ণনায় কম উজ্জ্বল তার কারণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভাব, তখন তো স্বর্গের থেকে মাটির দিকেই নেমে আসতে চায় আমাদের তাকিয়ে-দেখার চোখ। হয়তো 'দান্তের উপলব্ধির শাশ্বত জিনিসে মরচে পড়ে গেছে অনেকদিন হলো' এই অপ্রিয়-ভাষণের মধ্যে দিয়ে জীবনানন্দও শাশ্বতের বদলে শাশ্বতে পৌঁছে দেওয়ার বাস্তব উপকরণের দিকেই দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন আমাদের।

এই রচনার শেষে রবীন্দ্রনাথ-অনুদিত দান্তের কবিতা সংকলিত হয়েছে ভারতীর দান্তে-বিষয়ক রচনা থেকে। ঐ রচনায় গদ্যাংশের ফাঁকে ফাঁকে

যে-ভাবে কবিতাগুলো এসেছে, তার ধারাবাহিকতার
সূত্রেই কবিতাংশের সংখ্যা এখানে ১৩।
আসলে তিনি 'ভিতা নুওভা' থেকে অনুবাদ
করেছেন সাতটি আর 'ইনফার্নো' থেকে ছটির।
এ-রচনায় সংকলন-সংখ্যার হিসেবে ১ থেকে ৭
'ভিতা নুওভা' থেকে ৮ থেকে ১৩ 'ইনফার্নো'
থেকে।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় দান্তে

১। "I myself tried to get at the wealth of beauty in the literature of the European languages. When I was young I tried to approach Dante, unfortunately through a translation. I failed utterly, and felt it my pious duty to desist, Dante remained a closed book to me."

Talks in Cniha

২। 'বিয়াত্রিচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য' নামের পূর্ণাঙ্গ রচনা।

ভারতী ॥ ভাদ্র ১২৮৫

৩। "একথা বোধহয় বলাই বাহুল্য যে দান্তের মত পিত্রার্কও একজন প্রখ্যাতনামা ইতালীয় কবি ছিলেন। দান্তে যেমন তাঁহার মহাকাব্যের মহানভাব দ্বারা সমস্ত ইউরোপমণ্ডল উত্তেজিত করিয়াছিলেন, পিত্রার্কাও তেমনি তাঁহার সুললিত গীতি ও গাথা দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু দান্তে ও পিত্রার্কে আবার অনেক বিষয়ে এমন সৌসাদৃশ্য ছিল যে সকল বিষয় উল্লেখ করিতে হইলে আমাদের এই প্রবন্ধটি দীর্ঘকায় হইয়া পড়ে।

দান্তের যেমন বিয়াত্রিচে, পিত্রার্কার তেমনি লরা। দান্তের ন্যায় তাঁহার লরাও অপ্রাপ্য, অনধিগম্য, দান্তের ন্যায় তিনিও দূর হইতে লরাকে দেখিয়াই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন।”

পিত্রার্কা ও লরা ॥ ভারতী, আশ্বীন, ১২৮৫

৪। “দান্তে ও পিত্রার্কার প্রেম প্রেমের আদর্শ, আর গেটের প্রেম পার্থিব অর্থাৎ সাধারণ। গেটের জীবনে একটি প্রেম আখ্যান শেষ হইলে, অমনি তাহা লইয়া তিনি নাটক রচনা করিতেন, দান্তে বা পিত্রার্কার ন্যায় কবিতা লিখিতেন না।

গেটে তাঁহার নিজের প্রেম নাটকে গ্রথিত করিতে পারিতেন, সাধারণ লোকেরা তাহাতে তাঁহার নিজ-হৃদয়ের আভাস পাইত। কিন্তু বিয়াত্রিচের প্রতি অভিবাদনে, দান্তের হৃদয়ে যে ভাবতরঙ্গ উঠিত, তাহা তিনি কবিতাতেই প্রকাশ করিতে পারিতেন, তাহা দান্তে ভিন্ন আর কাহারো মুখে সাজিত না।....”

গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ ॥ ভারতী ॥ ফাল্গুন, ১২৮৫

৫। “দান্তের কাব্যে দান্তের জীবন জড়িত হইয়া আছে, উভয়কে একত্রে পাঠ করিলে জীবন

এবং কাব্যের মর্যাদা বেশি করিয়া দেখা যায়।”

সাহিত্য, কবিজীবনী

৬। “বিয়াত্রিচে দান্তের কল্পনাকে যেখানে তরঙ্গিত করে তুলেছে সেখানে বস্তুত একটি অসীম বিরহ। দান্তের হৃদয় আপনার পূর্ণচন্দ্রকে পেয়েছিল বিচ্ছেদের দূর আকাশে।”

পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি

৭। “একদিন হঠাৎ পথের একটা বাঁকের মুখে সৌন্দর্যের যে আশ্চর্য দান নিয়ে ভাগ্যলক্ষ্মী তার সামনে দাঁড়িয়েছিল সে যেন অলৌকিক ; তেমন অপরিসীম ঐশ্বর্য প্রত্যক্ষ হবে ওর জীবনে, সে-কথা এর আগে ও কখনই সম্ভব বলে ভাবতে পারে নি, কেবল তার কল্পরূপ দেখেছে কাব্যে, ইতিহাসে ; বারেবারে মনে হয়েছে দান্তে-বিয়াত্রিচে নূতন জন্ম নিল ওদের দুজনের মধ্যে। সেই ঐতিহাসিক প্রেরণা ওর মনের ভিতরে কথা কয়েছে, দান্তের মতোই রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের আবর্তের মধ্যে অতীন পড়েছিল ঝাঁপ দিয়ে,…”

চারঅধ্যায়

৮। “বৈজ্ঞানিক হাতিয়ারের যোগে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বড় ও সংখ্যায় বহুল হয়েছে অর্থাৎ মানুষ হয়েছে giant, কিন্তু স্বয়ং তাতে বড় হয়নি। মানুষের Personality-র মহত্ত্বর চেয়ে

তার সাংসারিক সুবিধাসাধনের সুযোগ বড় নয়। এইজন্যেই কলকারখানা নিয়ে কোনো আধুনিক দান্তে Vita Nova লিখবে না—কারণ ওতে নূতন থাকতে পারে কিন্তু Vita নেই।"

চিঠিপত্র। একাদশ খণ্ড

৯। বিয়াত্রিচে দান্তের কল্পনাকে যেখানে তরঙ্গিত করে তুলেছে সেখানে বস্তুতঃ একটি অসীম বিরহ। দান্তের হৃদয় আপনার পূর্ণচন্দ্রকে পেয়েছিল বিচ্ছেদের দূর আকাশে। চণ্ডীদাসের সঙ্গে রজকিনী রামীর হয়তো বাইরের বিচ্ছেদ ছিল না, কিন্তু কবি যেখানে তাকে ডেকে বলছে—তুমি বেদবাদিনী হরের ঘরণী তুমি সে নয়নের তারা—সেখানে রজকিনী রামী কোন দূরে চলে গেছে তার ঠিক নেই।'

যাত্রী

১০। "য়ুরোপীয় সাহিত্য আমার যে বিশেষ জানা আছে এমন অহংকার আমি করি না। শুনতে পাই দান্তে, গ্যাটে, ভিক্টর হুগো আপন আপন রূপের জগৎ সৃষ্টি করে গেছেন। সেই রূপের লীলায় ঢেলে ঢেলে দিয়েছেন তাঁদের আনন্দ। সাহিত্যে এই নব নব রূপস্রষ্টার সংখ্যা বেশি নয়।"

সাহিত্যের পথে ॥ 'সাহিত্যরূপ' থেকে

রবীন্দ্রনাথ অনূদিত দান্তের কবিতা

১

প্রেম বন্দী হৃদি যাঁরা, সুকোমল মন
যাঁরা পড়িবেন এই সঙ্গীত আমার,
তাঁরা মোর অনুনয় করুণ শ্রবণ
বুঝায়ে দিউন মোরে অর্থ কি উহার ?
যেকালে উজ্জ্বল তারা উজলে আকাশ,
নিশার চতুর্থভাগ হয়ে গেছে শেষ,
প্রেম মোর নেত্রে আসি হোলেন প্রকাশ
স্মরিলে এখনো কাঁপে হৃদয়প্রদেশ !
দেখে মনে হলো যেন প্রফুল্ল-আনন ;
—মোর হৃৎপিণ্ড রহে করতলে তার
বাহু পরে শান্তভাবে করিয়া শয়ন
—ঘুমাইয়া রয়েছেন মহিলা আমার
অবশেষে জাগি উঠি, প্রেমের আদেশে
সভয়ে জ্বলন্ত হৃদি করিলা আহার !
তারপরে চলি গেলা প্রেম অন্য দেশে
কাঁদিতে কাঁদিতে অতি বিষণ্ণ আকার।

২

'রমণি ! তোমরা বুঝ প্রেমের ব্যাপার—
মহিলার কথা মোর করহ শ্রবণ—
বোলে ফুরায় না কভু প্রশংসা তাহার

মন খুলে বলে তবু জুড়াইবে মন!
পৃথিবীতে যত কিছু আছে গো মহান্—
তাহা হতে মহত্তর চরিত তাহার
হেন দীপিয়াছে প্রেমে এ মোর পরাণ,
চির বল অর্পিয়াছে বচনে আমার!
সাধ যায় করি তার হেন যশো গান
সমস্ত পুরুষে তাঁর পদতলে আজি—
কিন্তু থাক—গাব নাকো সে সমুচ্চ তান
গাহিতে ক্ষমতা যদি না থাকে কি জানি!
আমার এ ভালোবাসা অতি সুকোমল,
গাব তাই অতিশয় সুকোমল তানে—
সুকোমল হৃদি ওগো মহিলা সকল!
সে গান লাগিবে ভালো তোমাদের কানে!
স্বর্গের দেবতা এক কহিলা ঈশ্বরে—
'দেখ প্রভু দেখ চেয়ে এই পৃথ্বিতলে
মানব হইতে এক হেন জ্যোতি ক্ষরে
নিম্নদেশ পৃথিবীরে সে জ্যোতি উজলে।
স্বর্গের অভাব প্রভু নাই কিছু আর,
শুধু ঐ জ্যোতি, ওই বিমল কিরণ!
তাই দেব অনুনয় শুনগো আমার,
দেবতার মাঝে তারে কর আনয়ন।'
আমাদের প্রতি দয়া হইল বিধির—
কহিলেন 'ধৈর্য ধর, আসুক সময়—

পৃথিবীতে একজন আছে গো অধীর
কখন হারায় তারে সদা করে ভয়।'
প্রেম কহে তার পানে করি নিরীক্ষণ
ঈশ্বর নূতন সৃষ্টি করিলা সৃজন!
মুকুতার মত পাণ্ডু বরণ তাহার
প্রকৃতির পূর্ণতম শিল্প সেই জন,
করি তারে পূর্ণতম আদর্শ শোভার!
সুন্দর নয়নে তার সদাই জাগ্রত
এমন প্রেমের জ্যোতি, এমন উজ্জ্বল
সে জ্যোতি দর্শক আঁখি করায় মুদ্রিত
সে জ্যোতি ঢালয়ে হৃদে আলোক বিমল।
হাসিতে চিত্রিত যেন প্রেমের আকার—
এক দৃষ্টে কে তাকাবে সে হাসি তাহার?
তোমারে কহি, গান, সন্তান প্রেমের,
তুমি ত যাইবে বহু মহিলার কাছে,
বিলম্ব করো না কভু, বল তাঁহাদের—
'দেবীগণ, মোর শুধু এক কাজ আছে—
তাঁহার চরণে যাওয়া, যাঁর মহাযশে
ভাণ্ডার আমার এই পূর্ণ রহিয়াছে।'
যদি বা বিলম্ব তব হয় দৈববশে,
দেখ যেন রহিও না তাহাদের কাছে—
অসাধু যাদের জানো, মন ভালো নয়—
কেবল রমণী আর প্রেমিকের কানে

খুলিও হে গীত তুমি তোমার হৃদয়।
মহিলা আমার বসি আছেন যেখানে
সেখানে তোমারে তাঁরা যাবেন লইয়া—
তারে মোর কথা তুমি দিও বুঝাইয়া!

৩

কতকাল আছি আমি প্রেমের শাসনে,
এমন গিয়াছে সয়ে অধীনতা তাঁর,
প্রথমে বা দুখ বলে করেছিনু মনে
এখন তা ধরিয়াছে সুখের আকার!
যদিও গো বলহীন হয়েছে পরাণ,
গেছে চলি তেজ যাহা দিল এই চিতে,
তবু হেন সুখ প্রেম করেন গো দান
মৃত্যুমূল্য দিতে চাই সে সুখ কিনিতে!
প্রেমের প্রসাদে মোর হেন শক্তি আছে,
প্রত্যেক নিঃশ্বাস ধরি প্রার্থনা আকার—
অনুগ্রহ ভিক্ষা চায় মহিলার কাছে—
অতি দীনভাবে অতি নম্রভাবে আর!
তারে দেখিলেই আসে যে ভাব আমার,

৪

এ নয়ন কাঁদিয়া কাঁদিয়া যন্ত্রণায়,
জীর্ণ হয়ে পড়িয়াছে গেছে শুকাইয়া,—

নিভাতে এ জ্বালা যদি থাকে গো উপায়
(যেন জ্বালা অতি ধীরে যেতেছে লইয়া
ক্রমশঃ এ দেহ মোর কবরের পানে,)
তবে তাহা মৃত্যু, কিম্বা প্রকাশি এ ব্যথা !
যখন মহিলা মোর আছিল এখানে
আর কারে বলি নাই এ মর্মের কথা,
হে রমণি তোমাদের কোমল হৃদয়ে
মরমের কথা মোর ঢেলেছি কেবল ।
যখন গেছেন তিনি স্বরগ আলয়ে—
রাখিয়া আমার তরে শোক অশ্রুজল—
তখন যা কিছু মোর বলিবার আছে
হে রমণি বলিব গো তোমাদের কাছে,

৫

যাও তুমি, হে করুণ সঙ্গীত আমার,
যাও সেথা যেইখানে রমণীরা আছে,
আগে তুমি যেতে সেথা বলি সুখভার,
কতসুখ পেতে, রহি তাহাদের কাছে ?
এখনো তাদেরই কাছে কর গো প্রয়াণ,
বিষণ্ণ ও শুষ্ক তুমি শোকের সন্তান !

৬

ধীরে যাইতেছে চলি, ওগো যাত্রীদল

যেন কোন দূরবস্তু করি কল্পনা—
মোদের দহিছে সেই বিষাদ অনল
তোমাদের পরশে নি যেন সে যাতনা !
তোমাদের নিজ দেশ এই কি দূরে ?
এ শোকার্ত্ত নগরীর যাও মধ্য দিয়া
বোধহয় তবু যেন জাননা, এ পুরে
কি মহান শোকানল দহিতেছে হিয়া !
তবু যদি একবার দাঁড়াও হেথায়,
কিছুক্ষণ মোর কথা শুন মন দিয়া
তা হ'লে বিদায় কালে বিষম ব্যথায়
যাবে চলি উচ্চস্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
তিলমাত্র যার কথা করিলে বর্ণন,
তিলমাত্র যার কথা করিলে শ্রবণ,
মানুষ কাঁদিতে থাকে ব্যথিত অন্তর,
সেই বিয়াত্রিচে হারা অভাগা গর।

৭

জীবনের মধ্য পথে দেখিনু সহসা
ভ্রমিতেছি ঘোর বনে পথ হারাইয়া
সে যে কি ভীষণ অতি দারুণ গহন
স্মৃতি তার ভয়ে মোরে করে অভিভূত
সে ভয়ের চেয়ে মৃত্যু নহে ভয়ানক !

৮

হেনকালে সহসা দেখিনু একজন
বহুদিন মৌন রহি ক্ষীণ স্বরে তাঁর—
জীবিত বা মৃত আত্মা যে হও না কেন
দয়া করো মোরে, আমি সমুচ্চে কহিনু
সে অরণ্য মাঝে যবে হেরিনু তাঁহারে।

৯

মহা ছায়া কহিলেন মিথ্যা আশঙ্কায়
হৃদয় হোয়েছে তব বৃথা অভিভূত
পশু যথা ভয় পায় সন্ধ্যার আঁধারে
হেরিয়া অলীক ছায়া তেমনি মানুষ
মহান সংকল্প হোতে হয় গো বিরত
বৃথা ভয়ে। এ আশঙ্কা করিয়াছে দূর—
কহি তোরে কোথা হতে এলেম হেথায়
প্রথম কাহার কথা করিয়া শ্রবণ
তোরে দয়া হোল মোর, কহি তোরে তাহা।
পরলোকে থাকে যারা সংশয় আধারে
তাহাদের মধ্যে মোর নিবাস কহিনু।
একদা রমণী এক আহ্বানিলা মোরে—
হেন পুণ্যময় মূর্তি এমন সুন্দরী
দেখেই অমনি তাঁর মাগিনু আদেশ—
অতিশয় মৃদু আর অতি সুকোমল

দেবতার স্বরে সুর বাঁধি কহিলেন
অয়ি উপছায়া! তুমি যাহার সুযশ
যদিন প্রকৃতি রবে, রহিবে বাঁচিয়া—
এই অনুনয় মোর করহ শ্রবণ
বন্ধুএক মোর (নহে বন্ধু সম্পদের)।
মহারণ্যে নিদারুণ বাধা বিঘ্ন পেয়ে
ভয়ে অভিভূত হোয়ে পড়েছেন তিনি
ভয় করি পাছে হন হেন পথহারা
আর তারে একেবারে ফিরাতে না পারি।
উদ্দীপনা বাক্যে তব, যে কোন উপায়ে
ফিরাইয়া আন, তবে লভিব বিরাম।
আসিয়াছি স্বর্গ হোতে বিয়াত্রিচে আমি
প্রেম উত্তেজনে আমি কৈনু অনুরোধ।

১০

মোর মধ্য দিয়া সবে যাও দুঃখদেশে
মোর মধ্য দিয়া সবে যাও চির সুখ ভোগে
চিরকাল তরে যারা হোয়েছে পতিত
মোর মধ্য দিয়া যাও তাহাদের কাছে।
ন্যায়ের আদেশে আমি হয়েছি নির্মিত।
অনন্ত জ্ঞান ও প্রেম স্বর্গীয় ক্ষমতা
আমারে পোষণ করা কার্য তাহাদের!
মোর পূর্বে আর কিছু হয় নি সৃজিত

অনন্ত পদার্থ ছাড়া, তাই কহিতেছি
হেথায় অনন্তকাল দহিতেছি আমি।
হে প্রবেশি ; ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এদেশে

১১

তারকা-অবিদ্ধ শূন্য করিছে ধ্বনিত
শুনিয়া, প্রবেশি সেথা উঠিনু কাঁদিয়া।
নানাবিধ ভাষা আর ভয়ানক কথা
যন্ত্রণার আর্তনাদ, ক্রোধের চিৎকার
করতালি কঠোর ভগ্নকণ্ঠ ধ্বনি
নিরেট এ আঁধারের চারিদিক ঘেরি
ঘূর্ণিবায়ে রেণুসম ফিরিছে সতত!

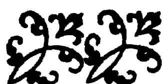
১২

আঁখি মোর দেখে তারে পারে নি চিনিতে
তবু তাঁর দেহ হতে এমন, একটি
বিকিরিত হতেছিল শুভ্র পুণ্য জ্যোতি
তাহার পরশে যেন পুরাতন প্রেম
হৃদয়ে আমার পুনঃ উঠিল জাগিয়া।
সেই পুরাতন স্বপ্ন কত শত দিন
যে স্বপ্নে হৃদয় মোর আছিল মগন—
যখন উঠিল জাগি স্বর্গীয় কিরণে
অমনি আকুল হয়ে ফিরিয়া ধাইনু

কবি বর্জিলের পানে, শিশু সে যেমন
ভয় কিংবা শোক ভারে হোলে বিচলিত
অমনি মায়ের বুকে যায় লুকাবারে
ভাবিয়া কাতর স্বরে কহিব তাঁহারে
প্রতি রক্তবিন্দু মোর কাঁপিছে শিরায়
পুরান সে অগ্নি পুন উঠেছে জ্বলিয়া
হা বর্জিল কোথা হেহয়েছো অন্তর্ধান
প্রিয়তম পিতা তুমি বর্জিল আমার।

১৩

জাগি উঠি স্বপ্ন যদি ভুলে যাই সব
তবু তার ভাব যেমন থাকে মনে মনে
তেমনি আমারো হলো, স্বপ্ন গেল ছুটে
মাধুর্য তবুও তার রহিল হৃদয়ে।



রবীন্দ্রনাথের আমতত্ত্ব

আমসত্ত্ব দিয়ে জীবনের শুরু। নীল খাতা, কালো কালি, বাঁকা লাইন আব সরু-মোটা অক্ষরে কাব্যচর্চার প্রথম আদি শুভক্ষণে উপাদেয় আমসত্ত্বই তাঁকে জুগিয়েছিল প্রথম স্বকীয়-শ্লোকের উপকরণ। 'আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি'-র আগে জীবনস্মৃতির পাতায় এরই পূর্বসূরী হিসেবে যে-দুটো ছন্দোবদ্ধ পংক্তি, উৎকর্ষে যতই পদ্যবাচ্য হোক, উপলক্ষে সে অন্তের অর্থাৎ সাতকড়ি দত্তের হুকুম তামিল-করা পাদপূরণ মাত্র।

জীবনের একেবারে সকাল বেলাকাব লেখা কবিতাগুলো সকাল-সকাল খাতার পাতা এবং মনের স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেলেও, দু-একজন সমঝদার শ্রোতা বয়ে গেছেন অবিস্মরণীযতার কুলুঙ্গীতে মাজাঘষা পিতলের প্রদীপের মতো সমুজ্জ্বল। তাঁদেরই একজন শ্রীকণ্ঠবাবু। বাঁয়ে গুড়গুড়ি, কোলে সেতার, গলায় বিরতিহীন গান, এই হল শ্রীকণ্ঠবাবুর রুচির পরিচয়। রূপেব

পরিচয়, মাথা-বোঝাই টাক, দাঁতহীন মুখগহ্বর,
গোঁফ-দাড়ি-বিবর্জিত মুখমণ্ডল এবং হাসির কাজল
পরা ডাগর দুটি চোখ। এই মানুষটিরই স্বভাবের
পরিচয় দিতে গিয়ে কবির কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠল
যে উপমা, তা কোনো সোনা-দানা হীরে মুক্তোর
স্বুবর্ণচ্ছটা নয়, নয় আপেল-আঙুরের মতো এমন
কোনো রসালো ফল, সাহিত্যের ভোজসভায় যারা
পেয়ে গেছে সাদর প্রবেশাধিকারের পাশপোর্ট।
তিনি নিয়ে এলেন অপরিচিতের নাম, আম।
"বৃদ্ধ একেবারে স্নুপক্ক বোম্বাই আমটির মতো,
অম্বলরসের আভাসমাত্রবর্জিত-তাঁহার স্বভাবের
কোথাও এতটুকু আঁশও ছিল না।"
এই আম-নিংড়িয়ে আমসত্ত্ব দিয়েই জীবনের
শেষ, তবে আস্বাদনে নয়, প্রত্যাখানে। মহাপ্রয়াণের
ঠিক এক আগের কাহিনী। রবীন্দ্রনাথ তখনও
শান্তিনিকেতনে। কলকাতা থেকে ইন্দিরা
দেবী এসেছেন দেখা করতে। সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীও।
দুপুরে খাওয়ার সময় ইন্দিরা দেবী বসেছেন সামনে।
কবির কণ্ঠস্বরে জোয়ার জলের মতো উথলে উঠলো
অভিযোগ।
'আচ্ছা বিবি, তুই দেখ্ আমাকে এরা আজকাল কি
খেতে দিচ্ছে। একি কখনো খাওয়া যায়? না
কেউ কাউকে খেতে দেয়? এই ভদ্রমহিলা আর

আমার এই নাতনী বলেন, এসব খাওয়া উপকারী। কবিরাজমশাই বলেছেন, এসব খেলে নাকি আমি আর কদিন পরেই একেবারে লাফালাফি করে বেড়াতে পারবো। যা কিছু খেতে চাইনে, আমার দিদিমণি বলেন কবিরাজমশাই বলেছেন—আচ্ছা দে-রে বাপু আর তর্ক করতে পারি নে। কিন্তু তুই সত্যি করে বল, এসব কি মানুষ খেতে পারে? কেবলি চালকুমড়ো খাবো? আর কি ভালো জিনিস কিছু নেই?"

বাইশে শ্রাবণ, নির্মলকুমারী মহলানবিশ

পাশে হাজির শুশ্রূষাকারিণী প্রতিমা দেবী, রাণী মহলানবীশদের কেউ বলেন, বেশ তো কি খেতে চান বলুন। কেউ কেউ শোনান আশ্বাসবাণী, আপনি সাধ করে যা খেতে চান, তাই পাবেন। কবিরাজমশায়ের তাতে বাধা নেই। বলুন কি খাবেন?

কবির উত্তর—'ঐ তো মুশকিলে ফেললে। আমি কিছুই খেতে চাইনে।'

—'যদি তপসে মাছ ভাজা দিই? এক সময় তো আপনি তপসে মাছ খুব পছন্দ করতেন।'

—'না, একটুও ইচ্ছে নেই।'

—'আমসত্ত্ব', 'ক্ষীর'?

—'মিষ্টি একেবারেই না।'

আমসত্ত্বের ঘাড়ে মিষ্টির অভিযোগ চাপিয়ে প্রত্যাখান। অথচ অরুচি নেই আমতত্ত্বে। নিত্য তার অভ্যর্থনা। ছেলেবেলায় শ্রীকণ্ঠবাবুর বন্দনার সূত্রে যে-আমের আবির্ভাব, কবিকণ্ঠে কোনদিনও পেল না সে বিদায়-বিসর্জন। এমন কি মৃত্যুশয্যাতেও, হাজারো রঙ্গ-রসিকতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে আছে আমপ্রসঙ্গ।

'বাইশে শ্রাবণ', ৩রা জুলাই-এর ঘটনা।

রাণী মহলানবিশ শিয়রে দাঁড়াতেই কবির প্রশ্ন,—

'আজ আমবাবু আসবেন তা জানো?'

শ্রোতা বুঝতে পারলেন না কে আমবাবু। মুখে জবাবের বদলে চোখে বিস্ময়।

—'আমবাবুকে চেন না?'

সেদিন বিকেলে কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ আর ডাক্তার রাম অধিকারীর আসার কথা। তার থেকেই আন্দাজ পেয়ে গিয়ে শ্রোতার মুখে উপচে পড়া হাসি। প্রশ্নকর্তার মুখ থেকে তখনো মিলিয়ে যায় নি মুচকি হাসির রসিকতা।

—'হ্যাঁ, লোকটি বড় ভালো। কারণ একবার অনেক আম পাঠিয়েছিলেন, তাই আমি ওর নাম দিয়েছি 'আমবাবু'। ভদ্রলোক শুনেছি বেশ খেতেও পরেন, তাই চেহারাখানাও তোমারি মতো মোটাসোটা।'

সমবেত হাস্যোচ্ছ্বাস।

এই 'আমবাবু' প্রসঙ্গ 'বাইশে শ্রাবণে' আরও একবার।

কলকাতা থেকে বিধানচন্দ্র রায় এসেছেন শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথকে দেখে-শুনে রায় দুটো। এক, অপারেশনের জন্যে কবিকে নিয়ে যেতে হবে কলকাতায়। দুই, পথ্য পাল্টাতে হবে কবিকে। দুবেলা-দু'সন্ধে চালকুমড়োর বদলে খেতে প্রোটিন অর্থাৎ মাছ মাংস। কবির কানে গেছে সে খবর। দুপুরে সুধাকান্তবাবুর দিকে তাকিয়ে— 'কিরে? শুনেছিস তো যে কাল থেকে আবার মাছের ঝোল খেতে হবে? আহারটা কিরকম হবে বলতো? তুই তো মনে করিস্ নিরামিষটা কোনো খাদ্যই নয়; তোর তো একটা আস্ত পাঁঠা পেলেও আপত্তি নেই, কি বলিস্?'

সুধাকান্তর সবিনয় সম্ভাষণ-'আজকাল আর সেদিন নেই গুরুদেব। এখন আর তেমন খেতে পারি নে। সে খেতে পারেন রামবাবু। সেদিন রাত্রে চল্লিশখানা লুচি খেলেন, তারপরে আবার আম মিষ্টিও বাদ গেল না।'

উত্তরে কবির পরিহাস রাণী মহলানবিশের দিকে তাকিয়ে-'বাপরে! শুনেছো হেড নার্স? সেই জন্যেই তো আমার আমবাবুর চেহারাটাও

ঐরকম গোলগাল। ওঁর গোঁফ জোড়াটাও কম না, খুব জবর গোঁফ।'

এ প্রবন্ধে এসব ঘটনা নিতান্তই প্রাসঙ্গিক, মূল বিষয়ের থেকে আলগা। তবে এমনও হতে পারে, কবির জীবনের এই আম-তথ্যগুলো আগাম জেনে নিলে তাঁর আমসত্ত্বের সদর দরজাটাকে চিনে নেওয়া এবং দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়াটা সহজ হয়ে যাবে বিনা হোঁচটেই, অজানা দেশের শহরে মাথা গলানোর আগে সে-শহরের দশাসই ম্যাপের দশদিগন্তে চোখ বুলিয়ে নিলে সুবিধে ঘটে যেমন কিছুটা।

রবীন্দ্রনাথের বালক-বয়সের পরিবেশে কোথাও আমগাছ ছিল এমন বর্ণনা চোখে পড়ে নি আমাদের। ফলবান গাছ হিসেবে আমরা খোঁজ পাই কেবল নারকেলের, বাতাবি লেবুর, কুলের আর বিলেতি আমড়ার। তবে বাগানে আমগাছের অনুপস্থিতি যে অন্দর মহলে কাঁচা আমের আমসি আর পাকা আমের আমের আমসত্ত্বের বিপুল আয়োজনে বিঘ্ন ঘটাতে পারে নি কোনোদিন, তার নথিভুক্ত প্রমাণ রয়ে গেছে 'ছেলেবেলায়'।

"বাড়ি-ভিতরের এই ছাদটা ছিল আগাগোড়া মেয়েদের দখলে।.... ওখানে রোদ পড়ত পুরোপুরি, জারক লেবুকে দিত জারিয়ে।....কাঁচা আম ফালি করে কেটে

কেটে আমসি শুকোনো হত, ছোটো বড় নানা সাইজের নানা-কাজ-করা কালো পাথরের ছাঁচে আমের রস থাকে থাকে জমিয়ে তোলা হত, রোদ-খাওয়া, সর্ষের তেলে মজে উঠত ইচড়ের আচার।.... বাড়িতে আমি ছিলুম একমাত্র দেওর- বউদিদির আমসত্ত্ব পাহারা, তাছাড়া আরো পাঁচ রকম খুচরো কাজের সাথি।...."

ছেলেবেলেটা যত এগিয়ে গেছে বড়োবেলার দিকে, দেখে অবাক হতে হয়, ক্রমশই অন্য আর দশটা রসালো ফলকে শুধু চোখের ভালোবাসা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মুখের ভালবাসায় সম্মানিত করেছেন শুধু আমকে। অজস্র চিঠিপত্রে পাকা হয়ে রয়েছে পাকা আমের সম্পর্কে তাঁর পক্ষ পাতিত্বের দলিল।

মৃণালিনী দেবীকে লিখছেন সাহাজাদপুর থেকে—"আমার আম প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, এবারে মনে হল যেন দু-জাতের আম ছিল। এক রকমের আম খুব ভালো ছিল—অন্যটাও মন্দ নয় কিন্তু তেমন ভালো না। দুটো-একটা পচেও গেছে।"

এর দশ বছর পরে আবার—"আমার আম ফুরিয়ে এসেছে। কিছু আম না পাঠিয়ে দিলে অসুবিধা হবে।"

চিঠির মধ্যেও দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকা—
"সকালে ঠিক সময়ে দুটি আম খাই, দুপুরবেলায় অন্ন, বিকেলেও দুটি আম এবং রাত্রে গরম লুচি ও ও ভাজা।"

হেমন্তবালা দেবী একবার আম পাঠিয়েছিলেন কবিকে। তার উত্তরে—"আমের প্রতি আমার প্রবল লোভ।....এই ফলের অর্ঘযোগে তোমার স্নিগ্ধ হৃদয়ের সেবা আমাকে আনন্দ দিয়েচে।"

জীবনের শেষ জন্মদিনে যখন কবির পা, তখনও দেশ-দেশান্তর থেকে আসছে আমের উপঢৌকন। যেহেতু মুগ্ধ অনুরাগীরা জানে আম সম্পর্কে কবির আসক্তির তীব্রতা। কিন্তু জানে না সেই মুহূর্তে কবির খাদ্যাসক্তির শেষ শিখাটুকুও ছাই হয়ে গেছে পুড়ে।

প্রতিমা দেবীর 'নির্বাণ'-এ পড়ি-ফলে-ফুলে ঘর ভর্তি হয়ে গেল, বিশেষ করে আমের সাজিতে; এই ফলটি ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। গত বৎসরেও দিনে ছ'-সাতটা করে আম খেতেন, এবার এত ভক্ত তাঁকে আম পাঠাচ্ছেন দেশ-দেশান্তর থেকে কিন্তু খাবার স্পৃহা চলে গেছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার এক টি-পার্টিতে কবির নিমন্ত্রণ। উদ্যোক্তা সদ্য-গড়ে-ওঠা আর্টস ফ্যাকালটি ক্লাবের সদস্যবৃন্দ। রাধাকৃষ্ণণ

তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক। তরুণদের নেতাও। তাঁরই পরিকল্পনায় এই ক্লাব। রবীন্দ্রনাথ বেতন-ভুক অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। নিয়মিত ক্লাশ নেওয়ার দায়িত্ব নেই। খুশি মতো বছরে কয়েকটি বক্তৃতা। রবীন্দ্রনাথকে সহযোগী হিসেবে কাছে পাওয়ার সৌভাগ্যকে স্মরণীয় করতেই আর্টস ফ্যাকালটি ক্লাবের পক্ষ থেকে একদিন এক চা-আসর। উদ্যোক্তাদের অন্যতম, অধ্যাপক সুকুমার সেন। তাঁর স্মৃতিচারণা—

"পার্টি দেওয়া হয়েছিল তেতলায় আশুতোষ হলে। হলটি আগাগোড়া-যাকে ইংরেজিতে বলে Wall to Wall গালচে মোড়া হয়েছিল। জানালা-দরজায় পর্দা ও ফেস্টুন। সব টেবিলে ফুলের তোড়া। চা-কেক-টেকের কোথায় অর্ডার দেওয়া হয়েছিল, তা মনে নেই। তবে খুব ভালো। সে দিনটা ছিল জুলাই মাসের ১৯৩২। সেদিন আষাঢ়ান্ত বেলার উজ্জ্বল অপরাহ্নে সুসজ্জিত বিরাট আশুতোষ হলের যে শোভা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে, তা স্মরণ করলে আজও মন খুশিতে ভরে ওঠে। তেমনটি আর কখনো হয় নি। আমরা প্রচুর কেক সন্দেশ চা খেয়েছিলুম।

রবীন্দ্রনাথ কিছু খেতে চান নি। সুনীতিবাবুদের অনেক অনুরোধে একটু লেংড়া আম মুখে করেছিলেন। সে আম তিনি নিজে (বিলিতি?) কায়দা মাফিক কেটেছিলেন। সে কায়দা আর কিছুই নয়, আমটার গোড়ার দিকে মাঝামাঝি ছুরি দিয়ে গভীর দাগ টেনে দু-হাতে দুদিকে উল্টো করে মোচড় দেওয়া। তা দিয়ে আঁটি খুলে ডিসে পড়ে গেল। তারপর শাঁসযুক্ত খোলা থেকে চামচে করে খুলে নেওয়া। হাতে গায়ে কোথাও রস লাগবার সম্ভাবনা নেই। তেমনি করে আম কেটে রবীন্দ্রনাথ দু-এক চামচ শাঁস মুখে দিয়েছিলেন।"

আম এইভাবে তাঁর জীবনের আদি-অন্ত জুড়ে। এ থেকে সহজেই অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে যে, সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার এই আম ছায়া ফেলবে তাঁর সাহিত্যে, সাহিত্যের আলোচনায়, সাহিত্যের তত্ত্বে। আর সেটা ফেলেছেও।

২

পৃথিবীর কবিতার দিকে তাকিয়ে ফুলের মতোই, ফলের সম্পর্কেও কবিদের উষ্ণ অনুরাগের দৃশ্য অনেকবারই চোখে পড়েছে আমাদের। মনের

যে-স্তর থেকেই জন্ম নিক্ কবিতা, জীবনযাপনের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উপকরণ সম্ভারকে ঠেলে সরিয়ে, কবিতার শরীরে রক্তস্পন্দন এনে দেওয়া যে অসম্ভব সেটা আবহমানের কবিতায় প্রমাণিত। জন্ম মুহূর্ত থেকে কবিতা তাই জীবনযাপনের যাবতীয় উপকরণের সঙ্গেই গায়ে গা লাগিয়ে, অবিচ্ছেদ্য বন্ধুর মতো। নিজের ব্যাপ্তি এবং মুক্তির প্রয়োজনেই চরাচরের সমস্ত কিছুকে তার প্রয়োজনের আলিঙ্গন।

মার্লানের দরকার হয় সুপক্ক ডালিমকে, 'যে-পরিপ্লুতি আমাদের শিরায়' রক্তিম, তা বোঝানোর জন্যে। অথবা ত্বকের চরিত্র বোঝাতে, আঙুরের দিকে ঘুরে তাকাতে হয় তাঁকে। স্পেনের কবি হোজে হোয়ান তাবালদা তরমুজকে ব্যবহার করেন অনেকটা যেমন সুররিয়ালিস্ট চিত্রকরদের ইজেলের রঙের মতো, যেখানে রঙ এসে প্রক্‌সি দিয়ে যায় বিষয়ের।

"টকটকে লাল ঠাণ্ডা
হো হো হাসি, বৈশাখে,
যেন মনে হয় টুকরো
তরমুজ।"

এই তরমুজকেই জীবনানন্দ ব্যবহার করেন ভিন্নভাবে 'পর্দায়, গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের

বিচ্ছুরিত স্বেদ, রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ।
তোমার নির্জন হাত।'
অনেকটা যেন আইজেনস্টাইনের মন্তাজের মতো।
তিনটে আলাদা আলাদা ছবি। পর পর সাজানো।
কিন্তু সিনেমায় যখন ধারাবাহিকভাবে, একের
গায়ে অপরের প্রতিফলন পড়ে একাকার হয়ে
যায়, তখন ঘটে যায় আশ্চর্য এক মেটামরফোসিস,
অথবা রূপান্তর। তিনে মিলে এক হয়ে যায়
যেমন, তেমন ঐ এক থেকে জেগে ওঠে
ভিন্নতর তিন। রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ-এর
প্রতীক হয়ে যায় গেলাসের তরমুজ রঙের মদ।
আবার ঐ তরমুজ মদ প্রতীক হয়ে যায় নগ্ন
নির্জন হাতের।
শরৎ-এর বন্দনা গাইতে গিয়ে কীটস্ এর
কবিতায় এসে যায় একাধিক ফলের উল্লেখ।
যেন প্রধানত ঐসব ফলকে পরিপূর্ণ করার জন্যেই
আতপ্ত সূর্যের সঙ্গে কুয়াশা-আবৃত শরৎ ঋতুর ঘনিষ্ঠ
মেলামেশা।
"কুয়াশা-আবৃত ঋতু পরিপক্ক ফলভারে নত,
আতপ্ত সূর্যের তুমি ঘনিষ্ঠ সুহৃৎ সে তো জানি
তারই সাথে যুক্তি করো কী কৌশল দেবে অগণিত
ফলে ভরে দ্রাক্ষালতা আচ্ছাদনতৃণ-সঞ্চারিণী,
নোয়াবে আপেল ভারে শ্যামলিম তরু কুটিরের

ভরাবে সমস্ত ফল মধুরসে কোষের গহ্বরে,
স্ফীতি দেবে অলাবুকে, বাদামের গভীরে অবাক
স্বাদুরস,....”

জগন্নাথ চক্রবর্তীর অনুবাদ

ডিলান টমাসের আবার অন্য আর্তনাদ।
রুটি ছিঁড়তে গিয়ে তাঁর মনে পড়ে যায় মাঠের
শস্যের কথা, যেমন মদ খেতে গিয়ে পড়ে
দ্রাক্ষার। দিনে মানুষ অথবা রাতে বাতাসের
ষড়যন্ত্রে পৃথিবীতে ঘটে চলেছে এই অঘটন,
আঙুরের মাংসে এবং শষ্যের হাসিখুশিতে
আক্রমণ। এইভাবেই মানুষ সূর্যকে ভাঙে,
বাতাসকে টেনে নামায় স্বার্থসিদ্ধির ফরমাসে।
ফলের দিকে তাকাতে গিয়ে গাছের দিকে তাকাতে
হয় কবিদের। হুইটম্যান লিখেছিলেন
লুসিয়ানার ওক্ গাছকে নিয়ে একটা কবিতা।
আমরা তার অনুবাদ পড়েছি রবীন্দ্রনাথের।
রবীন্দ্রনাথেরও গাছকে নিয়ে অনেক কবিতা,
‘বনবাণী’তে। যে পাঠক এখনো ‘বনবাণী’-র
পাতা ওলটান নি কিন্তু তাঁর গানে শুনেছেন
আমের মঞ্জরীর বন্দনা নিঃসংশয়ে অনুমান করে
নিতে পারেন যে সেখানে আমগাছের জায়গাটা
থাকবে পাকা। আছেও।
কবিতার নাম আম্রবন। কবিতার উপরে,

কেন এই বিশেষ বৃক্ষরাজির স্তব, তা নিয়ে ছোট্ট একটু ভূমিকা।

'সে বৎসর শান্তিনিকেতন-আম্রবীথিকায় বসন্ত উৎসব হয়েছিল। কেউ বা চিত্রে, কেউ বা কারুশিল্পে কেউ বা কাব্যে আপন অর্ঘ এনেছিলেন। আমি ঋতুরাজকে নিবেদন করেছিলেম কয়েকটি কবিতা, তার মধ্যে নিম্নলিখিত একটি। সেদিন উৎসবে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, এই আম্রবনের সঙ্গে আমার পরিচয় তাঁদের সকলের চেয়ে পুরাতন—সেই আমার বাল্যকালের আত্মীয়তা এই কবিতার মধ্যে আমার জীবনের অপরাহ্ণে প্রকাশ করে গেলেম। এই আম্রবনের যে নিমন্ত্রণ বালকের চিরবিস্মৃত হৃদয়ে এসে পেঁাছেছিল আজ মনে হয় সেই নিমন্ত্রণ যেন আবার আসছে মাটির মেঠো সুর নিয়ে, রৌদ্রতপ্ত ঘাসের গন্ধ নিয়ে, উত্তেজিত শালিখগুলির কাকলিবিক্ষুব্ধ অপরাহ্ণের অবকাশ নিয়ে। 'বনবাণীর ন'বছর আগে 'বসন্ত', নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ-করা। সে গীতিনাট্যের এক জায়গায় আছে আম্রকুঞ্জের গান, প্রথম দুটি পংক্তি—

"ফল ফলাবার আশা আমি মনে রাখিনি রে।
আজ আমি তাই মুকুল ঝরাই দক্ষিণ সমীরে!"

গান শেষ হলে রাজার মুখের সংলাপ—
"ফল ফলাবে বলে কোমর বেঁধে বসলে ফল ফলে না। মনের আনন্দে 'ফল চাই নে' বলতে পারলে, ফল আপনি ফলে ওঠে। আম্রকুঞ্জ মুকুল ঝরাতে ভরসা পায় বলেই তার ফল ধরে।"
আম্রকুঞ্জের বেলায় এ-কথা যেমনই সত্য হোক, আম, আমের গাছ, আমের মঞ্জরী সম্বন্ধে কবির বেলায় সেটা খাটাতে গেলে মিথ্যের দিকেই গড়াবে। আম-সম্বন্ধীয় ভাবনার একটি মুকুলকেও তিনি ঝরতে দিয়েছেন কিনা, সেটা গোয়েন্দা লাগিয়ে তদন্ত করার মতো বিষয়।
আমের কথা নেই কোন্‌খানে? গল্পে, উপন্যাসে, কবিতায়, গানে সেতো সর্বতোব্যাপী।
হয়তো ছবিতেও। এত গাছ এঁকেছেন, তার মধ্যে কি আম নেই একটাও?
আম অনেক মুকুল ঝরিয়ে তবে পায় ফল।
রবীন্দ্রনাথ আম-বিষয়ের কোনো ভাবনাকেই ঝরতে না দিয়েও ফল ফলিয়েছেন অজস্র। তারই ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই তাঁর অতিশয় গাম্ভীর্যময় সাহিত্য-আলোচনাতেও ঢুকে পড়েছে আম। আম হয়ে উঠেছে তার তত্ত্বকথার বাহক, সাহিত্যশাস্ত্রের বাহন।

৩

বালিগঞ্জের এক সাহিত্যসভায় জীবনে প্রথম সভাপতির আসন থেকে, মনে মনে রবি ঠাকুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধসাজ এঁটে, ভাষণ দিতে উঠে অমিত রায় বলেছিল—"কবি মাত্রের উচিত পাঁচ বছর মেয়াদে কবিত্ব করা, পঁচিশ থেকে ত্রিশ পর্যন্ত। এ কথা বলব না যে পরবর্তীদের কাছ থেকে আরো ভালো কিছু চাই, বলব অন্য কিছু চাই। ফজলি আম ফুরোলে বলব না, আনো ফজলিতর আম, বলব, নতুন বাজার থেকে বড়ো দেখে দেখে আতা নিয়ে এসো তো হে। ডাব নারকেলের মেয়াদ অল্প, সে রসের মেয়াদ, ঝুনো নারকেলের মেয়াদ বেশী, সে শাঁসের মেয়াদ। কবিরা হল ক্ষীণজীবী, ফিলজফারের বয়সের গাছপাথর নেই।..."

কে এই অমিত রায়, এমন প্রশ্ন তুললে খুব সহজেই বাত্‌লিয়ে দিতে পারা যায় এই উত্তর যে অমিত রায় 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের নায়ক। রবীন্দ্রনাথের কলমে গড়া আপাদ-মস্তক আধুনিক এক কাল্পনিক চরিত্র। অমিত রায় আধুনিকই নয় শুধু, অতি-আধুনিকতার এক অগ্নিগর্ভ বিগ্রহ, সে তো উপন্যাসের প্রথম পর্বের তোরণদ্বারে মাথা গলানোর

মুখে প্রথম প্যারাগ্রাফের শেষ লাইনেই জানা হয়ে যায় আমাদের। অতি আধুনিক বলেই 'রায় পদবীর 'রয়' বা 'রে' রূপান্তরেও সে অতৃপ্ত। আরো অসামান্যতার অন্বেষণে বেরিয়ে সে রচনা করে নেয় এমন বানান যা তার ইংরেজ বন্ধুদের মুখে হয়ে দাঁড়ায় 'রায়ে'। উপন্যাসের প্রথম বাক্যেই আমাদের জানা হয়ে গেছে আরো একটি তথ্য, সে ব্যারিস্টার। আর গোটা উপন্যাস পড়ে কখনোই আমাদের জানা হয় না যে, উপন্যাস-পরিধির মধ্যে তো নয়, সে-গণ্ডী পার হয়ে যাওয়ার পরও ভবিষ্যতে কোনো দিন সে পা বাড়াবে কিনা ব্যারিস্টারি-বৃত্তির চর্চায়। গোটা উপন্যাসে অমিতকে আমরা কথা বলতে দেখি দুটি বিষয়ে, প্রেম এবং সাহিত্য। আরও একটু তলিয়ে দেখলে ধরা পড়ে তার প্রেমের কথার ঝোঁকটাও ষোল আনা সাহিত্যের দিকে। গোটা উপন্যাস জুড়ে সে যেন স্বয়ং নিয়োজিত এক ব্যারিস্টার, বাংলাদেশের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অতি আধুনিকদের বিদ্রোহকে জিতিয়ে দেবার অতি উৎসাহে।

এ হল উপন্যাস পরিধির ভিতরে দাঁড়িয়ে দেখা। কিন্তু একটু সরে এসে সমসাময়িক ইতিহাসের

পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে এই উপন্যাস অথবা এই অমিত রায়ের দিকে তাকালে উদ্ঘাটিত হয়ে যায় অন্য সত্য। 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের প্রথম দুটো অনুলিপির কোনখানেই ছিল না রবীন্দ্র বিরোধী সভা এবং নিবারণ চক্রবর্তী উপাখ্যান। এ সংযোজন অনেক পরে। এবং ভিন্নতর প্রয়োজনে। প্রয়োজনটা অমিত রায়কে সম্পূর্ণ করার গরজে নয়। অমিত রায়ের মারফতে কবির নিজের বোঝাপড়ার গরজটাই এখানে প্রবল, প্রতিপক্ষের সঙ্গে রবীন্দ্র বিরোধী আন্দোলনের বোঝাপড়া। বাংলা সাহিত্যে তখন 'অতি-আধুনিক' সংজ্ঞার আবির্ভাব ঘটছে কিভাবে, রবীন্দ্র বিরোধী আন্দোলনের পিছনে কোন তরুণমতদের উদ্যম ইত্যাদি প্রসঙ্গ এ আলোচনায় তুলছি না। শুধু সাহিত্য যখন একজন সম্রাটের দ্বারা শাসিত ও চালিত হয়, তখন যে তার ঘোরতর দুর্দিন এবং মোহিতলালের 'বিস্মরণী' পড়ে 'বাংলার কাব্য সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যুগ আর নেই', প্রগতি পত্রিকার কবি অজিত দত্তের এই দুটি বিস্ফোরক মন্তব্যকে মনে রাখলে বুঝে নেয়া যাবে অন্তর্গত কোন্ সংঘাত-সন্ত্রস্ত অস্থিরতা থেকে রবীন্দ্রনাথ-

বিরোধী অমিত রায়-এর কালাপাহাড়ি
চরিত্রের উদ্ভাবনা।
শেষ পর্যন্ত পরাভূত হবে শত্রুর কাছে, আর সেই
প্রবল পরাভব থেকেই প্রবলতর রূপে মহিমান্বিত
হয়ে উঠবে শত্রুর শাশ্বত রূপ এই কারণেই
যেমন রামায়ণের রাবণের ঘাড়ে দশটা মাথা
এবং কব্জীতে অমিত বিক্রম আর বাক্যে
মরীয়া অহঙ্কার, অমিত রায়কেও অনেকটা যেন
সেইভাবে গড়া-পেটা। সে জিততে জিততেই
ক্রমশ এগিয়ে চলে হারার দিকে।
নিবারণ চক্রবর্তী-মুখোশটা লাবণ্যের কাছে খুলে
যাওয়ার খানিক পরেই, লাবণ্য চোখের জল
ঢাকবার জন্যে দ্রুত ঘরে চলে গেলে, অমিত
আস্তে আস্তে যেন অন্য মনে চলে আসে
য়্যুক্যালিপটাসের তলায়। প্রথমে তার চোখে
পড়ে কয়েকটা আখরোটের ভাঙা খোলা।
তারপরেই ঘাসের উপরে একটা বই, রবি
ঠাকুরের 'বলাকা'।
"একবার ভাবলে, ফিরিয়ে দিয়ে আসি গে। কিন্তু
ফিরিয়ে দিলে না, সেটা নিল পকেটে।"
এরপর থেকেই অমিতের জীবনে ফুরিয়ে গেল
রবীন্দ্র-বিরোধিতার উচ্চগ্রাম আস্ফালন।
শুরু হল বশ্যতার দিন। লাবণ্যকে লেখা শেষ

চিঠিতে তাই তাকে লিখতে হলো—"তোমারই কবির উপর ভার দিলুম আমার শেষ কথাটা তোমাকে জানাবার জন্যে।" শেষ কথাটার জন্যে অমিত হাত পেতেছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে। কিন্তু আগাগোড়া অমিতের মুখের অনেক কথার জন্যেই রবীন্দ্রনাথকে হাত পাততে হয়েছিল নিজের কাছে। ইতিপূর্বের কিছু ভাবনা, আরো বিশেষ করে, কিছু বিশেষ উপমার জন্যে। তার মধ্যে 'শেষের কবিতা'র প্রথম পর্বের সাহিত্যসভার আমতত্ত্ব একটা।

কিন্তু কে এই অমিত রায়? রবীন্দ্রনাথের অভ্যন্তরে দিনে দিনে পুঞ্জ পুঞ্জ জমতে থাকা সত্ততন আধুনিকতার বিরুদ্ধে চিরন্তন আধুনিকতার দ্বন্দ্ব-সংঘাতজাত অনুভবের অগ্নিতাপে গড়া এমন এক চরিত্র, যা রবীন্দ্রনাথকে রক্ষা করার জন্যেই রবীন্দ্র-বিরোধী।

রবীন্দ্রনাথ শেষের কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণের সময়, বাংলা ১৩৩৫, ইংরেজি ১৯২৮-এ। প্রবাসীতে ধারাবাহিক ছাপা শুরু হতে থাকে ১৩৩৫-এর ভাদ্র থেকে। চৈত্রে শেষ। ১৩৩৬-এ ছেপে বেরোয় বই হয়ে। 'সাহিত্য' এবং সাহিত্যের পথে' তার অনেক আগের। আর এ দুটো বইয়েই তাঁর আমতত্ত্বের

ধারাবাহিক বিকাশ। প্রথমেই 'আম'-এর প্রসঙ্গ ওঠে নি। আমের আগে তুলেছিলেন কাঁঠাল-এর কথা, ভাবনার রাজ্যে নানা টুকরো কথা কীভাবে পেতে চায় কিছু-একটা হয়ে ওঠার আকার— সেই প্রসঙ্গে।

"এই হইয়া উঠিবার চেষ্টা সফল হইলে তারপরে টিকিয়া থাকিবার চেষ্টার পালা। কাঁঠালের গাছে উপযুক্ত সময়ে হুড়াহুড়ি করিয়া ফল তো বিস্তর ধরিল, কিন্তু যে ফলগুলা ছোটো ডালে ধরিয়াছে, যাহার বোঁটা নিতান্তই সরু সেগুলা কোনমতে কাঁঠাল-লীলা একটুখানি শুরু করিয়াই আবার অব্যক্তের মধ্যে অন্তর্ধান করে।'

সাহিত্য, সাহিত্য সৃষ্টি

এরই পাঁচ লাইন পরে আম-এর উপমা, কিন্তু আমকে স্বনামে উপস্থিত না করে।

"এমন গাছ আছে যে গাছে বোল ধরিয়াই ঝরিয়া যায়, ফল হইয়া ওঠা পর্যন্ত টেঁকে না। তেমনি এমন মনও আছে যেখানে ভাবনা কেবলই আসে-যায়, কিন্তু ভাব আকার ধারণ করিবার পুরা অবকাশ পায় না। ....অবশ্য অনেকগুলা ঝরিয়া পড়ে বটে, কিন্তু কতকগুলা ফলিয়াও উঠে।

গাছে ফল যে কটা ফলিয়া উঠে, তাহাদের এই দরবার হয় যে, ডালের মধ্যে বাঁধা থাকিলেই

৬

আমাদের চলিবেনা; আমরা পাকিয়া, রসে ভরিয়া, রঙে রাঙিয়া, গন্ধে মাতিয়া, আঁটিতে শক্ত হইয়া, গাছ ছাড়িয়া বাহিরে যাইব....সেই বাহিরের জমিতে ঠিক অবস্থায় না পড়িতে পাইলে আমাদের সার্থকতা নাই।"

এই 'সাহিত্য' বইটিরই পরিশিষ্টে রয়েছে লোকেন পালিতের সঙ্গে সাহিত্য-বিতর্কের পত্রালাপ। সেখানে প্রসঙ্গক্রমে এসে গেল জর্জ এলিয়টের কথা। সঙ্গে সঙ্গে আবার উপমা হিসাবে এগিয়ে এল কাঁঠাল।

'এমন কি জর্জ এলিয়টের নভেল যদিও আমার খুব ভালো লাগে, তবু এটা আমার বরাবর মনে হয় জিনিষগুলো বড়ো বেশি বড়ো—এত লোক, এত ঘটনা, এত কথার হিজিবিজি না থাকলে বইগুলো আরো ভালো হত। কাঁঠাল ফল দেখে যেমন মনে হয়—প্রকৃতি একটা ফলের মধ্যে ঠেসাঠেসি করে বিস্তর সারবান কোষ পুরতে চেষ্টা করে ফলটাকে আয়তনে খুব বৃহৎ এবং ওজনে খুব ভারী করেছেন বটে এবং একজন লোকের সংকীর্ণ পাকযন্ত্রের পক্ষে কম দুঃসহ করেন নি, কিন্তু হাতের কাজটা মাটি করেছেন। এরই একটাকে ভেঙে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটা ফল গড়লে সেগুলো দেখতে ভালো হত। জর্জ এলিয়টের

এক একটি নভেল এক-একটি সাহিত্য-কাঁঠাল-বিশেষ।....'

'সাহিত্য' কাঁঠালকে সামনে এনে আমকে রাখল প্রচ্ছন্ন। 'সাহিত্যের পথে'-য় কাঁঠাল চলে গেল গ্রীনরুমে, আম এগিয়ে এল প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে, নানা দৃশ্যে।

১। "যে কবির সাহস আছে সুন্দরের সমাজে তিনি জাতবিচার করেন না। তাই কালিদাসের কাব্যে কদম্ববনের একশ্রেণীতে দাঁড়িয়ে শ্যামজম্বু বনান্তও আষাঢ়ের অভ্যর্থনাভার নিল। কাব্যে সৌভাগ্যক্রমে কোনো শুভক্ষণে রসজ্ঞ দেবতাদের বিচারে মদনের তূণে আমের মুকুল স্থান পেয়েছে। বোধ করি, অমৃতে অনটন ঘটে না বলেই আমের প্রতি দেবতাদের আহারে লোভ নেই।...."

২। "আম এবং মাকাল অসীমের মধ্যে একই, কিন্তু আমরা খেতে গেলেই দেখি তাদের মধ্যে অনেক প্রভেদ। এই জন্যে অতি বড়ো তত্ত্বজ্ঞানী অধ্যাপকদেরও যখন ভোজে নিমন্ত্রণ করি তখন তাঁদের পাতে আমের অকুলান হলে আম দিতে পারি নে।...."

৩। "তবু রসভোগকে বিশ্লেষণ করা চলে। মনে করা যাক, আম। যেভাবে যেটা ভোগ্য সে-ভাবে উদ্ভিদবিজ্ঞানের সে অতীত। ভোগ সম্বন্ধে তার

রমনীয়তা ব্যাখ্যা করবার উপলক্ষে বলা চলে যে,
এই ফলে সর্ব-প্রথমে যেটা মনকে টানে সে হচ্ছে
ওর প্রাণের লাবণ্য, এইখানে সন্দেশের চেয়ে ওর
শ্রেষ্ঠতা। আমের যে বর্ণমাধুরী তা জীববিধাতার
প্রেরণায় আমের অন্তর থেকে উদ্ভাসিত, সমস্ত,
ফলটির সঙ্গে সে অবিচ্ছেদে এক। চোখ ভোলাবার
জন্যে সন্দেশে জাফরান দিয়ে রঙ ফলানো যেতে
পারে ; কিন্তু সেটা বড় পদার্থের বর্ণযোজন,
প্রাণপদার্থের বর্ণ-উদ্ভাবনা নয়। তার সঙ্গে
আমের আছে স্পর্শের সৌকুমার্য, সৌরভের সৌজন্য।
তারপরে তার আচ্ছাদন উদঘাটন
করলে প্রকাশ পায় রসের অকৃপণতা। এইরূপে
আম সম্বন্ধে রসভোগের বিশেষত্বটিকে বুঝিয়ে
বলাকে বলব আমের রসবিচার। এইখানে
স্বাদেশিক এসে পরিচয়পত্রে বলতে পারেন, আম
প্রকৃত ভারতবর্ষীয়, সেটা ওর প্রচুর ত্যাগের
দাক্ষিণ্যমূলক সাত্বিকতায় প্রমাণ হয়, আর
র‍্যাস্‌পবেরি, গস্‌বেরি বিলাতি কেননা তার
রসের ভাগ তার বীজের ভাগের চেয়ে বেশি নয়,
পরের তুষ্টির চেয়ে ওর আপন প্রয়োজনকেই
বড়ো করেছে, অতএব ওরা রাজসিক।”

আম-এর সত্তা-পরিচয়ে ভারতবর্ষীয় আর

র‍্যাসপ্‌বেরিদের প্রসঙ্গে বিলেতি, এই দুটো বিশেষণের আকস্মিক আবির্ভাবে কোনো কোনো পাঠকের মনে হতে পারে, এ অণুসঙ্গ যেন গায়ে-পড়া, আড়ষ্ট মেয়েকে কনে-দেখার আসরে ঠেলে পাঠানোর মতো। মনে হওয়াটা অস্বাভাবিক নয় আদৌ। এই সময়কার অধিকাংশ লেখাতেই তিনি আনছেন য়ুরোপের প্রসঙ্গ। য়ুরোপের সাহিত্য প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে একদিকে যেমন তিনি হয়ে উঠছেন অক্লান্তরূপে ব্যগ্র, অন্যদিকে সে-মন্তব্যে তাঁর মনের সংশয়, বিরাগ, বিরক্তির প্রকাশেও হয়ে উঠছেন প্রায় আক্রমণকারীর মতো প্রবল। সময়ের এই বিশেষ পর্বে, যখন বাংলা সাহিত্যে আধুনিক অথবা অতি-আধুনিক এক ধরনের লেখা-জোখার আত্মপ্রকাশ ঘটতে চলেছে অতি ভৈরব হরষে, বাছাই-করা কিছু য়ুরোপীয় লেখক হয়ে উঠেছে ওইসব আধুনিকদের আদর্শ আর রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতাকে প্রত্যাখ্যানে ক্রমশই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে আধুনিকদের প্রতিবাদী-কণ্ঠস্বর, ততই রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় গেঁথে বসছে এইরকম একটা বদ্ধমূল ধারণা যে এইসব তরুণ নবাগত সাহিত্যকর্মীরা য়ুরোপীয় সাহিত্যের ভুল প্রভাবে মেতে এবং স্বদেশের বাস্তবতার সঙ্গে শিকড়ের বাঁধন ছিঁড়ে সাহিত্যের

নামে যা প্রকাশ করছে অথবা করতে চাইছে তা শেষ পর্যন্ত চরম এক বিশৃঙ্খলাময় পঙ্কিলতারই প্রেতচ্ছবিকে প্রকট করে তুলবে দিনে দিনে।
ঐ সময়ের প্রবন্ধে, নাটকে, চিঠিতে সর্বত্রই তাঁর এই তিরস্কার, ভৎ´সনা, তিক্ত সম্ভাষণ এবং কঠোর সাবধানবাণী। অথচ আশ্চর্য, এই রবীন্দ্রনাথই বঙ্কিম-বিপিনদের সঙ্গে তর্ক-যুদ্ধে য়ুরোপীয় সাহিত্যের আধুনিকতাকেই ব্যবহার করেছেন নিজের তূণীরের সবচেয়ে ধারালো অস্ত্র হিসেবে। আবার আধুনিকদের সঙ্গে বাদ-বিসম্বাদে ভাঁটা পড়ার কিছু পরেই 'পথে ও পথের প্রান্তে'য় লিখছেন—
"আমি যে শতকরা একশো হারে বাঙালী নই, আমি যে সমান পরিমাণে য়ুরোপেরও, এই কথাটারই প্রমাণ হোক আমার ছবি দিয়ে।"
খুব খুঁটিয়ে দেখলে হয়তো ধরা পড়বে, আধুনিকদের বিরুদ্ধে তিরস্কার-বাণী রচনার ফাঁকে ফাঁকেই, তথাকথিত আধুনিকদের চেয়ে আরও কত আধুনিক তিনি এই কথাটির প্রমাণ দেওয়ার জন্যে কোমর বেঁধেছিলেন মনে মনে। তাই ক্রমশই তীক্ষ্ণ, বিদ্রূপের পাথরে শান-দেওয়া ঝকঝকে ক্ষুরধার হয়ে উঠেছিল তাঁর ভাষা। আর নিজের ভাষার পরিবর্তনের সমান্তরালে

রেখার কাটাকাটিকে অতিক্রম করে তিনি তাঁর ছবিতে হয়ে উঠছিলেন তখনকার অতি আধুনিক সাহিত্যের চেয়েও আরো আদিমতম আধুনিক।

ফিরে আসি আমতত্ত্বে।

'সাহিত্যের পথে'-র আমতত্ত্বই যে অমিত রায়-এর মুখে জুগিয়েছে আমের উপমা, সে বিষয়ে নিশ্চয় খানিকটা নিঃসংশয় হওয়া যায় এখন। নিঃসংশয় হবার পক্ষে আরে একটা প্রমাণ, 'সাহিত্যের পথে'-র একেবারে শেষের রচনার আগের রচনাটি, যার নাম 'পঞ্চাশোর্ধম্'। পড়লে মনে হবে এ বুঝি অমিতম রায়-এর সেই অভিযোগ, 'রবি ঠাকুরের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো নালিশ এই যে, বুড়ো ওয়র্ডসওয়র্থের নকল করে ভদ্রলোক অতি অন্যায় রকম বেঁচে আছে', তারই জবাবি-উত্তর।

'সাহিত্যের পথে'-র অনেক উত্তরই 'শেষের কবিতা'য় উল্টে গিয়ে প্রশ্ন।

এতক্ষণ দেখা গেল সমসাময়িক সাহিত্য-বিতর্কের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আমতত্ত্ব প্রয়োগের ধরণ-ধারণ। এর বাইরেও কি আমতত্ত্বকে কাজে লাগিয়েছেন কোথাও? হ্যাঁ, লাগিয়েছেন।

শান্তিনিকেতন থেকে চিঠি লিখছেন ইন্দিরা দেবীকে। তারিখ ১৩ জানুয়ারি, ১৯৩৫।

'....গান দেখলুম। কিছু বলতে ভরসা হয় না, পাছে

আমার বাক্য গানের মতো অশ্রাব্য হয়ে ওঠে।
ফলের মধ্যে যে শাঁস থাকে, তারই মোরব্বা বলে,
আঁটির মোরব্বা অচল। কঠোর তত্ত্বকথা
সুরের রসে পাক করলেই যদি গান হোত
তাহলে—
ant-কে Betuoven তাঁর সিম্ফানিতে
গালিয়ে নিতে পারতেন।"

দেখা যাচ্ছে,সাহিত্যের প্রসঙ্গ ছাড়াও আমতত্ত্বকে কাজে লাগিয়েছেন তিনি। এবং তা একবার নয়, একাধিকবার। গানের কথাতেই ফেরা যাক আবার। তাকানো যাক তাঁর 'পথে ও পথের প্রান্তে'-র ১২ নম্বর চিঠির দিকে। লিখছেন রাণী মহলানবিশদের—

"আমার সেই আঙুল আজো বন্দীশালায়।....
লেখার কাজ একপ্রকার বন্ধই আছে।
আমার কলম খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মাঝে মাঝে
এক-একটা গান লেখে মাত্র। —'মাত্র' বলছি
জনসাধারণের দাবির মাত্রার মাপে। কাব্য-
রচনাতেও তারা মাপের ফিতে লাগায়। কাব্য-
রাজ্যে দশ লাইনের একটা গানেরও অভিজাত্য
থাকতে পারে এ তাদের বোঝানো শক্ত।
বোম্বাই আমের চেয়ে চালকুমড়োকে যখন তারা
বেশি গৌরব দেয় তখন সন্দেহ প্রকাশ করলে

দাঁড়িপাল্লা এনে হাজির করে।"

ঐ বইয়েরই ২৯ নম্বর চিঠি। এ চিঠির মধ্যে গানের কথা নেই, আছে যাযাবর জীবনের উপকারিতা সম্বন্ধে উপদেশ। ইঁট কাঠের বাঁধন দিয়ে অচল ডাঙার উপর বাড়ি তৈরী করে আজীবন সেই ভাঙা বাড়িকে প্রাণপণ আঁকড়ে ধরে বাঁচার চেয়ে মানুষের বাস করা উচিত এমন তাঁবুতে যখন খুশি খুঁটো উপড়িয়ে নিয়ে যেখানে খুশি চলে যাওয়ার বিরুদ্ধে শক্ত দেয়াল খাড়া হয়ে নেই যেখানে, পাথর-ইঁটের দেয়াল তুলে মুক্ত আকাশকে মুষ্টিঘাত করার বীরত্ব নেই যার। বলতে বলতে চলে এলেন বিশ্বভারতীর প্রসঙ্গে।

"আমার উচিত ছিল বিশ্বভারতীর সম্পূর্ণতা সাধনের জন্যে বিশ্বভারতীর শেষ টাকা ফুঁকে দিয়ে চলে যাওয়া। তারপরে নতুন কাল নিজের সম্বল ও সাধনা নিয়ে নিজের ধ্যানমন্দির পাকা করুক। আমার সঙ্গে মেলে তো ভালো, যদি না মেলে সেও ভালো। কিন্তু এটা যেন ধার করা জিনিস না হয়।"

এরপরেই আমের উপমা।—

"প্রাণের জিনিসে ধার চলে না—অর্থাৎ তাতে প্রাণবান কাজ হয় না; আমগাছ নিয়ে তক্তাপোষ

করা চলে কিন্তু কাঁঠাল ব্যবসায়ী তা নিয়ে কাঁঠাল ফলাতে চেষ্টা যেন না করে। এর ভিতরকার কথাটা হচ্ছে---মা গৃধঃ।"

'বিচিত্র প্রবন্ধ'-র একটা প্রবন্ধের নাম—'আষাঢ়'। বিশ্বব্যাপারে যে ডিপার্টমেন্টটা বিনা কাজের, মানুষের আসল আসা-যাওয়ার ঝোঁক সেই দপ্তরেরই বেশি। নিষ্প্রয়োজনের জায়গাতেই মানুষ হৃদয় ছড়ানোর সুখ অনুভব করে বেশি। এই জন্যেই ফলের চেয়ে ফুলে তার বেশি তৃপ্তি।

"ফল কিন্তু কম সুন্দর নয়, কিন্তু ফলের প্রয়োজনীয়তাটা এমন একটা জিনিস যাহা লোভীর জমায়, বুদ্ধি-বিবেচনা আসিয়া সেটা দাবি করে; সেইজন্য ঘোমটা টানিয়া হৃদয়কে সেখান হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াইতে হয়। তাই দেখা যায় তাম্রবর্ণ পাকা আমের ভারে গাছের ডালগুলি নত হইয়া পড়িলে বিরহিনীর রসনায় যে রসের উত্তেজনা উপস্থিত হয় সেটা গীতিকাব্যের বিষয় নহে। সেটা অত্যন্ত বাস্তব, সেটার মধ্যে যে প্রয়োজন আছে তাহা-টাকা-আনা-পাইয়ের মধ্যে বাঁধা যাইতে পারে।"

সবুজপত্রের জন্যে লেখা চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন প্রমথ চৌধুরী। আলস্যের কথা বলতে যাঁর কলম অলস হয়নি কখনো, যাঁর আলস্য-প্রসঙ্গ বইয়ের

আকারে সংকলন করতে চাইলে যার আকৃতি পাল্লা দিতে চাইবে অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত নাই হোক, সপ্তকাণ্ড রামায়ণের সঙ্গে, সেই রবীন্দ্রনাথ এখানেও আলস্য-যাপনের ছাড়পত্র আদায় করতে চাইছেন চিঠির উত্তরে—

"আচ্ছা, রাজি আছি। ১৫ই বৈশাখেই বের কর। ইতিমধ্যে তুই একটা লেখা দিতে পারব। চারদিকের নানাবিধ তাড়নায় মাথার মগজের মধ্যে একটা আবর্তের সৃষ্টি হয়েছিল—ক্ষণে ক্ষণে ঘুরপাক খেলত। এখন একটু ভালো আছি কিন্তু বুদ্ধির যন্ত্রটাকে বেশি খাটতে সাহসও হয় না, ইচ্ছাও হয় না—একটা মৌরসী ছুটির জন্যে মনটা মাঝে মাঝে দরখাস্ত লিখে বসে। গাল পাড়বার বেলায় বৈরাগ্যকে রেয়াৎ করি নে কিন্তু হাড়ে হাড়ে সে যেন বাঁশি বাজাতে থাকে—একেবারে ভিতরের দিক থেকে সে আমাকে উদাস করে তোলে। যদি শুষ্ক বৈরাগ্য হত তাহলে একে কাছে আসতে দিতুম না, কিন্তু এ যে বাসন্তী রঙে রাঙানো—আমের বোলে গন্ধে ভরা।...."

বিচিত্র প্রবন্ধ-র 'আষাঢ়'-এ ফলের বদলে ফুলের গলাতেই পরিয়েছেন বরণমালা। অথচ অন্য হাজার জায়গায় ফল-এর মাথায় নিজেই পরিয়েছেন প্রশংসা-প্রশস্তির কত না রকমারী মুকুট।

১। "ফল আপনাকে পরিণত করবার জন্যই
বাহিরের দিকে একটা খোসার পর্দা টেনে দেয়।"
২। "তৎসত্ত্বেও ফলের ডালিতে এমন একটি
বিশেষ খুশি আছে যা কৈফিয়ৎ তলবই করে না।"
৩। "অত্যন্ত পাকা ফলের মতো আমার উপরকার
শক্ত খোসাটুকু সাতখানা হয়ে ফেটে গেছে,
এখন যে-কোনো আগন্তুক পাখি যে মতলবেই
হোক এসে ঠোকর দিতে পারে, কোনো বাধা
নেই।"
৪। "সেই জন্যে বক্তৃতাটি অতি সহজেই পাকা
ফলের মতো বর্ণেগন্ধে রসে বেশ টসটসে হয়ে
উঠতে পেরেছিল।"
৫। "তবে মনুষ্য সমাজ এমন একটি ফলের মতো হইয়া
উঠিত যাহার বীচিই সমস্তটা শাঁস একেবারেই নেই।"
সাহিত্যের অন্তরঙ্গ আলোচনায় 'ফল'-এর কথা
এসে যায় কখনো কখনো পৃথিবীর প্রায় সব
কবিরই রচনায়। 'তরুণ কবিকে পত্রাবলী'-র
৬নং চিঠিতে রিল্‌কে বলেছিলেন এক ফলের কথা।
রিল্‌কে যে-দেশের কবি, সেই দেশেরই মহাকবি
গ্যেটে কালিদাসের শকুন্তলা পড়ে উচ্চারণ
করেছিলেন যে প্রশংসাবাণী তার মধ্যেও ছিল
তরুণ বৎসরের ফুল আর পরিণত বৎসরের
ফলের উপমা।

আন্তর্জাতিক PEN সংস্থা সেবার আয়োজন করেছে এক কবি সম্বর্ধনা। সম্মানিত করবে দুই কবিকে। পাবলো নেরুদা এবং গারথিয়া লোরকা। ইচ্ছাকৃতভাবেই দুই কবি বসেছেন টেবিলের দু-প্রান্তে। এবং যখন ভাষণ দিতে শুরু করলেন তখন দুজনেই একসঙ্গে। দুজনে মিলে একটাই ভাষণ। স্প্যানিশ ভাষার মহোত্তম কবি রুবেন দারিও সম্পর্কে শ্রদ্ধানিবেদনটাই ছিল তাঁদের ভাষণের বিষয়। সে ভাষণের একাংশ—

নেরুদা—বুয়েনো এয়ারেসের কোথাও কি আছে রুবেন দারিও ময়দান ?

লোরকা—রুবেন দারি-র স্ট্যাচুই বা কোথায় ?

নেরুদা—তিনি ভালবাসতেন পার্ক ? রুবেন দারিও পার্ক কোথায় ?

লোরকা— রুবেন দারিও গোলাপ কি বানিয়েছে কোনো মালী ?

নেরুদা—রুবেন দারিও-র নামে আপেল গাছই বা কোথায় ? কোথায় রুবেন দারিও আপেল ?

সাহিত্যের আলোচনায় ফল-এর উপমা প্রয়োগ আর যেখানে যেমনভাবেই ঘটুক, রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে যাওয়া অসম্ভব। শুধু আম-কেই

তিনি যে-ভাবে পাকা আসন দিয়ে গেলেন সাহিত্যের গুরুগম্ভীর বিতর্কসভায়, তা থেকে যতখানি বোঝা যায় তাঁর সৃষ্টিচেতনার রক্তস্পন্দন, তার থেকে অনেক বেশি বোঝা যায় তাঁর দৃষ্টির তেজ, যা ভেদ করে চলে যায় বস্তুর একেবারে অভ্যন্তরে। আর সামান্য, অতিসাধারণ বস্তুর ভিতর থেকেও নিংড়ে নেয় তার ভিতরকার অন্তঃসার, যার একটু পরেই ব্যবহার কোনো বৃহৎ বক্তব্যের উন্মোচনে।

সাহিত্য সম্পর্কিত প্রবন্ধ ছেড়ে তাঁর 'আকাশ প্রদীপ'-এর কিছু কিছু কবিতার দিকে মনোযোগী হলেও চোখে পড়বে আমতত্ত্ব। স্তব্ধতামর্মর পূর্ণতা দেখেছেন নারীর কপালে। সে পূর্ণতাকে ব্যাখ্যা করবেন কি করে? তখনই মনে পড়ছে আমের কথা।

"হয়তো মুকুল-ঝরা মাসে
পরিণতফলনম্র অপ্রগল্‌ভ যে মর্যাদা আসে
আম্রডালে—"

'আকাশ প্রদীপ'-এরই আর এক কবিতা, কাঁচা আম। তিনটে কঁাচা আম পড়ে আছে গাছতলায় চৈত্র মাসের সকালের রোদ্দুরে। তিনি দেখলেন, তবুও তাঁর ব্যগ্র হাত এগিয়ে গেল না তাদের কুড়িয়ে নিতে। চা খেতে খেতে তিনি বললেন পালের হাওয়া বদল। পূবদিকের খেয়া

ঘাট ঝাপসা হয়ে আসছে ক্রমশ। অর্থাৎ এবার অন্য পারে প্রস্থানের সময় অত্যাসন্ন। নীচের চারটে পংক্তিতে সেই হারানো ক্ষমতার জন্যে দীর্ঘশ্বাস। এর আগে যে বেদনাবোধ থেকে জানিয়াছিলেন যে অর্জুনের মতো তিনি নিজের গাণ্ডীব নিজে তুলতে অক্ষম, সেই বেদনার প্রতিধ্বনি শোনা গেল যেন এই তিনটে কাঁচা আমের উপলক্ষে।

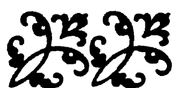
"সেদিন গেছে যেদিন দৈবে-পাওয়া
দুটি-একটি কাঁচা আম
ছিল আমার সোনার চাবি
খুলে দিত সমস্ত দিনের
খুশির গোপন কুঠরি ;
আজ সে তালা নেই, চাবিও লাগে না।"

আমতত্ত্ব আলোচনার এখানেই পরিসমাপ্তির

৩

লম্বা দাঁড়ি টানতে যাওয়ার আগে মুহূর্তে থামতে হল আবার। হঠাৎ চোখে পড়লো তাঁর আমতত্ত্বের জগতেও এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। চোখে পড়ল এমন এক চিঠিতে এমন এক উপন্যাসের আলোচনা, যার প্রসঙ্গে তিনি আমকে টেনে এনেছেন ঠিকই কিন্তু, এই প্রথম, জিতে-যাওয়ার

মুকুটটা পরিয়ে দেননি মাথায়। উপন্যাসের নাম, 'অন্তঃশীলা'। বাংলা-সাহিত্যে প্রথম 'ষ্ট্রীম অফ 'কন্‌শাস্‌নেস'-এর প্রবর্তনা এ উপন্যাসে। উপন্যাসের রচয়িতা ধূর্জটিপ্রসাদকে লিখেছেন তিনি—
"আমের ভিতরে আছে একটা অনবছিন্ন শাঁস, আর তার মাঝখানটিতে একটি মাত্র আঁটি। দাড়িমের শক্ত খোলার শত শত দানা এবং প্রত্যেক দানার মধ্যেই একটি করে বীজ। তোমার অন্তঃশীলা সেই দাড়িম জাতীয় বই। বীজ বাণীতে ঠাসা। তুমি এত বেশি পড়েছ এবং চিন্তা করেছ যে তোমার ব্যাখ্যান তোমার আখ্যানকে শতধা বিদীর্ণ করে বিষ্ফুরিত হতে থাকে।"
কিছু সময়ের জন্যে কোথাও আটকে গেলেও, নিয়ত নির্মাণের অন্তশীল গতিবেগ যাঁকে থামিয়ে রাখতে পারে না কোনো ধরা বাঁধা নির্দিষ্টতার গোল গণ্ডীতে ; নিজের গড়ে তোলা আমতত্ত্বে অবশেষে আমের পরাভব ঘোষণা-করা এই চিঠিতে তো তাঁরই জয়ের যাত্রার ধ্বনি।



কথার ছবি, ছবির নেপথ্য

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এখানকার কালে বেশ বিস্ময়কররূপে ঘটে চলেছে দুটি ঘটনা, পাশাপাশি, আগাগোড়া সমান্তরাল নয় যদিও। প্রাবন্ধিকেরা ক্রমাগতই হয়ে উঠছেন মনোযোগী, রবীন্দ্রনাথের নির্মাণ ও সৃষ্টির নানা ভিন্ন ভিন্ন স্তর-এর তন্ন তন্ন পর্যবেক্ষণে। আর কবি-সাহিত্যিক যাঁরা, তাঁদের অধিকাংশই দায়সারা সেলাম ঠুকে রবীন্দ্রনাথকে ক্রমশই সরিয়ে রাখছেন নিজেদের অধ্যয়নের-অনুভবের-অনুসন্ধিৎসার থেকে দূরে, যেন রবীন্দ্রনাথ এমন একটা পড়ে পাওয়া পাথরের চাঁই, যাকে যেখানে খুশি রাখা চলে নিঃসঙ্কোচে। আবার এমনও নয় যে ঐ সব কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা রবীন্দ্র-বিরোধী পুরোপুরি, তাঁদের আলোচনা থেকে রবীন্দ্রনাথকে বোঝা বা জানা যাচ্ছে অন্যভাবে, উল্টোদিকের কোনো আলোর প্রক্ষেপণে, স্যাডো প্লেতে ঘটে

থাকে যেমন। এঁদের রবীন্দ্র-প্রত্যাখ্যানকে আমরা যে ওজন করার বাটখারার মতো ব্যবহার করতে পারি না, তার কারণ শুধু এই নয় যে এঁদের মন্তব্য-মতামতে ঠিকরে বেরোয় না এমন কোনো দীপ্ত ঝলক যা থেকে বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বীতস্পৃহ অথবা অনাগ্রহী হওয়ার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা-বিশ্লেণ ; তার আরও একটা বড় কারণ এঁদের এলোমেলো, নিতান্তই হালকা, স্মৃতিকথামূলক, খবরের কাগুজে ফিচারমার্কা চটুলতায় কখনোই ধরা পরা পড়ে না রবীন্দ্রনাথকে অনাধুনিক কিংবা অপ্রয়োজনীয় ঘোষণার ক্ষেত্রে তাঁরা ব্যবহার করেছন আধুনিকতার কি-জাতীয় সংজ্ঞা, তুলনা করেছেন বড়ো-মাপের কোন্ আধুনিকের সঙ্গে, এবং এখন তাঁরা কি-জাতীয় আধুনিক স্রষ্টার রচনাবলী পাঠে আগ্রহী, অভ্যস্ত এবং অবহিত।

মিলটন গ্রেট পোয়েট হওয়া সত্ত্বেও 'ডান ড্যামেজ টু দা ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ ফ্রম হুইচ ইট হ্যাজ নট হোল্লি রিকভার্ড' ১৯৩৬-এ এ-রকম নির্দয় সমালোচনার পরও এলিয়টকে বারো বছর অধ্যয়ন-অনুবীক্ষণ করে যেতে হয় ঐ মিলটনকেই। এবং বুদ্ধিজীবী হিসেবে নিজের বিবেকবানতা প্রমাণের গরজেই দীর্ঘ বারো বছর পরে তিনি লজ্জিত হন

না নিজের পূর্ব-মন্তব্যের বিরোধিতায়। একজন চরিত্রবান বুদ্ধিজীবীর দায়িত্বশীলতা এইভাবেই জুড়ে থাকে তাঁর সমগ্র জীবনের পরিধি, বিরতিহীন জিজ্ঞাসায়, মননের নিরন্তর ঘষা-মাজায়।

যে-দেশে সৃষ্টিশীল লেখকদের অধিকাংশই অধুনা প্রাবন্ধিক হওয়ার পরিশ্রমে বোধ-বুদ্ধি ঘামাতে নারাজ, সে-দেশে জাত-প্রাবন্ধিকের সংখ্যা স্বল্প হতে বাধ্য। জাত-প্রাবন্ধিক কথাটা তুলতে হল এই কারণে যে এদেশে প্রবন্ধের নামে অবিরত যা প্রকাশিত হয়ে যায়, তার সিংহভাগই গবেষণা নয়, সম্পাদনা। রবীন্দ্র-চর্চায় আগ্রহী প্রাবন্ধিকদেরও আমরা ভাগ করে নিতে পারি দু ভাবে, সংকলক আর গবেষক। বলা বাহুল্য গবেষক-চরিত্রের প্রাবন্ধিক বা সমালোচকদের জন্যেই আমাদের আন্তরিক উন্মুখতা, যেহেতু তাঁদের রবীন্দ্র-চর্চায় রবীন্দ্র-নাথই নন শুধু, এদেশের সাহিত্যের পতন-অভ্যুদয়ের মূল্যায়নও হতে থাকে সেইসঙ্গে, ব্যাপ্ত বিশ্ব-পটভূমিকায়।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাবন্ধিক হিসেবে পূর্বকথিত সংখ্যালঘুদেরই একজন, অর্থাৎ গবেষক। রিটেলার নন, ইণ্টারপ্রেটার। রবীন্দ্র-চর্চায় তাঁর নিমগ্নতা বহুদিনের, অসংখ্য প্রবন্ধে

যার প্রমাণ। রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে সম্ভবত
এটাই তাঁর প্রথম বই। দশটি প্রবন্ধের গুচ্ছে
সাজানো এ-বইয়ের আলোচ্য বিষয়ের নির্দিষ্টতা
বইটির নামকরণেই স্পষ্ট। প্রাথমিকভাবে
দশটি প্রবন্ধের মিল যেখানে, তাকে আখ্যা
দেওয়া যেতে পারে কেন্দ্রাভিগ, যেহেতু সব কটি
প্রবন্ধই, যে-যার নিজস্ব সংকোচন-বিবর্ধন-এর
স্পন্দনশীলতা সত্ত্বেও একটা নির্দিষ্ট কেন্দ্র-বিন্দুর
অভিমুখী, এবং সেখানে পৌঁছনোতেই তাদের
সার্থকতা। সে কেন্দ্রবিন্দুর নাম রবীন্দ্র-
চিত্রকল্প।

উদ্দেশ্য-অভিপ্রায় যদিও দশটি প্রবন্ধের একই,
তবুও তাদের মধ্যে রয়েছে চরিত্র বিভাগ।
কবিতার চিত্রকল্প নিয়ে এখানে প্রবন্ধের সংখ্যা
তিন। গানের চিত্রকল্প নিয়ে প্রবন্ধের সংখ্যা
পাঁচ। গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের চিত্রকল্প নিয়ে
প্রবন্ধ একটাই। আর বইয়ের শেষ প্রবন্ধটিতে
মিলেমিশে একাকার তাঁর গান-কবিতা নাটক-
ছবি

বিদেশী ভাষায়, আমরা জানি, মহৎ কবিদের
চিত্রকল্প নিয়ে গবেষণায় কী অখণ্ড ধারাবাহিকতা।
রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্প নিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি বই
এইই বোধ হয় প্রথম। সরোজবাবুকে ধন্যবাদ

জানাতে হয় সানন্দে, কারণ তিনি হাত
লাগিয়েছেন এমন একটি কাজে, যা ছিল বহুদিনের
আকাঙ্ক্ষিত। অল্প কিছুদিন আগে, অরুণ মিত্রের
অনুবাদে আমরা পড়েছি পল ভালেরির
'কাব্যতত্ত্বের শিক্ষাদান' নামের একটা মূল্যবান
'প্রবন্ধ। সেখানে তাঁর খেদ—"আমাদের কালে
সাহিত্যের ইতিহাস প্রভৃত বিকাশলাভ করেছে
এবং তা শেখাবার জন্যে অনেক অধ্যাপক-পদের সৃষ্টি
হয়েছে। তার বিপরীতে এটাও আশ্চর্য হয়ে
লক্ষ্য করার মতো যে, যে-মননক্রিয়ার রূপ
সৃজনশীল রচনার জন্ম দেয় তার পর্যালোচনা খুব
কমই করা হয়, কিংবা শুধু আপতিকভাবে করা
হয় এবং তাতে নির্দিষ্টতার যথেষ্ট অভাব থাকে।
এও কম লক্ষণীয় নয় যে, পঠন-বস্তুর সমালোচনায়
এবং তার ভাষাভিত্তিক ব্যাখ্যায় যে কড়াকড়ির
প্রয়োজন হয়, মনন-বস্তুর উৎপাদন ও
উপভোগের লক্ষণ বিশ্লেষণে তার সাক্ষাৎ সচরাচর
পাওয়া যায় না।"

পরে আরো নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন সমালোচকের
দায়।

"ভাষায় প্রকৃত সাহিত্যিক ক্রিয়া-সংক্রান্ত
গবেষণাকে সুনির্দিষ্ট করা এবং পুষ্ট করা, বচনের
শক্তি ও অনুপ্রবেশ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে প্রকাশন

ও ব্যঞ্জনার ব্যাপারে যে-সব আবিষ্কার হয়েছে সেগুলোকে পরীক্ষা করা এবং কল্পনার ভাষা ও নিত্য ব্যবহারের ভাষার মধ্যে ভালোভাবে স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়ের জন্যে মাঝে মাঝে যে-সব বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছে সেগুলোকে পরীক্ষা করা, ইত্যাদি।"

'কলেজ দ্য ফ্রাঁস'-এর অধ্যাপক মনোনীত হয়ে ভালেরি এ ভাষণ দিয়েছিলেন ১৯৩৬-এ। সে-ঘটনার পর প্রায় পঞ্চাশ বছর পার হওয়ার কাছাকাছি পৌঁছেও আমরা দেখছি আমাদের দেশে সাহিত্যের ভাষা, কবিতার বেলায় যা প্রধানত চিত্রকল্প, সাহিত্যের মনন-ক্রিয়া, সাহিত্যের মেকানিজম সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহের কি অসম্ভব দৈন্য। আদৌ অসঙ্গত নয় এই অনুমান যে, এই দৈন্যের সুযোগে এদেশে প্রায় বুক-ফুলিয়েই গজিয়ে ওঠার সাহস পেয়ে গেছে সেই ধরনের সাহিত্য, যা সাহিত্যের যথার্থ সৃজনশীল স্বাদ থেকে পাঠকদের শুধু বঞ্চিতই করছে না, পণ্য-ধর্মী প্রচার মাধ্যমের তুরী-ভেরীর আস্ফালনে ক্রমশই বিস্তৃত হয়ে চলেছে বিকৃত-সাহিত্যের এমন এক স্বশসিত মুক্তাঞ্চল, যেখানে পাঠক অন্তঃসারশূন্য আপাত-চমকের শিকার হতে বাধ্য। এই হল

সেই সময়, যখন আমাদের প্রয়োজন সমালোচকের প্রজ্ঞাই নয় শুধু, সমালোচকের উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত শ্রম। আলোচ্য বইয়ে সরোজ-বাবুর শ্রমের ছাপ স্বতপ্রকাশিত। আর সে শ্রমের উদ্দেশ্য একটাই, চিত্রকল্পের আলোয়, আবার চিত্রকল্পকের শরীরে নতুন আলো ফেলে, কবি-সত্তার দ্বান্দ্বিক সামগ্রিকতার উন্মোচন, এমন কি কবি জীবনকেও নতুন করে আবিষ্কার। লেখকের নিজের ভাষায়—"কবির ব্যবহৃত ইমেজ, এপিথেট—সংক্ষেপে কাব্যের বহিরঙ্গ বিচারেব মাধ্যমেও কবির মানস-ইতিহাস-বিরচন সম্ভবপর। যেহেতু তা যুক্তি ও তথ্যের উপর নির্ভরশীল, এবং তা কবিজীবনীর অনুমোদন প্রাপ্ত, তাই এই বিচারের মধ্যেই কবির অন্যতর পরিচয় অপেক্ষা করে আছে।....এবং তা সম্ভব হলে আমরা কবির কাব্যের নতুন আলোকের সন্ধান তো পাবই, উপরন্তু কবির জীবনের উপরেও নব আলোকসম্পাত করতে পারব। সেই পথেই কবির কবিজীবনী রচিত হবে—কবির আবেদনও সার্থক হবে: কবিরে খুঁজো না কবির জীবনচরিতে, শব্দচিত্রে, রূপকে, উপমায় কাব্যের শরীরিনী লীলার সর্বত্রই কবির জীবনই ছায়াফেলেছে। সে-পথেই আমরা কবিজীবনীর সন্ধান করবো।"

যে-বইয়ের বিষয় চিত্রকল্প, সেখানে কাকে বলে চিত্রকল্প, অথবা চিত্রকল্পের সাম্রাজ্য কতদূর পর্যন্ত ছড়ানো, তার একটা সংক্ষিপ্ত কৈফিয়ত তিনি পেশ করেছেন 'কথারম্ভ'-য়। ছড়ানো উত্তর দিতে দিতে, সেগুলোকে গুছিয়েছেন এই ভাবে—

"কবিতার কাজ বলা নয়, হওয়া। কবিতা হয়ে ওঠে তার অন্তর্গত ও প্রেরণাগত সমগ্র সজীবতার টানে। কবিতার চিত্রকল্প—যথাযথতার অভিপ্রায়ী নয়—আনুরূপ্য সেখানে মোটেই বড় কথা নয়। বরঞ্চ সে বিপরীতকে বাঁধতে চায় সম্বন্ধে। তখনই সে অথবা তারা সমগ্র সজীবতার অভিব্যক্তি। অভিজ্ঞতা বা স্মৃতি মাত্র তথ্য। যখন চিত্রকল্পের ভিতর দিয়ে কবির অভিজ্ঞতা প্রতিমা হয়ে ওঠে তখনই তারা আর কেবল তথ্য নয়—সত্য।"

এ বইয়ের দশটি প্রবন্ধে সত্যিই যে কবির ভিন্ন কোনো জীবনচরিত গড়ে উঠেছে তা হয়তো নয়, কিন্তু ফসলের গঠন ও ফলনের বৈচিত্র্য থেকে কৃষকের শ্রমের ও সদিচ্ছার মানসিকতা পরিমাপের মতো, কবির মানস চরিত্রের অনেক ছোট গলি বা বড় রাজপথের খোঁজ-খবর পেয়ে যাই যেন, তাঁর এক লেখা থেকে অন্য লেখায়, এক বই থেকে অন্য বইয়ে উত্তরণের-অভিযানের-বিবর্তনের ক্রিয়া-পদ্ধতির নজির মারফত। সরোজবাবুর এ বই থেকে

পাওয়া তথ্যের-তত্ত্বের উপর নির্ভর করে কবির ভিন্ন-জীবনচরিত অর্থাৎ তাঁর মনন-চরিতের একটা খসড়া গড়তে চান যদি কেউ, সেটা হতে পারে এই রকম—

১। 'কড়ি ও কোমল' পর্যন্ত তাঁর কাব্য-প্রয়াসে খণ্ডতা, কারণ কল্পনার অপ্রস্তুতি।

২। 'সোনার তরী' এবং 'ছিন্নপত্র'-র কাল থেকেই অভিজ্ঞতার আত্মীকরণের সূত্রপাত। 'সোনার তরী'-র প্রকৃতি-চেতনায় সংক্রামিত হয়নি নগর-চেতনার নেতি।

৩। 'সোনার তরী' আর 'চিত্রা' পর্বে কবির মধ্যে দুটো ভিন্ন ধরনের কল্পনা-পদ্ধতি। এক ধরনের কবিতায় কল্পনা মূর্তি পাচ্ছে প্রত্যক্ষ-বাস্তবতার উষ্ণ স্পর্শে। অন্য ধরনের কবিতা ধর্না দিচ্ছে কাব্য-স্মৃতির দরজায়।

৪। 'খেয়া'-'উৎসর্গ' অধ্যায়ে নতুন বাঁক। বিরাট চিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের ঘাত-প্রতিঘাত। জীবনের দ্বান্দ্বিক সমগ্রতার উপলব্ধি।

৫। 'কল্পনা'য় কবিকে অধিকার করেছিল দুঃসময়-অসময়ের সংকট-চেতনা।

৬। 'ক্ষণিকা'-র কবিতায় কবির মুক্তির নিশ্বাস, জীবন ও প্রকৃতির খোলা পালে হাওয়া লাগিয়ে।

৭। 'বলাকা'-র কোথাও কোথাও 'ক্ষণিকা'-র ছায়া

পড়লেও, 'বলাকা'-তেই প্রথম বিস্তৃত জীবন-স্মৃতি সঞ্জাত আবেগের সংহতি।

৮। 'বলাকা' 'পূরবী'-র কালেই উপমা-রূপকের হাত ছেড়ে তাঁর চিত্রকল্প হয়ে উঠেছে জীবনের ভাবনাগত জটিল গভীরের ধ্বনি।

৯। 'পূরবী'-তেই কবির নতুন ও শেষ অধ্যায়ের সূচনা। কেননা, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে প্রথানুগত নয় এমন সব আপাত গদ্যস্বভাব বিষয় কাব্যের বিষয়ীভূত হচ্ছে এখানে। 'পূরবী'-তে আকাশের আদিগন্ত জুড়ে শূন্যতার বোধ। "সমগ্র 'চিত্রা' বা 'কল্পনা' বা 'বলাকা' কাব্য গ্রন্থে যতবার 'শূন্য' শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে, 'পূরবী'-কাব্যের প্রথম এক শত পৃষ্ঠার মধ্যে তার চেয়ে অনেক বেশিবার এর আবির্ভাব।" অসম্পূর্ণ শূন্যতার বোধনেই 'পূরবী'-র পূর্ণতা। বিশিষ্ট মৃত্যু-চেতনাই এখানে চিত্রকল্পের নিয়ন্ত্রক। 'পূরবী' থেকেই প্রহর শেষ হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে গেছে উচ্চ থেকে উচ্চতম সুরে পরবর্তী 'পরিশেষ', 'আকাশ-প্রদীপ', 'সেঁজুতি', প্রান্তিক'-এ।

"পূরবীর কাল বিষণ্ণ বার্ধক্যের কাল।"

১০। 'পরিশেষ'-এর একদিকে কবির নিজস্ব নিভৃত মৃত্যুচিন্তা, অন্য দিকে তারই সঙ্গে ওতপ্রোত নিজস্ব ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে বিশ্ব-ইতিহাসের সাদৃশ্যের সম্বন্ধ।

১১। 'সোনার তরী' 'চিত্রা'-র যুগে তাঁর কবিতায় বেশি প্রাধান্য লাল সোনালী রঙের। 'পূরবী'-তে সাদা ও নীলের। "'পরিশেষ'-এর স্থায়ী রঙ কালো।"

১২। 'বলাকা' 'পূরবী'-তে কবির ঝোঁক বড় কবিতার দিকে এবং তা সূচনাপর্বের বড় কবিতার চেয়ে সংহত।

১৩। 'লিপিকা' ও 'পুনশ্চ'-য় কবির দুর্ভাবনার স্পর্শ মেলে না আর।

১৪। "রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্পচারিতা 'পুনশ্চ' ও 'শেষসপ্তক'-এ স্তিমিত।"

১৫। "'জন্মদিন', 'আরোগ্য', 'শেষলেখা'য় কবির নিরলংকার রিক্ততাই বাঙ্ময়।"

উপরের অনুসন্ধানী সিদ্ধান্তগুলো-এ বইয়ের শুধুমাত্র প্রথম প্রবন্ধটি থেকেই খুঁটে খুঁটে জড়ো করা, যার নাম—

'রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্প ও প্রতীক'।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটি কবির দীর্ঘ কবিতার চিত্রকল্প বিষয়ে। আলোচনার জন্যে তিনি প্রধানত বেছে নিয়েছেন 'দেবতার গ্রাস', খানিকটা 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ', পরে 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্য। দীর্ঘ কবিতার আলোচনায় কেন তিনি অতটা পিছিয়ে থাকলেন, কেন এগিয়ে এলেন না এমন

কবিতার দিকে যা পাঠকের সর্বাধুনিক অগ্রসর মানসিকতারও অনেক ঘনিষ্ঠ কাছাকাছির, প্রবন্ধটা শেষ করার পর সে প্রশ্ন এড়ানো যায় না কিছুতেই। তাঁর শেষ পর্বের দীর্ঘ কবিতার সঙ্গে মধ্য পর্বের দীর্ঘ কবিতার চরিত্রগত তফাত অনেকখানিই। মধ্য পর্বের দীর্ঘ কবিতা কাহিনীপ্রধান, উত্থান-পতনের নাটকীয় উপাদানে ভরপুর। আর সমস্ত নাটকীয়তা সত্ত্বেও তারা আটকে থাকে বিশেষ স্থান-কালের ঘটনায়। ঘটনার সুনির্দিষ্ট চৌহদ্দির বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না তারা। বিমূর্ততার সূত্রে হয়ে উঠতে পারে না সব-সব সময়ের প্রতিনিধিস্থানীয়, যেমন পারে তাঁর 'বাঁশিওয়ালা' কিংবা 'শিশুতীর্থে'রা। বিস্ময় বিমূঢ়তার দিকে চলে, যখন দেখি 'দুই বিঘা জমি'-র মতো কবিতার, যাকে উপেক্ষা করলে রবীন্দ্রনাথের ক্ষয় হয় না এতটুকুও, চিত্রকল্পের পরিণতির ফসল মাপবার জন্যে তিনি সাজাচ্ছেন বাইশ চব্বিশটা পঙক্তি, অথচ 'শিশুতীর্থ'-র উল্লেখ শুধুমাত্র দু-বার, তাও অনেকটা নেম-ড্রপিং-এর ভঙ্গিতে। ফলে এ প্রবন্ধটা যেন অনেকটাই ছাত্র-পাঠ্য অ্যাকাডেমিক মেড-ইজি-র মতো। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের পক্ষে যতটুকু প্রয়োজনীয় ততটুকুই বলা যেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের

তথাকথিত যশস্বী অধ্যাপকেরা আধুনিক সাহিত্যের রূপরেখা নির্মাণের সময় যেভাবে এড়িয়ে যান অগ্রগামী-আধুনিকতাকে, এ দুটি প্রবন্ধ যেন যেই ছাঁচেরই রকমফের। ১৯১২-য় লেখা চিত্রাঙ্গদা নাট্যকাব্যের—

"তুমি ভাঙিয়াছ ব্রত মোর। চন্দ্র উঠি
যেমন নিমেষে ভেঙে দেয় নিশীথের
যোগনিদ্রা-অন্ধকার"

পড়ে হয়তো কোনো কোনো পাঠক নিজের আকণ্ঠ পরিতৃপ্তি দিয়ে মেপেও ফেলতে পারে রবীন্দ্র-প্রতিভার আর সেইসঙ্গে রবীন্দ্র-চিত্রকল্পের অপরিসীম উচ্চতা ও ব্যাপ্তি। কিন্তু ঐ একই কবিই যে ১৯৩০-এ নিজেকে আমূল বদলে, বাক্যের প্রতিমা ও শ্রাব্যের প্রতিমার এক

অসামান্য যোগফল ঘটিয়ে লিখতে পারেন—

"এক ভীষণ কোলাহলের তালে তালে একটা অস্ফুট ধ্বনিধারা বিসর্পিত
যেন অগ্নিগিরি নিঃসৃত গদগদকলমুখর পঙ্কস্রোত;
তাতে একত্রে মিলেছে পরশ্রীকাতরের কানাকানি,
কুৎসিত জনশ্রুতি অবজ্ঞার কলহাস্য।
সেখানে মানুষগুলো সব ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো

ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে—
মশালের আলোয় ছায়ায় তাদের মুখে
বিভীষিকার উল্কি পরানো।"

এটা জানতে পারলে অল্পে-পরিতৃপ্ত ঐ পাঠকের পক্ষে উপকারী হয়ে উঠত এই বোধ যে, রবীন্দ্রনাথের মননের জীবনচরিত হাল-আমলের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীদের মতো একটা দেড়টা দশকেই যা পাকার পেকে মাটিতে খসে পড়ার নয়, বর্ষে বর্ষে ক্রমাগত জিজ্ঞাসায়, অভিজ্ঞতার ক্রমার্জিত সম্পদে ক্রমবর্ধমান। আর সত্যি সত্যি এটাই তো ছিল সরোজবাবুর অন্বিষ্ট ও অভীষ্ট।

সরোজবাবু যদি তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধে, বিশেষ করে গান সম্পর্কিত যেগুলো, আমাদের ভাবনাচিন্তায় নতুন কোনো বোধের মান না জোগাতেন, তাহলে হয়তো তাঁর ঐ দুটো প্রবন্ধ সম্পর্কে আমাদের প্রত্যাশা উদ্গ্রীব হয়ে উঠত না জিরাফের লম্বা গলায়। আর সেই কারণেই ঐ দুটো প্রবন্ধ পড়ার পর এটা মনে না হয়ে পারে না যে, একটা জরুরি আলোচ্য বিষয়কে তিনি এড়িয়ে গেলেন দায়হীনের মতো।

রবীন্দ্রনাথের অন্ত-পর্বের গদ্য কবিতার, দীর্ঘ অথবা ক্ষুদ্র মিলিয়ে, নিবিড় বিশ্লেষণ ছাড়া আধুনিক

রবীন্দ্রনাথের পুরুষার্থ নির্ণয় ঠিক যতখানি অসম্ভব,
আধুনিক বাংলা-কবিতার প্রতিষ্ঠার বেদী গড়ে
তোলাটাও ঠিক ততখানি অসম্পূর্ণ থেকে যেতে
বাধ্য।
সরোজবাবু তাঁর বইয়ের শেষ প্রবন্ধ
'সান্ধ্যরবিচ্ছায়া'-র এক জায়গায় লিখেছেন
"যে-ভাষা এক হিসাবে তাঁর নিজেরই সৃষ্টি, সেই
ভাষায় সেই প্রকরণে যে বিংশ-শতাব্দীর জটিল
সাবালকত্বকে মূর্ত করা যাচ্ছে না, এ বিষয়ে ভুল
হোক সত্যি হোক একটা ধারণা তাঁর জন্মেছিল।
সেই সীমাবদ্ধতাকে অনুভব করেই তাঁর কাব্যের
ফর্মের ভাঙাচোরা শুরু হয়েছে।"
এই মন্তব্যের একটু পরেই তিনি উদ্ধৃত করেছেন
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই উক্তি
"বাক্যের সৃষ্টির উপরে আমার সংশয় জন্মে গেছে।"
এ সংশয়েরও রয়েছে এক বিশ্ব প্রেক্ষাপট।
একলা রবীন্দ্রনাথ নন, পৃথিবীর সেই সব কবি,
যাঁরা নিজের প্রয়োজনে বিশ্বকে অথবা বিশ্বের
প্রয়োজনে নিজেকে প্রথমে চান বুঝতে এবং পরে
ভাষার মাধ্যমে সেই অনুভব-উপলব্ধির শরীরে
আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করতে, তাঁরা সকলেই জীবনের
কোনো না কোনো পর্বে ভাষার সমস্যায় আক্রান্ত।
১৯০৮-এ 'নিউ পোয়েম' বা 'নতুন কবিতা'

শেষ করার পর প্রায় একটা গোটা যুগ রিলকের কলম রক্তহীন। পরের বই 'ডুয়িনো এলিজি'-র প্রথম দুটো লেখা ১৯১২-য়। তৃতীয়টা ১৯১২-১৩-য়। চতুর্থটা ১৯১৫-য়। তার পর মহাযুদ্ধ। বাকি এলিজিগুলো ১৯২২-এ। যে ডুয়িনো দুর্গে এলিজি-র শুরু, মহাযুদ্ধের পর সেখানে ফিরে যেতে পারেন নি আর। সে দুর্গ তখন মহাযুদ্ধের নির্দয় খাঁড়ার ঘায়ে ভেঙে-চুরে ধ্বংসাবশেষ। রিলকে তখন প্রত্যক্ষ করছিলেন অভিজাত ও মানবিক এক বিশ্বেরও ধ্বংসাবশেষ, মহাযুদ্ধ যাকে এক নিমেষে ঠেলে দিয়েছে অতীতকালের কোঠায়। কবিতার বদলে টুকরো টুকরো চিঠিতে কেবল বিলাপ, মহাবিশ্ব থেকে নির্বাসিতের বিলাপ যেন সে-সব।

"রিলকে যাতে বিশেষভাবে কষ্ট পেয়েছিলেন, যা তাঁর লেখাকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল, যা ১৯২০-র একটা চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি—তা বহির্বিশ্ব থেকে নির্বাসন, তিনি যাকে বলতেন 'খোলা জগৎ'—অর্থাৎ সেই অবাধ ও নির্দোষ জগৎ, সব মানুষ ও প্রাণীর যা স্বাধিকার তার সাময়িক অবলুপ্তি। এ কি সম্ভব যে তাঁর গতিবিধির আজ স্বাধীনতা নেই ? এ কি সম্ভব যে তাঁর প্রিয়তম দেশ দুটি আজ 'শত্রুপক্ষ' ? 'যুদ্ধের বছরগুলি ধরে

আমি ছিলাম…ম্যুনিখে অপেক্ষমান, সব সময় ভাবছি যে এর শেষ হ'তেই হবে, কিন্তু কিছুই বুঝিনি, কিছুই বুঝিনি ! কিছু না বোঝা : তা-ই ছিলো ঐ বছরগুলোতে আমার অনন্য কাজ— নিশ্চিত জেনো, সহজ কাজ নয়। আমার পক্ষে একমাত্র সম্ভবপর ছিলো খোলা জগৎ, অন্য কোনো জগৎ আমি জানতাম না ; কত না ঋণ আমার রাশিয়ার কাছে…কত না ঋণ প্যারিসের কাছে… ! আর অন্য সব দেশের কাছেও ! কিছু ফিরিয়ে নিতে আমি পারি না, পারতাম না—কোনো দিকে, মুহূর্তের জন্যও, আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না ঘৃণা বা প্রত্যাখ্যান।"

বুদ্ধদেব বসু

নিজেকে 'চিত্রকল্পের শিকারী' বলেন যিনি, তিনি ঐ যুদ্ধ-ক্ষত বিশ্বে কোথাও আর খুঁজে পান না আলোকিত হওয়ার চিত্র, আলোড়নকে চিত্রায়িত করার যোগ্য ভাষা। যখন পেলেন তখন Witolo Hulewicz-কে চিঠিতে জানাচ্ছেন তাঁর 'ডুয়িনো এলিজি' আর 'অর্ফিয়ুসের প্রতি সনেটগুচ্ছ' হল 'an attempt to discover what flower might grow amid the ruins of language.'

হ্যাঁ, ভাষারও ধ্বংস। কিন্তু শুধু কি ভাষারই ধ্বংস ?

ধ্বংস বুঝিবা ভাষা-ভাবনারও। কাফকা তাঁর বন্ধুকে লিখছেন—

"আমি যা লিখি তার থেকে আলাদা হয়ে যায়
আমি যা বলি, আমি যা বলি তার থেকে আলাদা
আমি যা ভাবি, আমি যা ভাবি তা আমার যা-ভাবা-উচিত-এর থেকে আলাদা, আর এইভাবে
তারা ক্রমাগত এগিয়ে যায় গভীরতর অন্ধকারের দিকে।"

ইয়েটস তাঁর 'দি নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী অ্যাণ্ড আফটার' কবিতায় জানালেন—

"যদিও ফিরে আসবে না আর মহান সব গীত
তবুও রয়েছে যেটুকু তাতেই আমাদের আহ্লাদ ;
তীরে তীরে নুড়িদের ঘর্ঘর
পিছু হটে যাওয়া ঢেউয়ের তলায় তলায়।"

ইয়েটস, এলিয়ট, পাউণ্ড, রিলকে সকলের কাছেই অতীত তখন রেখে গেছে অল্প কিছু নুড়ি-পাথর, অনন্তের অথবা চিরকালের প্রতীক হতে পারে যারা। সেইটুকুই যেন মহাসম্বল, সেটুকুও চলে গেলে সবটাই হতাশা, অবসাদ আর দুকুল-ভাসানো অন্ধকার।

'ভাষার ধ্বংসাবশেষ' থেকে চিরন্তন কিছু নুড়ি-পাথর কুড়িয়ে রিলকে যখন অবশেষে আবার পারলেন ডুয়িনো এলিজি শেষ করতে, তখন আগের চেয়ে

অনেক বদলে গেছে তাঁর ভাষাই নয় শুধু, শুধু
চিত্রকল্প নয়, কবিতার পংক্তিরও গড়ন।
"এলিজিগুচ্ছের দ্রুত-ধাবমান বিসর্পিত অমিত্রাক্ষর
যাতে আবেগের চাপে মাঝে মাঝে কথাগুলো যেন
কেটে যাচ্ছে, আর অনির্বচনীয়কে ভাষায় ধরার
চেষ্টায় দীর্ঘায়ত বাক্যগুলি যেন রুদ্ধশ্বাস ;.... ।
ভাস্কর্যোচিত কাঠিন্য ও ঘনত্ব—এ-ই ছিলো 'নতুন
কবিতা'র রীতিলক্ষণ ; কিন্তু 'ডুয়িনো এলিজি'তে
তার চিহ্ন আর দেখি না, ভাষা এখানে বেগান্বিত
ও প্রবহমাণ, গঠন শিল্পের নির্ভর এখানে
চিত্রকল্প নয় —বিতর্ক, বাদানুবাদ।"

বুদ্ধদেব বসু

আসলে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কবিতাকে যেন
বাধ্যতই হতে হল আরো বহু কিছুর কাছে দায়বদ্ধ।
ধ্বংসে খান্ খান্ হবে দেখে বাস্তবতার সম্পর্কে
আগের চেয়ে আরো বেশি মমতাময় হয়ে উঠলেন
কবিরা। আবার অতিরিক্ত মমতাই তাঁদের বানিয়ে
দিল বাস্তবতার কঠিনতম সমালোচক। কবিতা
হয়ে উঠছে 'growing traffic between
poetry and prose'। কবিতা থেকে সরে যাচ্ছে
বর্ণনার ধারাবাহিকতা। সমাজের বিচ্ছিন্নতা,
সময়ের অসঙ্গতিময় অগ্রগতি, ব্যক্তির খণ্ড
চৈতন্যকে মনে রেখেই যেন অনেকটা। অথবা

মহাযুদ্ধ যেভাবে একটা গোটা বাড়ির গা থেকে খুবলে নেয় এখান-ওখানের অংশবিশেষ, এমনকি একটা পুরো মানুষের বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কবিতা অনেকটা সেইভাবেই হয়ে উঠছে—'like heavily cut film, a selection of briefly held frames that threaten not to be sequential.'

আমাদের দেশেও একটু পরে ঐ একই আতুরতা, ভাষা নিয়ে। তিরিশের দশকে আমাদের দেশের কবি গদ্য ও পদ্যের মধ্যে স্বচ্ছন্দ যাতায়াতেই সন্তুষ্ট হতে পারেন না আর, চান সহাবস্থান। "এবং যতদিন না গদ্য ও পদ্যের পাশাপাশি থাকবার ব্যবস্থা বাংলা কবিতায় হচ্ছে, ততদিন সামাজিক জীবনের অলিগলিতে বাংলা কবিতার যাতায়াত রুদ্ধ।"

বিষ্ণু দে

আবার 'এলিঅট প্রসঙ্গে' নামের প্রবন্ধের গোড়াতেও বিষ্ণু দে-কে তুলতে দেখি ঐ একই প্রশ্নময় প্রসঙ্গ। "ধনতান্ত্রিক শিক্ষা প্রসারে নাট্যশালা ও সিনেমার অজ্ঞরুচি সম্পাদক সহ-সম্পাদক তথা বিজ্ঞাপনদাতাদের হাতে ভাষার অপব্যবহার প্রভৃতি কারণে ভাষা হয়েছে বাজারের ঘষা পয়সা, কথাগুলো হয় যেন শেওলা ধরা,

ধরলে পিছলে পড়ে যায়। কাব্যের আবেদনে তাই আজ কবিকে ও পাঠককে ভাবিত করার প্রয়োজন। এলিঅট-এর মতো সত্য কবিকে তাই বিশেষজ্ঞ কবি হতে হয়েছে। দোষটা পণ্য সভ্যতার, অমানুষিকতার, সংস্কৃতির যা বিরাট শত্রু।"

ভাষা-সমস্যা সমাধানে নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকে আরো শক্ত শিরদাঁড়া জোগাতেই তিনি শরণাপন্ন হন ফরাসী আরার্গঁ-র। সেই সুবাদে আরার্গঁ-র মুখ থেকে আমাদের শোনা হয়ে যায় "কাব্যের ইতিহাস তার টেকনিকের ইতিহাস।" শোনা হয়ে যায়—

"তাই বলি যে ভাষার গভীর চর্চা ছাড়া, প্রতিপদে ভাষার পুনর্নির্মাণ ছাড়া কাব্য অসম্ভব। তার জন্যে ভাষার নির্ধারিত সীমা, ব্যাকরণের নিয়ম, বাক্যের কানুন বারবার ভাঙতে হয়। কবিদের পক্ষে এইই তো মুক্তির পথে দীর্ঘ উত্তরণ।"

বাংলার ও বিশ্বের সাহিত্যে যখন ঘটে চলেছে এই সব ওলট-পালট, তখনো রবীন্দ্রনাথ যেহেতু অত্যন্ত সজাগরূপেই জীবিত সুতরাং এই ব্যাপ্ত পরিপ্রেক্ষিতেই রবীন্দ্রনাথের অন্ত-পর্বের গদ্য-কবিতার দিকে তাকিয়ে দেখার দরকার। আর সেভাবে দেখলে আমরা হয়তো বুঝতে

পারব কেন তিনি চেয়েছিলেন বিষ্ণু দে-র অনূদিত এলিঅটের 'জার্নি টু মেজাই' থেকে 'পদ্যের আবেশটাকে ঠেলা দিয়ে কাটিয়ে' দিতে, কেন নিজের প্রথমবারের অনুবাদকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে দ্বিতীয় অনুবাদ করেন আবার, প্রথমবারের 'শীত-রুক্ষ'কে দ্বিতীয়বারে করেন 'কনকনে ঠাণ্ডা', কিংবা 'পরিতৃপ্তি পেলাম'-কে বদলে 'ব্যাপারটা তৃপ্তি পাবার মতো বটে', হয়ত বুঝতে পারব কেন ইংরেজি 'শিশুতীর্থ'-কে সম্পূর্ণ করতে তাঁর লেগে যায় পাঁচটা খসড়া। বুঝতে পারব কেন তাঁর কোনো কোনো কবিতার পংক্তি হয়ে যায় গদ্যের মতো দীর্ঘ, আর রিলকে প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন বুদ্ধদেব সেইভাবেই তাঁর কবিতায় মাঝে মাঝে কথা যেন ফেটে যাচ্ছে আবেগের চাপে, তিনি কবিতায় টেনে আনছেন রুক্ষ, কর্কশ, কখনো বা বীভৎস রসের চিত্রকল্পই নয় শুধু, টেনে আনছেন গদ্যের বিতর্ক। আবার কোনো কোনো কবিতা যেমন মূলত প্রবন্ধ, তেমনি কেউ কেউ প্রধানত গল্প। কতটা সইতে পারে কবিতার শরীর, যেন তারই নিস্তারহীন পরীক্ষা। আর যত এগিয়ে চলেছিল তাঁর অন্তপর্বের কবিতা তাঁর জীবনের অন্তপর্বের দিকে, ততই তা হয়ে উঠছিল—'a selection of briefly

held frames that threaten not to be sequential—'

দ্বিতীয় সংস্করণে, আমরা আশা করব, সরোজবাবু নিশ্চয়ই পূর্ব-কথিত প্রবন্ধ দুটিকে সম্পূর্ণ করবেন রবীন্দ্রনাথের শেষতম কবিতার আলো-আঁধারকে ছুঁয়ে, ব্যাপ্ত পটভূমিকায়। সেই সঙ্গে এও আশা করব, বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে ছেপে-বেরনো এ-বইয়ের স্বতন্ত্র প্রবন্ধগুলোর মধ্যে একটা বিশেষ বক্তব্যের বা দৃষ্টিভঙ্গির ঐকতান গড়ে তোলার তাগিদেই তিনি পরিমার্জনা বা পরিশুদ্ধির প্রতি মনোযোগ দেবেন নিজের স্বার্থে, নিজের সিদ্ধির সমৃদ্ধকরণে। শেষ কথাটা বলতে হল সরোজবাবুর প্রতি শ্রদ্ধায় এবং একই সঙ্গে তাঁর অমনোযোগিতার প্রতি ক্ষমাহীন হয়ে উঠতে পারার মতো ভালোবাসায়। এ-আলোচনার সূচনায় যাঁকে সম্মানিত করেছি পরিশ্রমী হিসেবে, এখন তাঁকে অমনোযোগিতার দায়ে সমালোচনা-নামক আদালতে সোপর্দ করতে চাইলে বিস্মিত হবেন অনেকই। যেমন আমি নিজেও। কেননা প্রথম পাঠে আমারও মুগ্ধতা ছিল নিশ্ছিদ্র। কিন্তু দ্বিতীয়বারের পাঠেই চোখে বা মনে ঠোক্কর মারে কিছু বিসদৃশ্যতা। এমনকি কোনো সচেতন পাঠক যদি তাঁর অতি-

সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটুকু আগে পড়ে নিয়ে পরে বইয়ের ভিতরে ঢোকেন, বহুতল প্রাসাদ-ভ্রমণের ভঙ্গিতে ওঠা-নামা করেন দশটি প্রবন্ধের অভ্যন্তরে, চূড়ান্ত প্রদক্ষিণের পর, আমার ধারণা, তাঁর মনে হতে পারে লেখক যা বলেছেন ভূমিকায়, তার বিপরীতকে প্রমাণ করারই প্রাণপণ প্রয়াস যেন বাকি গোটা বইটিতে।

তিনি ভূমিকায় বলেছেন—

"হার্বার্ট রীড 'ফোর্স' 'ওরিজিন্যালিটি' দাবি করেছিলেন মেটাফোরের কাছে—মেটাফোর অর্থেও আমরা এখানে চিত্রকল্পকেই বুঝতে চাই। রবীন্দ্র-চিত্রকল্পে 'ফোর্স' ও 'ওরিজিন্যালিটি'-র অভাব আছে এমন নয়, কিন্তু এজন্য সে চিত্রকল্প বিখ্যাত নয়। রবীন্দ্র-চিত্রকল্পের প্রধান গুণ ন্যূনতম আন্দোলন ঘটিয়ে গোটা কবিতার রূপান্তর বা ট্রান্সফরমেসন। সুতরাং উপমান-বিস্ময় সৃষ্টি করা এ কবিতার স্বভাব নয়।"

প্রমাণ হিসেবে—

" 'বলাকা' কবিতাটির প্রথম স্তবকে সে উপমান-বিস্ময় নিশ্চয় আছে—কিন্তু দেখতে দেখতে ঐ কবিতাতেই আমরা পৌঁছে যাই কবিতার বিস্ময়ে যখন 'নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে/চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে'। এটাই রবীন্দ্র-

স্বভাবী চিত্রকল্প। একটি বা দুটি মৌমাছি বসন্তের বিপুল বনস্থলীর বার্তা বহে আনে—এখানে তেমনি একটি বা দুটি চিত্রকল্পের কারণে আমরা সমগ্র কবিতাটিকে বলতে পারি 'সহসা বেয়ে নিয়েছে তরী অপূর্বেরই কূলে'।"

যদি 'ফোর্স' এবং 'ওরিজিন্যালিটির'-র চেয়ে, উপমান-বিস্ময় উদ্ভাবনের ক্রমান্বয় দক্ষতার চেয়ে, শুধু একটি-দুটি চিত্রকল্পের নৈপুণ্যময় ব্যবহারে ন্যূনতম আন্দোলন ঘটিয়ে তিনি রূপান্তর ঘটাতে পারেন কবিতার, কবিতাকে পৌঁছে দিতে পারেন অপূর্বতার মূলে, তাহলে সে-জাতীয় কবিতাবলীর আলোচনাকে এ বইয়ে ঠাঁই না দিয়ে তিনি কেন বেছে নেন এমন-সব কবিতা যেখানে চিত্রকল্পকে গুনতে গেলে লেগে যায় দু হাতের সব কটা আঙুল, কখনো কখনো তার অনেকগুলো গাঁট। তাহলে কোন্ সত্য প্রমাণের গরজে তিনি তালিকা তৈরি করেন 'পূরবী'-তে কত অসংখ্যবার ব্যবহৃত হয়েছে কবির পক্ষপাতময় শূন্যতাবাচক শব্দ, শূন্যতাবোধের সমর্থনে নঙর্থক শব্দরাজি, বিশেষণ হিসেবে শূন্য শব্দের ব্যবহার। 'পুনশ্চ' এবং 'শেষসপ্তক'-এর আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কবিতায় চিত্রকল্পের আধিক্য, চিত্রকল্পের ব্যাপ্তি, কবিতার কেন্দ্রীয় ভাবের উপযোগী চিত্রকল্পের প্রয়োগ

ইত্যাদিতে ইতিপূর্বে মুগ্ধ, আকৃষ্ট এবং আপ্লুত হতে পেরেছেন বলেই তো তিনি জানিয়ে দেন তাঁর ক্ষোভ—

"কিন্তু আশ্চর্য 'লিপিকা' এবং 'পুনশ্চ' উভয়ক্ষেত্রেই কবির দুর্ভাবনার কোনো স্পর্শ নেই। ঐতিহাসিক কারণে এই শিল্প-নিরীক্ষা যত মূল্যবানই হোক, রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্পচারিতা 'পুনশ্চ'-এ, 'শেষসপ্তক'-এ স্তিমিত। প্রথম জীবনে নিজের ভাষার প্রেমে পড়েছিলেন কবি, শেষ জীবনে নিজের ছন্দের। পল্লবতা দুই ক্ষেত্রেই চিত্রলতার ক্ষতি করেছে।"

এ-মন্তব্যে কি গড়ে ওঠে না লেখকের একটা বিশেষ প্রত্যাশা? এবং তা থেকে কি প্রমাণিত হয় না এই সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তিনি মূলত যা খোঁজেন তা ন্যূনতম আন্দোলন নয়, চিত্রকল্পই। ন্যূনতম আন্দোলন ঘটিয়ে কবিতার রূপান্তর ঘটানোর ক্রিয়াপদ্ধতি 'লিপিকা' 'পুনশ্চ' আর 'শেষসপ্তক'-এ কি তাহলে পুরোপুরি অনুপস্থিত? যদি থাকে, তাহলে স্তিমিত কেন?

আবার অন্যভাবেও উঠতে পারে আর এক প্রশ্ন। যে বইয়ের প্রধান উদ্দেশ্য চিত্রকল্পের চরিত্র এবং মূল্যবিচার, চিত্রকল্পের বাস্তবতা

বিশ্লেষণ, চিত্রকল্পের সংখ্যা গণনা, চিত্রকল্পের ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিবর্তনের দিকনির্ণয়, এমনকি চিত্রকল্পের গুরুত্বেই কবিতার ভালো-মন্দের সার্থকতা-অসার্থকতার সিদ্ধান্ত, সেখানে ভূমিকায় 'বলাকা' থেকে উদ্ধৃত রবীন্দ্র-স্বভাবী ঐ উদাহরণ কি সত্যিই বিস্ময়কর নয়? আর এও কি সম্ভব যে, যে-কবি প্রধানত ন্যূনতম আন্দোলন ঘটিয়ে রূপান্তর ঘটান নিজের কবিতার এবং কবিতাকে টেনে নিয়ে যান অপূর্বতার কূলে, সেই ন্যূনতম আন্দোলন থেকে সংগ্রহ করা যাবে কবির ভিন্নতর এবং যথার্থ জীবনচরিতের পর্যাপ্ত উপকরণ?

তাঁর আরো কয়েকটি অসাবধানী মন্তব্যের দিকেও চোখ পড়তে পারে কোনো কোনো সচেতন পাঠকের। এ বইয়ের প্রথম প্রবন্ধে 'লিপিকা'-র প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন—" 'বলাকা' থেকে 'পূরবী'-'পরিশেষ'-এ কবিকল্পনার পূর্ণ পরিণত অবস্থায় ধীরে ধীরে যে টানাপোড়েন প্রভাব বিস্তার করছিল—কিছু তার ব্যক্তিগত, কিছু তার বিশ্বগত, এর প্রমাণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল 'পরিশেষ'-এর নানা ধরনের কবিতাগুলির মধ্যে। 'প্রশ্ন' যেমন বৃহত্তর জীবনের যন্ত্রণায় বলিষ্ঠ, 'আতঙ্ক' তেমনি ব্যক্তিগত শঙ্কায় পিঙ্গল।

এই নানা টানাপোড়েন থেকে কবি পৌঁচেছেন 'পুনশ্চ'-র গদ্য ছন্দের প্রবর্তনায়। হয়তো প্রচণ্ড দুর্ভাবনার দায় এড়ানোর জন্যেই তাঁর এই শিল্পলীলা, কেননা অনুরূপভাবে একদিন জন্মলাভ করেছিল 'লিপিকা'। কিন্তু আশ্চর্য 'লিপিকা' এবং 'পুনশ্চ' উভয় ক্ষেত্রেই কবির দুর্ভাবনার কোনো স্পর্শ নেই।"

এ বইয়ের শেষ প্রবন্ধে ঐ 'লিপিকা' প্রসঙ্গেই তাঁর আর-এক দফা বিশ্লেষণে উপরের মন্তব্যের প্রায় পুরোপুরি বিরুদ্ধাচরণ। যেন লেখা দুটো এক বইয়ের অন্তর্গত হলেও দুজন স্বতন্ত্র ব্যক্তির রচনা। এ বইয়ের শেষ রচনার নাম 'সান্ধ্যরবিচ্ছায়া'। 'লিপিকা'-র প্রসঙ্গ দিয়েই প্রবন্ধের সূচনা।'

" 'লিপিকা'-র 'একটি চাউনি' কবিতায় গানের সুর বলেছিল 'আমি রাজার প্রতাপকে স্পর্শ করিনে, ধনীর ঐশ্বর্যকেও না, কিন্তু ওই ছোট জিনিসগুলিই আমার চিরকালের ধন ; ওইগুলি দিয়েই আমি অসীমের গলার হার গাঁথি'। সমস্ত লিপিকা-তেই এই এক শিল্পাত্মা ক্রিয়াশীল। সে যদিও আকারে গদ্য কিন্তু মূলত সে এমনকি কবিতার চেয়ে গভীরভাষী হতে চায়।....লিপিকা-র বিষয় দূরে রেখেছে

জীবনের মহাকাব্যমন্দ্রিত রাজপথকে, এড়িয়ে গেছে আধুনিক সভ্যতার সাফল্যগর্বিত অহংকারকে— লিপিকায় প্রাধান্য পেয়েছে ধূলির ধন।...যা তথাকথিত বৃহতের দ্বারা সংস্পৃষ্ট নয়, নয় কোনো মহত্ত্বের অভিমানে তরঙ্গিত, সেই সব সামান্যের মোড়কে বন্দী অসামান্যকে আবিষ্কার করাই লিপিকার উদ্দেশ্য। বেশ কিছু সংখ্যক কবিতা আছে এই বইয়ে, যেখানে ফুটে উঠেছে প্রাসাদবিরোধী মনোভাব। আরো বেশি হচ্ছে সেই সব কবিতা যেখানে ধনের বিবর্ণতা ও ঐশ্বর্যের বদ্ধতার বিকারকে অঙ্গুলিনির্দেশ না করেও অভিযুক্ত করা হয়েছে। কমপক্ষে একটি কবিতায় গল্পের ছলে হলেও প্রাচুর্য-তোষিত যন্ত্রকল্পতরু য়ুরোপীয় সমাজের বিচ্ছিন্নতাবোধকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে।...নিরুদ্বিগ্ন জীবনের শেষ সংকট এইখানে যে তা হয়ে পড়ে লক্ষ্যহীন। অভ্যাসের ছকে বাঁধা জীবনে বাঁচার আনন্দ থাকে না। কৃত্রিম আলো আলেয়ার মতোই জ্বলে বটে, কিন্তু আলোকিত করে না।
লিপিকাতেই এসব কথা জ্বলে উঠেছে দীপের মতো।”

এর পরেই লিপিকা-র সুরের ও স্বরের বৈশিষ্ট্য,

লিপিকার আঙ্গিকরীতির আলোচনা।
লিপিকার 'প্রশ্ন' কবিতার দুঃসহ মিতবাক্
তীব্রতা, যাকে তিনি মনে করেন 'রবীন্দ্র কাব্যে
নোতুন ব্যাপার'।
এই সব কিছুকে মিলিয়ে লিপিকা হয়ে ওঠে যা,
তাকে কি মেলাতে পারি তাঁর প্রথম প্রবন্ধের
সিদ্ধান্তের সঙ্গে ?
দুর্ভাবনার দায় এড়ানোর তাগিদে যার জন্ম, সেও
কি হতে পারে এতখানি বহুগুণান্বিত ? ঐ 'প্রশ্ন'
কবিতার প্রসঙ্গেই তিনি যখন আবার বলেন—
"অস্তিত্বের রহস্যময় নিষ্ঠুরতা ও একটি বালককে
পরস্পরের প্রতিমুখে স্থাপিত করে কবি এই
কবিতায় যে অনুভূতি ফুটিয়ে তুলেছেন তা
ইতিপূর্বে তাঁর কবিতায় আমরা পাইনি।"
তখন কি 'চিত্রলতাহীন পল্লবতার' অভিযোগটা
হয়ে দাঁড়ায় না নিতান্তই ঠুনকো।
শেষ প্রবন্ধে 'লিপিকা'-কে এত ভালো লাগে
তাঁর যে, তিনি এর মধ্যে পেয়ে যান রবীন্দ্রনাথের
পরবর্তীকালের ছবির পূর্বাভাসও। 'লিপিকা'-য়
বর্ণের বিরলতায় ব্যঞ্জনার প্রগাঢ়তা সঞ্চার,
অপর দিকে ভাবাতিশয্যকে নির্মম বর্জনে
তথাকথিত মনোহারিতাকে বিদায়'-এর তাৎপর্যে
এবং 'দিগন্তের মুখ বিবর্ণ ; গাছের পাতাগুলো

শুকনো হলদে, হতাশ্বাস' জাতীয় চিত্রকল্পের মধ্যে তিনি পেয়ে যান ঐ সিদ্ধান্তের সমর্থন। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁর এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার সূচনাকালের হিসেব দেন ১৯২০ থেকে ১৯৩০। বিনোদবাবুর মতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার নতুন যুগ আর তাঁর ছবি-আঁকার কাল সমান্তরাল। ঐ সময়ে তাঁর মনের গতি ছিল অর্থের চেয়ে ভঙ্গির দিকে, ভাবের চেয়ে রূপের দিকে, গতির চেয়ে স্থিতির দিকে। এর পক্ষে বড় প্রমাণ, পুরনো নাটকের সংশোধন। ১৯৩০-এ থেকে তাঁর ছবি পৌঁছে যায় বিবর্তনের শেষ সীমায়। ১৯৩২-এ 'পুনশ্চ', তাঁর প্রথম গদ্য কাব্য। এই সময় থেকে রবীন্দ্রনাথ মুখ ফেরান ভঙ্গিকে ছেড়ে ভাবের দিকে। এই বৈপরীত্যের দৃষ্টান্তে তিনি জানান—"আশ্চর্য এই যে, যে-সময়ে তাঁর চিত্র অলঙ্কারে ভূষিত হতে চলেছে, সে-সময়ে তাঁর কাব্য নিরলঙ্কার হয়ে আসছে।"

ঐ প্রবন্ধের উপসংহারে আরো, নতুন অনুভব। সাহিত্যে যখন তিনি বস্তুর দিকে, ছবি অতীত স্মৃতির দিকে। ছবি থেকে পাওয়া নতুন সত্য একদিন ঢেলে দিয়েছেন কবিতায়, পরে কবিতায় যতই সম্পূর্ণতা পেয়েছে সে সত্য, ছবির ক্ষেত্রে

কমে এসেছে নতুন বিবর্তন বা অনুসন্ধান। ছবি হয়ে উঠেছে অবসর বিনোদের সঙ্গী।

"প্রথম জীবনের কাব্যে যেমন বাক্যালঙ্কার সকল অভাব পূরণ করেছে, এবং সকল দুর্বলতা ঢেকেছে, শেষ জীবনের ছবিতে বর্ণের স্থান সেই রকম।"

এ থেকে আমরা ধারণা করে নিতে পারি যে তাঁর ছবির ক্রম-বিকাশে তাঁর কবিতার ভূমিকা ফার্টিলাইজারের নয়। তাছাড়া স্বভাবতই অন্য একটা প্রশ্নও ঝাঁকুনি দেয় এখানে, তাঁর ছবির বেলায় কবিতার প্রশ্নই বা ওঠে কেন শুধু? রবীন্দ্রনাথ কি শুধুই কবি? বলাকা, পূরবী, পুনশ্চ-তেই শুধু বদলাচ্ছেন তিনি? আর তাঁর গদ্য বসে আছে এক ঠাঁই চিরস্থির? কেন ভাবব যে কবিতার রবীন্দ্রনাথই চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের প্রেরণাদাতা ও পৃষ্ঠপোষক। কেন ভাবব না যে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের জনক সমগ্র রবীন্দ্রনাথ, যাঁর সৃষ্টির বৃহত্তম অংশটাই গদ্যের রবীন্দ্রনাথের দখলে।

এই প্রসঙ্গে, আমাদের মনে রাখা ভালো যে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীতে 'লিপিকা' কবিতা নয়, গদ্য। শুধু গদ্য নয়, গল্প। যে ষড়বিংশ খণ্ডে তার ঠাঁই সেখানে

গোত্রবিচারে সে উপন্যাস-গল্পের সারিতে,
'সে' আর 'গল্পসল্প'-র গায়ে গা লাগিয়ে। আসলে
যখন তিনি হাতে তুলে নিয়েছেন আঁকিবুকির
কলম, আমাদের স্বভাব, তার অব্যবহিত আগের
রচনাকেই ঐ আঁকার প্রেরণা হিসেবে বেছে
নেওয়া। অথচ আমরা জানি ছবির কথা,
সরাসরি ছবি আঁকার কথা, তাঁর চিঠিপত্রে,
আদিপর্বের নানান বইয়ের ভূমিকায়, কবে
থেকে অনর্গল বলে আসছেন তিনি, ভাবছেন,
অন্যকে ভাবাতে চাইছেন। তাঁর সমগ্র চিঠিপত্র
থেকে, নিজে ছবি আঁকার হাত লাগানোর
আগে পর্যন্ত, ছবি নিয়ে যা বলেছেন, তার
সংকলন করলে চেহারা পেয়ে যাবে একটা
বড় মাপের বইয়ের। এ রকম ক্ষেত্রে হিসেব
কষে ছবি আঁকার পূর্বাভাসের দিন-ক্ষণ বা জন্ম-
লগন নির্বাচন সম্ভব কতখানির চেয়ে প্রশ্ন জাগায়,
সঙ্গত কতখানি। আর যদি এমন হয় যে কবিতা
থেকে পাওয়া চিত্রকল্পই, যেমন 'লিপিকা'র
'দিগন্তের মুখ বিবর্ণ-ইত্যাদি', হয়ে দাঁড়ায়
অনুমানের একান্ত নির্ভর, তাহলে তো তোলা
যায় পাল্টা প্রশ্ন, ঐ জাতীয় চিত্রকল্প কি আগে
পড়ি নি কখনো তাঁর গদ্যে অর্থাৎ গদ্যে লেখেন
নি কখনো তিনি? যদি লেখেন তাহলে কি প্রমাণ

হবে ? রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাই যে আগে গদ্য, পরে রূপান্তরে কবিতা, সে তথ্যটাও যদি মনে পড়ে যায় এই প্রসঙ্গে ? লিপিকার সমসাময়িক বা এক-আধ বছর আগের দুটো গদ্য রচনা, 'মুক্তধারা' আর জাপান-যাত্রী', তদন্তের জন্যে বেছে নিলেই আমরা দেখতে পাব তাঁর ছবির পূর্বাভাসের লগ্ন পিছিয়ে গেছে কতটা।

১। ওটাকে অসুরের মাথার মতন দেখাচ্ছে, মাংস নেই, চোয়াল ঝোলা।

২। গৌরীশিখরের উপর সূর্যাস্তের মূর্তি। কোন্ আগুনের পাখি মেঘের ডানা মেলে রাত্রির দিকে উড়ে চলেছে।

৩। যেন একটা মস্ত লোহার ফড়িং, আকাশে লাফ্ মারতে যাচ্ছে।

'মুক্তধারা' থেকে এই কটি আর 'জাপান যাত্রী' থেকে

১। দুর্গমাতার একটা প্রকাণ্ড মূর্তি চোখে দেখতে পাচ্ছি।

২। এক একটা পাহাড়...যেন দানব লোকের প্রকাণ্ড জন্তু...।

৩। জল থেকে একটা বাষ্পরেখা সাপের মতো ফোঁস করে উঠল।

এই কটি উদাহরণই আমার বক্তব্যের পক্ষে যথেষ্ট। 'চতুরঙ্গ' ইত্যাদির দিকে পিছিয়ে গেলাম না আর।

সন্তোজবাবুর আরও একটা মন্তব্যে, রবীন্দ্রনাথের ছবির বিষয়েই, ঈষৎ বিভ্রান্ত। এটা কি সত্যি রবীন্দ্রনাথের ছবির অন্যতম একটা গুণ তার 'বর্ণের বিরলতা', যা তিনি জানিয়েছেন লিপিকা বনাম ছবি-আঁকার পূর্বাভাস প্রসঙ্গে ? নাকি এর উল্টোটাই সত্যি ? অর্থাৎ উজ্জ্বলতম বর্ণের বিস্ময়কর ও প্রথাবিরুদ্ধ প্রয়োগকুশলতা ?

বর্ণোজ্জ্বলতাই তাঁর ছবির প্রধান গুণ। ছবি আঁকার বেলার তাঁর প্রধান শ্লোগান 'জোরালো রঙ'। বর্ণের অলৌকিকত্বই বরং তাঁর ভাবনার রহস্য এবং কল্পনার অগ্নিতাপের সবচেয়ে বড় সহায়ক। ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ যে কাকার ছবি সম্বন্ধে ব্যবহার করিয়াছিলেন আগ্নেয়গিরির উপমা, সেটা শুধু ইরাপসন অর্থাৎ ছবির সংখ্যাকে মনে রেখে নয়, সমগ্র চিত্ররচনার মধ্যে থেকে বিচ্ছুরিত রক্তিমাভাকে মনে রেখেও।

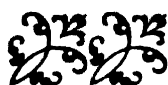
রবীন্দ্রনাথের ছবির বর্ণ-সম্ভার, বর্ণ-বৈচিত্র্য, বর্ণ-নির্মাণের উপকরণ ইত্যাদি নিয়ে লেখা

হয়েছে অনেক কম। তার চেয়েও কম আমাদের চোখে-দেখার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, আর এ-বই সে-বইয়ে যে-সব প্রিন্ট দেখতে আমরা অভ্যস্ত, সেগুলো কদাচিৎ আসল ছবির সার্থক প্রতিরূপ। আসল ছবিতে বর্ণ-ব্যবহারের যে সযত্ন-স্বেচ্ছাচার, সে মাধুর্যকে পুরোপুরি ফিরিয়ে দেওয়ার মতো বুকের পাটাওয়ালা ছাপাখানা ভারতবর্ষে বিরল, বিশ্বেও অগণিত নয়।

এ পর্যন্ত পড়ে কোনো কোনো পাঠকের মনে হতে পারে যেন আস্তিন গুটিয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জবর লড়াই জমিয়ে তোলাই এ-সমালোচনার আসল অভিপ্রায়। তাহলে তর্কের খাতিরে পাঠকের সে ভুল ধারণাকে স্বীকার করে নিয়েই মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে, শত্রুরূপে শ্রেয়-আরাধনাটাও আমাদের দেশে শাস্ত্রসম্মত। যদি এই মুহূর্তে ঐ উপমার ব্যবহার হাল্‌কা রসিকতার চালেই। রেশনের চাল কাঁড়া-আকাঁড়া জানি বলেই তার গণনাতীত কাঁকরে অভ্যস্ত হয়ে যায় দাঁতের পাটি এবং মনের বিরক্তি! কিন্তু চড়া দামে কেনা নির্ভরযোগ্য গোপালভোগ বা বাসমতীর ভিতরের এক-কণা কাঁকরেই মনের ঝাঁঝ মুখর হয়ে ওঠে মুখে। এ-সমালোচনা অনেকটা সেই ধাঁচের। আলোচ্য

বইয়ের একাধিক রচনা আমাদের ভাবনার স্তরে নানা নতুন বোধের বীজ বপন করে যায় বলেই ঈষৎ-অসামঞ্জস্যে এতখানি বিতর্ক।

যে-পাঠক এখনো পড়েন নি, তাঁর জেনে রাখা ভালো যে, এ-বইটি আমি তৃতীয়বার পড়ব এবং তারও পরও।



রবীন্দ্রনাথ, না রবীন্দ্রনাথ

দান্তের মৃত্যুর ৫৬ বছর পরে ফ্লোরেন্স, দান্তেকে নয় ততখানি, দান্তের দেহাবশেষকে সম্মানিত করার দায় অনুভব করে রাভেন্নাকে, তাঁর শেষ নিশ্বাস যেখানে, অনুরোধ জানিয়েছিল দেহাবশেষ ফিরিয়ে দিতে। রাভেন্না রাজি হয় নি স্বভাবতই। উইল ডুরাণ্ট অবশ্য তাঁর 'দান্তে' পরিচয়ে দেহাবশেষ বলেন নি। বলেছেল ভস্মশেষ বা ছাই। তাঁর ছাই, যাঁকে পুড়িয়ে মেরেছিল ফ্লোরেন্স, তাঁর স্বদেশ। এখনো ৫৬ বছর পার হয়নি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর। মোটে ৪৪। ৫৬-য় কী ঘটবে জানি না। তবে মৃত্যুর ৪৪ বছর পরেও, অবিকল জীবিত কালের মতোই, রবীন্দ্রনাথ এখনো এক বিতর্কিত চরিত্র অথবা বিষয়। অবশ্য অনেকটা নিয়তি-নির্ধারিতরূপেই, মহৎ স্রষ্টারা বিতর্কিত থেকেও যান আজীবন,

এমনকি মৃত্যুর পরেও অনেকদিন। আবার উল্টোদিক থেকে এই পুনর্জীবিত হয়ে ওঠাটাও যেন মহৎ স্রষ্টাদের চিনে নেওয়ার একটা সহজ মাপকাঠি। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে আর যে তিন বিশ্বকবি, তাঁদের মধ্যে ভলটেয়ারের ভাষায় দান্তে একজন উন্মাদ আর তাঁর সৃষ্টি পাশবিক, আলেকজাণ্ডার পোপের ভাষায় শেক্সপীয়র একজন পেট চালিয়ে-যাওয়ার তাগিদে তৈরি লেখক, আর একদা-বন্ধু হার্ডারের ভাষায় গ্যেটের রচনা 'সামহোয়াইট লাইট অ্যাণ্ড স্প্যারোলাইক'। পৃথিবীর যে-সব দেশে অমাবস্যা-পূর্ণিমা-প্রতিপদের নিয়ম না মেনে বুদ্ধির চর্চা ক্রমাগতই শুক্লপক্ষের পক্ষপাতী, সে-সব দেশে মহৎ স্রষ্টাদের পুনর্নির্মানের কাজ চলে বিরতিহীন। চলে বলেই সমসাময়িক কালে যিনি থাকেন রক্তকরবীর রাজার মতো বোঝা না-বোঝার জটিল আড়ালে, পরবর্তী-কালের শ্রমসাধ্য গবেষণা এবং নিবিষ্ট অনুশীলন চিনিয়ে দেয় তাঁকে, তাঁর সৃষ্টির অভ্যন্তর-ভেদী চিরন্তনতাকে, নিয়ত নতুন নতুন আলোর প্রক্ষেপণে। কীভাবে এই পুনর্নির্মাণ ঘটে তার খানিকটা আভাস, বা তার এক বিশ্বাসযোগ্য দৃষ্টান্ত আমরা বিষ্ণু দে-র এক রচনায় এই ভাবে

পড়েছি যে, বেলেনস্কির সময়ে যে মহাকবি ছিলেন অর্ধেক জাতীয় কবি, 'দেশের মানুষের সামগ্রিকতায় জাতির অখণ্ডতায়' রুশ দেশের সেই পুশকিন পরবর্তীকালে হয়ে উঠলেন পরিপূর্ণ জাতীয় কবি। এখানে জাতির অখণ্ডতা এবং মানুষের সমগ্রতার মধ্যে, অনুচ্চারিত থাকলেও, আমরা পড়ে নিতে পারি যে পুশকিনের এই উত্তরণের পিছনে আসলে যা কাজ করেছে তা বোধের, অনুভবের, উপলব্ধির আর বুদ্ধির চর্চার দিগ-দিগন্ত-জোড়া বিকাশ, বিকাশের পক্ষে সহায়ক-সমর্থক আলো-বাতাস।

আমাদের দেশে, দুর্ভাগ্যবশতই, ঘটে গেল বা যাচ্ছে এর উল্টোটাই। আমাদের দেশে, বিশেষ করে এই অর্ধেক বাংলায়, অর্থাৎ স্বাধীনতা-উত্তর এই পশ্চিমবঙ্গে আজ বুদ্ধি-চর্চার শুভবুদ্ধি অধিকাংশের কাছেই ক্রম-পরিত্যক্ত। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর থেকেই অনেকটা যেন এর সূচনা-সংকেতের শুরু। স্বাধীনতাই কি তাহলে হয়ে উঠল গোটা ভারতবর্ষের বেলায় মানুষের সামগ্রিকতার এবং জাতি হিসেবে অখণ্ডতার ক্রমমহিমায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রতিবন্ধক? অল্প রক্তপাত, আর

অধিকতর অঙ্গচ্ছেদে অর্জিত বলেই কি
অসময়ের স্বাধীনতা তার অন্তর্গত বিক্ষোভে
আমাদের বোধের জগতের সদর দরজা
ভেজিয়ে ক্রমাগত খুলে দিয়ে
চলেছে খিড়কি দরজা ? নানান মাপের,
নানান ছাঁদের ? নানান চোরা-কুঠরি আমাদের
চৈতন্যে ? নানান গোপন এবং প্রকাশ্য গহ্বর
আমাদের চেতনা বিকাশের সড়কে সড়কে ?
আমরা তাই বিষণ্ণ বিস্ময়ে দেখে যাই, অনেকটা
পারকিনসনের থিয়োরি অনুযায়ী, বুদ্ধি-চর্চার
মাধ্যম বাড়ছে যত, বুদ্ধি-চর্চার গভীরতর দায়
ততই গড়িয়ে চলেছে মানের নিম্নতায়।
সংবাদপত্র বাড়ে সংখ্যায়, লেখার মান কমে।
প্রকাশনা বাড়ে, বইয়ের মান কমে। রেডিও-
টিভির প্রভাব-প্রতিষ্ঠা বাড়ে, অনুষ্ঠানসূচির
গায়ে লেগে থাকে না-মাজা বাসনের এঁটো
কাঁটা এবং দুর্গন্ধ। সেমিনার বাড়ে, কিন্তু
সেখানে চর্বিতচর্বণেরই প্রধান্য। সমালোচনা বাড়ে
কিন্তু সে শুধুই প্রথাগত অক্ষর বিন্যাস, জলহীন
কলসীর মতো ফাঁপাই থেকে যায় অধিকাংশের
অভ্যন্তর। নতুন ম্যাগাজিন বাড়ে কিন্তু পুরনো
কাসুন্দি মরে না। কবিতা-সন্ধ্যা বাড়ে,
কবিতার অন্তঃসার দীর্ঘ ছায়া ছড়ায় না

কোনোখানে। আজ তাই, আমাদের দেশে, বিশেষ করে আমাদের এই পশ্চিমবাংলায়, বুদ্ধিজীবির তালিকা দীর্ঘ হয়েছে যত, বুদ্ধিজীবীর স্মরণীয় অবদান সংখ্যালঘু হয়েছে ততই। আর সংবাদপত্রের দৌলতে বুদ্ধিজীবীর পাশপোর্ট পাওয়াটাও আজ চমকপ্রদরূপে সহজ। বুদ্ধিজীবী উপাধি অর্জনের জন্যে এখনকার একশ্রেণীর লেখক সমাজ দেশ-কাল, অতীত-বর্তমান, সাহিত্য-সংস্কৃতির নদী-মহানদী নিয়ে মস্তিষ্কের ব্যায়ামে ব্যস্ত হওয়ার অবধারিত দায় থেকে অব্যাহতিও পেয়ে গেছেন যেন কোনো এক অদৃশ্য উচ্চ-আদালতের রায়ে, অথবা উচ্চক্ষমতা-সম্পন্ন নানা প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতায়। এই রকম ফোলা-ফাঁপা ডামাডোলের মাঝখানে আজকের আমরা আর আমাদের রবীন্দ্রনাথ। অথচ কখনোই বলা যাবে না রবীন্দ্রনাথকে আমরা ভুলে গেছি। বলা যাবে না আমাদের দেশের তরুণেরা রবীন্দ্র-বিমুখ। বলা যাবে না আমাদের দেশের লেখক রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে অনাগ্রহী বা অসচেতন। ২৫ বৈশাখে জোড়াসাঁকো এবং রবীন্দ্রসদনের রুদ্ধশ্বাস ভিড়, ২৫ বৈশাখ উপলক্ষে অজস্র লিটন ম্যাগাজিনের উৎসব-গন্ধী আত্মপ্রকাশ,

রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে নানা প্রকাশনালয় থেকে নিয়ত প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত বই, টিভি-রেডিও-য় এক পক্ষব্যাপী কবি-বন্দনার হরেক রকম, এক পক্ষ জুড়ে কলকাতার সমস্ত পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে রবীন্দ্রনাথ অবলম্বনে গান-নাচ বাজনা বাত্তির মহোৎসব বরং কোনো বিদেশি পথিককে এই রকম অভ্রান্ত বিশ্বাসে পৌঁছে দিতে পারে যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে রবীন্দ্রনাথ বুঝি বা স্নানের জল, আহার্যের ফল, সৌন্দর্য-রচনার ফুল, ভ্রমণের সুবাতাস এবং আলোকিত হওয়ার অন্তরীক্ষ।

অথচ, বছরের ৩৬৫ থেকে ঐ মুখরিত ১৫ দিন সরিয়ে নিলে যা থাকে, কিছু সুস্থ ও সচেতন আলোর ঝলকানিকে বাদ দিলে, তা রেমব্রান্টের আঁধারের মতোই ভরাট। সংক্ষেপে এখনকার রবীন্দ্রচর্চার একটা খশড়া ছবি আঁকতে চাইলে তার চেহারা দাঁড়াবে এই রকম—

১। লেখক হিশেবে যাঁরা অক্ষম, তাঁরা তাঁকে ভুলে যেতে পারলেই বাঁচেন যেন স্বস্তির নিশ্বাসে। আসলে তাঁদের এই সচেতন রবীন্দ্র বিস্মরণকে চিহ্নিত করা উচিত একটা প্রতীকতা হিশেবেই। যদি এমন হত যে শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথেই তাঁরা খুঁজে পাচ্ছেন না নিজেদের প্রাণিত হওয়ার

যোগ্য উপকরণ, আগ্রহী পাঠক হতে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে আসছেন বারবার, তাহলে এর একটা বিপরীত দৃশ্যও চোখে পড়ত আমাদের। দেখতে পেতাম রবীন্দ্রপরবর্তী অন্য সব প্রতিভার কাছে তাঁরা শিক্ষার্থী। কিন্তু বাজারে খ্যাতিমান তরুণ লেখকদের দশ-পনেরো বছরের গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ পড়ে কি সত্যিই আমাদের অনুভব করতে পারি যে এঁরা ভুল করেও কখনো তারাশঙ্কর-মানিক-বিভূতিভূষণ-সতীনাথ-ধূর্জটীপ্রসাদ, কমলকুমার, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখদের কাছ থেকে দীক্ষাসূত্রে উপার্জন করেছেন কিছু? রবীন্দ্রনাথ ভাল-না-লাগার পাশাপাশি তাঁরা কি কখনো স্বদেশের এবং বিদেশের সাহিত্য থেকে দৃষ্টান্ত তুলে ধবেছেন যে রবীন্দ্রনাথের পরিবর্তে তাঁদের এখন ভাল লাগে এই সব লেখকের আধুনিকতা অথবা এই জাতীয় মননের মন্থন? বলেন নি। কারণ বলে ফেলাটা বিষম ঝুঁকির। তাতে জনপ্রিয়তার নগদ পুরস্কারে লাগতে পারে ভাঁটার টান। তাছাড়া মহত্ত্বের অনুশীলন বড় শ্রমসাধ্য। অচিরিতার্থতার যন্ত্রণায় নিয়তই তা ভারি করে রাখে চেতনা-স্তর। এই রকম পরিস্থিতিতে জীবনানন্দের সেই বহু উচ্চারিত পংক্তির অনুকরণে

'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে চেতনা জাগাতে ভালোবাসে'-ই সবচেয়ে নিরাপদ আদর্শ।

২। লেখকের পরীক্ষা না দিয়ে যাঁরা সমালোচক, তাঁরা 'অ্যানাটমি অফ মার্ডার' নামের চলচ্চিত্রের টাইটেলের মতো ডান থেকে বাঁয়ে, বাঁ থেকে ডাইনে, এক দীর্ণ অবয়বের ছিন্ন টুকরো নিয়ে চালাচালির মতোই মেতে থাকতে বেশি পছন্দ করেন সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথের চেয়ে সমগ্রতা থেকে বিচ্ছিন্ন তাঁর আলগা অস্থি-মজ্জায়। এর বাইরে যা, তাকেও দুভাগ করা যায় আবার। একটা ঘরানা অ্যাকাডেমিক। আর একটা ঘরানা আধুনিকতার প্রজ্ঞায় উদ্দীপ্ত। প্রথম ঘরানার বুদ্ধিজীবীরা, হয়ত এদেশের নিরবচ্ছিন্ন পূজো-পার্বনকে মনে রেখেই শুধুমাত্র স্বদেশ সীমায় আটকানো এক রবীন্দ্রনাথের এক অসম্পূর্ণ মূর্তি নির্মাণেই মনোযোগী। সে-রবীন্দ্রনাথেব পিছনে প্রায়শই টাঙানো থাকে এক দিব্য আভার চলচ্চিত্র। দ্বিতীয় ঘরানার বুদ্ধিজীবীরা সংখ্যালঘু। স্বদেশ ছাড়িয়ে বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিকায় যেমন তাঁরা মিলিয়ে দেখাতে চান রবীন্দ্রনাথকে, তেমনি কবি রবীন্দ্রনাথকে বা নাট্যকার কি ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথকে আলাদা আলাদা করে না দেখে তাঁকে মেলাতে চান তাঁরই

সৃষ্টি-সমগ্রতায়। তাঁরা রবীন্দ্রনাথে খুঁজে বেড়ান
সেই সারাংশ, যা ব্যক্তি এবং জাতি হিশেবে
আমাদের আজকের এবং আগামীকালের
আত্মপ্রতিকৃতি নির্মাণে হয়ে উঠতে পারে
অপরিহার্য উপকরণ।

এসবের বাইরেও যে আর কিছু থাকে না তা নয়।
এসবের বাইরেও আর যা থাকে তা অনেকটা
অবোধের উৎসব, অনভিজ্ঞের উন্মাদনা, অথবা
উল্টোভাবে নাস্তিকের দায়ে-পড়ে বা দাঁও বুঝে
ঈশ্বর-ভজনার মতো ভুল সুরের স্তবগান।

তাই দু রকম দৃশ্যেরই প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে রইলাম
আমরা। যে-পত্রিকা রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীলতার
অন্যতম প্রধান প্রচারক হিশেবে খ্যাত, সেখানে
রবীন্দ্রনাথের গায়ে গা লাগিয়ে থাকছে এমন
সাহিত্য, অথবা এমন সাংবাদিকতা, অথবা আরো
সঠিকভাবে, এমন সাংবাদিকতা-লালিত সাহিত্য,
যার কালো ধোঁয়া জমতে জমতে, আজ না হলেও
কাল, ভূপালের বিষাক্ত গ্যাস বিস্ফোরণের
মতোই একটা জাতির তাকিয়ে-দেখার চোখকে
করতে পারে আক্রান্ত আব তার মেরুদণ্ডে ঘনিয়ে
তুলতে পারে সংক্রামক অবক্ষয়।

আবার যে-সব লিটল ম্যাগাজিন তার আপন
স্বভাবেই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে উদাসীন, হয়ত

বা বীতশ্রদ্ধও কিছুটা, তারাও ২৫ বৈশাখের লগ্নে, অনেকটা 'রিচ্যুয়াল' পালনের ভঙ্গিতে কখনো নিজেরা লিখে, কখনো বা, এবং প্রধানতই, নানাজনের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে, এমন এক রবীন্দ্রনাথকে আমাদের সামনে তুলে আনতে চান যা শেষ পর্যন্ত খবরের কাগজের আচার চাটনিরই রকমফের।

২

এই রকম ধোঁয়াটে সময়ে আমাদের সত্যিই বিস্মিত করে তরুণতর সংস্কৃতিকর্মীদের ব্যবহার। এক সময়ে পঞ্চাশের দশকের এক বিশিষ্ট কবি-গোষ্ঠি জানিয়ে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে তাঁদের অরুচি-সমাচার। অর্থাৎ আর প্রয়োজন নেই তাঁদের রবীন্দ্রনাথে। কেন প্রয়োজন নেই, কোন রবীন্দ্রনাথে নেই, তাহলে তাঁদের না-রবীন্দ্রনাথের মূর্তিটাই বা কেমন, সেসব কিন্তু স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি কখনো তাঁদের এলোমেলো মন্তব্যে। তখন তাঁরা ছিলেন প্রতিষ্ঠান-বিরোধী। পরবর্তীকালে তাঁরা যখন হয়ে উঠলেন প্রতিষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তখনও কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁদের কলম থেকে উৎসারিত হল না এমন কিছু

যা থেকে বুঝে নিতে পারি তাঁদের অপরিবর্তিত
মনোভঙ্গির আরো পরিণত যুক্তি-পরম্পরা।
যদি বা খুচরো কথাবার্তা বলেছেন কেউ কেউ,
তাতে রবীন্দ্রনাথের অসম্পূর্ণতার চেয়ে অনেক
বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে বরং তাঁদেরই সাহিত্য-
ভাবনার সংকীর্ণ দিগন্ত, যা জারিত নয় মননের
এবং অধ্যয়নের প্রসারে।
ষাট এবং সত্তর পেরিয়ে, এখন দেখা যাচ্ছে,
পঞ্চাশ থেকে পাওয়া ঐ শিকড়হীন, শ্যাওলার
মতো ইতস্তত, আলগা বাচন-ভঙ্গিটাই হয়ে
উঠেছে আশির তরুণদের কাছে মাথা পেতে
নেওয়ার মনোরম মডেল। এখানকার তরুণরাও
রবীন্দ্রনাথ নিয়ে এমন কিছু বলে না, যা থেকে
আমরা পেয়ে যেতে পারি একটা নতুন যুগের
দৃষ্টিকোণ। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কাছে এমন
একজন বিস্ময়কর স্রষ্টা নন যে, তাঁর প্রসঙ্গে উঠতে
পারে রাত-জাগা অধ্যয়নের দায়-দায়িত্ব।
অথচ এমনও নয় যে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কাছে
ম্যাপের বইয়ে হঠাৎ চোখে-পড়া কোনো অজ্ঞাত-
পরিচয় দ্বীপ বা অন্তরীপ। ফলে এঁদের রচনায়
মাঝে মাঝেই উড়ো-জোনাকির মতো এক
রবীন্দ্রনাথকে বা তাঁর রচনা প্রসঙ্গকে দেখতে
পাই আমরা। কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারি না,

এ কোন্ রবীন্দ্রনাথ, কোন্ প্রয়োজনের
রবীন্দ্রনাথ। নিছক নামোল্লেখের বাইরে
তাঁরা বাঙ্‌ময় করতে চাইছেন নিজেদের
কোন্ অভিপ্রায়? আবার পরিহাস-প্রবণতাই
যদি হয় এর আসল উদ্দেশ্য,
তাহলে না-রবীন্দ্রনাথের মূর্তিটাকে আরো
প্রখর করে উলঙ্গ করে দেখাতেই বা
তাঁদের কিসের বিহ্বলতা?
কিন্তু সে-রকম দুঃসাহসও দপ্‌দপিয়ে ওঠে না
কোনোখানে। বরং তাঁরা দাঁড়িয়ে থাকেন সৌজন্য
এবং আক্রমণের এক মাঝরাস্তায়, পাঠককে
সৌজন্য না আক্রমণ বুঝতে না দিয়ে। এখনকার
ক্ষমতাবান তরুণেরা রবীন্দ্রনাথকে দেখছেন
কোন্ চোখে, সেটা বুঝে ওঠার আপন-গরজেই
একবার মন দিয়েছিলাম বিভিন্ন বই এবং পত্রপত্রিকা
থেকে ছাড়ানো-ছিটানো কথামালার সংগ্রহে।
সম্পূর্ণ হয়নি সে-সংগ্রহ, হওয়া দুঃসাধ্য বলেই।
তবুও যেটুকু হয়েছিল, তার থেকেই অল্প কিছু
উদ্ধৃত করছি এখানে, নমুনা হিশেবেই।
১। "ওরা দল বেঁধে গ্রামে গিয়েছিল, গ্রামে
প্রতিশোধপরায়ণ কিশোর গুলতি হাতে সারাক্ষণ
ঘুরে বেড়ায়। ওদের পর্বত অভিযানে দেখতে
পেয়েছে ইয়েতির ঠাসা হাসিতে চমকানো বরফ।

ধ্রুবপদের বদলে ওরা দেখতে পেল রবীন্দ্রনাথের ধূলি-ধূসরিত পৃষ্ঠায় মরা শ্যামাপোকা।"

কৌরব ৪২। ৪৮ পৃষ্ঠায় ফুট নোট

২। "আমার ভাবতেই কেমন লাগে কেন যে কুকুর-সম্পর্কে আমি কোনো কিছুই জানি না। কতো রঙ-বেরঙের চমকে-দেওয়ার মতো কুকুর আছে পৃথিবীতে। পমেটেরিয়ান। টেরিয়ার। যেখানেই যাই, আমি শুধু শুনি কুকুরের গল্প। মানুষের মতো কথা বলে কুকুর—মানুষের মতো চুপচাপ শুয়ে থাকে মানুষের বিছানায়। যখন আসে গ্রীষ্মের দিন, আমি হাততালি দিই, আর দু'তিনবার স্নান করি, আর বসে বসে গল্প শুনি কুকুরের। গেলাসের শেষ মদটুকু তারপর কখন একসময়ে শেষ হয়ে যায়। ট্রাম-বাস চলতে-চলতে কখন রাস্তাগুলো ফাঁকা হয়ে যায় এক সময়। বাড়ি ফিরতে ফিরতে, আমি শুধুই কুকুরের কথা ভাবি। শুয়ে থাকতে থাকতে, ওগো, যা-কিছু থেকে যায় শেষ পর্যন্ত—সেসব হচ্ছে চোখের জল আর ছটফটানি—আসে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন, শূন্য ব্লেড দিয়ে আমি দাড়ি কামাই আবার।"

এ কবিতাটি ভাস্কর চক্রবর্তীর। 'এসো সুসংবাদ এসো' থেকে নেওয়া ঐ বইয়েই আরো এক রকম রবীন্দ্রনাথ।

৩। "দেখতে পেলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একা বসে আছেন, আর চিঠি লিখছেন, আর তাঁর সারা মুখে ছড়িয়ে আছে চিরকালের মিষ্টিমধুর এক হাসি। আর শিলঙের মেঘ তাঁর মাথার চারপাশ দিয়ে ঘুরছে-ফিরছে। আমি শিলঙে যাইনি কোনদিন; আমি কোনদিন চিঠি পাইনি রবীন্দ্রনাথের। শুধু দু-একদিন, অস্তায়মান সূর্যের লাল আলো যখন ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে, আমি দেখতে পাই তিনি বসে আছেন আর লিখে চলেছেন—আর চেঁচিয়ে, দুহাত নেড়ে আমি কতো কথাই জানতে চাইছি তাঁকে-- দেখি, তিনি শুনতে পাচ্ছেন না কোনো কিছুই।"

৪। "দুঃখে আসতো না, কেবল খুব আনন্দে নাকি রবি ঠাকুরের চোখে হরদম জল এসে পড়তো শুনে কতবার বিস্মিত হয়েছি আমি। আমারও যে একবার সহসা এভাবে এসে পড়বে কে জানতো।"

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়। 'একটি মৃত্যু ও কয়েকটি বৃক্ষরোপণ' থেকে।

৫। "ইউরোপ বাংলা কবিতায় এসেছে বিষ্ণু দে-র উল্লেখে....জীবনানন্দে এসেছে চিন্তায় এবং রূপে।....একটা কথা ভেবেছো?....সেই রবীন্দ্রনাথ ....শেলী কীটস বায়রণ গুলে খেয়েও ঔপনিষদিক রয়ে গেলেন?....তা হ'ক....কিন্তু ইংরেজি

abstraction একটু স্পর্শ করল না কেন? শেলীর
'Ode to an Indian wind' মনে করো....
'an Indian wind' রবীন্দ্রনাথে কোথাও
ছিল না।....বাংলা কবিতা গড়ে উঠেছে অনেকটা
ছেলেমানুষি জাম্প-কাট সিস্টেমে।"

স্বদেশ সেন। 'রোগা হয়েছে কমলালেবু'-র
কবিতা-ক্যাম্প থেকে।

এই রচনার একটা অংশে রয়েছে শঙ্খ ঘোষ-এর
প্রতি অভিযোগ কিংবা হয়ত অভিমান, যেহেতু
তিনি রবীন্দ্রনাথে নিমগ্ন।

৬। "কলকাতায় রবীন্দ্রজন্মোৎসব ব্যানারের
আড়ালে বাঁধান দাঁত দিয়ে কয়েকজন বৃদ্ধ
রকমারি খাবার খাচ্ছেন।
করুণাকেতন একা শান্তিনিকেতনের খোয়াইয়ে।
দূরাগত মাইকের গান—
ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা—
রামকিঙ্করকৃত রবীন্দ্রনাথের মুখ করুণাকেতনের
সঙ্গে মিশে নগেন্দ্রনারায়ণের মুখে
মিলিয়ে যায়।"

ঈশ্বর ত্রিপাঠীর 'রতনের পৃথিবী' নামের বই থেকে
এই রচনাংশটি বেছে নেওয়া। বইটি নাটক বা
উপন্যাস নয়, 'একটি প্রতিবাদী চিত্রনাট্যের
প্রাথমিক খসড়া'। এই লেখকেরই কবিতার

বই 'জিভ এবং চাল ডাল'-এও অবিকল একই
রকম অহেতুক এবং অনর্থের রবীন্দ্রনাথ।

৭। "মানুষও অবিকল অগ্নিপুতুল
এ আমার কথা নয়
বলেছেন সতঃসিদ্ধ রবীন্দ্রঠাকুর
মানুষের চোখ আছে আনন্দ দেখে না
মানুষের কান আছে মাধুর্য শোনে না
মানুষের নাক আছে সুঘ্রাণ নেয় না।"

৮। "দায়বদ্ধ কবিরা
বৈশাখে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালন করবেন
লিবিয়ার আজিজিয়ার মুক্ত এরিনায়
আমরা এবারের অক্টোবরে জীবনানন্দ-উৎসবে
শম্ভু মিত্রকে নিয়ে যাবো
ওয়েস্টম্যান দ্বীপের উপত্যকায়।"

সামসুল হক।
শতভিষা-র 'যাত্রাপালা' থেকে।

৯। "আমার দুধের বয়সে, মনে করতাম সরস্বতী
ঠাকুর আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুই আপন ভাই
বোন। ছাপার অক্ষরের প্রতি কী ভক্তি
ছিলো, ভাবলে গা শিউরে ওঠে।"

সুব্রত সরকার
'দেবীমুখ'-এর 'কবিদেবতা' থেকে

১০। "কতোদিন বেঁচে থাকবো আমরা?
মনে রাখছি রবীন্দ্রনাথের জবানী :
যতোদিন ততোদিন....।"

বাবু বাসু।

'ভাইব্রেশন'-এর 'খুব আমল ও ঘনিষ্ঠ উদ্বেগ' থেকে।

১১। "ভারতচন্দ্র বলেছেন 'সে লেখে বিস্তর মিছা যে লেখে বিস্তর' (স্মৃতি থেকে উদ্ধার করা, যদি ত্রুটি থাকে পাঠকদের কাছে আগাম মাফ চেয়ে রাখছি) তাহলে তো কোনো ভাবনাই নেই। আমাদের সাহিত্যের কাণ্ডারী আর অমৃতরসের ভাণ্ডারী রবীন্দ্রনাথ তো আমাদের সামনেই আছেন। তাঁর মতো বিস্তর আর কে লিখেছে। তাই, হে লিটল ম্যাগোজিনের সাহসী কবিবৃন্দ, যত খুশি প্রাণের আনন্দে লিখে যাও। মা ভৈঃ।

উদাস বাউল পঁচিশে বৈশাখের
কবিতার প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংকলন থেকে।

অসংলগ্ন, অর্থহীন, অনেকটা আড্ডার বাউণ্ডুলে উচ্চারণের দিকে গড়িয়ে যাওয়া এই সব নমুনা থেকে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একালের তরুণদের শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধার চেয়ে আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যা, তা হল এক না-পড়া, না-জানার রবীন্দ্রনাথের ছায়ার সঙ্গে এঁদের যাবতীয় যুদ্ধ অথবা ক্ষুব্ধতা। অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না কোনো

বিশেষ গোষ্ঠী, কোনো বিশেষ কবি, কোনো
বিশেষ পত্রিকাকে মনে রেখেই, অথবা
তারই মনোরঞ্জনে এই সব রচনায়
এমন আলপটকা রবীন্দ্রনাথ। যেন
রবীন্দ্রনাথ এমন এক 'মেডইজি', যাকে
তেঁড়িয়ে-বেকিয়ে, ঠাট্টা-ইয়ার্কির ছলে হাজির
করতে পারলেই আধুনিকতার এবং
প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার পাশ মার্ক জুটে যেতে
বাধ্য। রবীন্দ্রনাথকে শিরোধার্য না করেও
যদি শিক্ষা-নবিশীর প্রয়োজনেই এইসব লেখকরা
ঈষৎ মনোযোগ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সঙ্গে
গদ্য রচনাগুলোও পড়তেন, তাতে লাভ
হত তাঁদেরই নয় শুধু, বড় অর্থে বাংলা
সাহিত্যেরও। ভুরি-ভুরি শিথিল, থলথলে,
থপথপে, হাড় মাসহীন, এবং অবিলম্বে আবর্জনায়
মিলিয়ে যাওয়ার মতো ধুকপুকে অস্তিত্বের
রচনাগুচ্ছের হাত থেকে নিস্কৃতি পেত একালের
বাংলা-সাহিত্য।

এইটুকু বলে থেমে গেলে সব বলা হত যদি,
অবশ্যই পরিসমাপ্তির পূর্ণচ্ছেদ পড়ত এইখানেই,
এ রচনায়। কিন্তু অসংখ্যের চোখে যখন তেরচা
চাউনি, তখনও অল্প কয়েকজনের চোখে উজ্জ্বল
উপলব্ধির এবং নম্র আত্মনিবেদনের যে আকুতি,

তারও খানিকটা পরিচয় এখানে অবশ্যই
উদ্‌ঘাটনযোগ্য।

১। "রবীন্দ্রসঙ্গীতে ছাড়া আর কোনখানে আছে
প্রেমের প্রকৃত মূর্তি চোখ ও চুম্বন ?"

রণজিৎ দাস
আমাদের লাজুক কবিতা থেকে

২। "একলাই হেঁটে যাচ্ছি, আঙুলের তুড়ি বাজিয়ে
জ্বালিয়েছি বুকে আগুন,
আর বুকের ব্যর্থ আবর্জনা ততই জ্বলে উঠছে
দহন জ্বালায়, রবীন্দ্রনাথ, তোমার সরণীতে
এইভাবেই নিরাময় চেয়েছিলাম, কিন্তু যন্ত্রণা
এভাবে কেন তোমার কাছে আত্মগোপনে আছে ?"

জয়ন্ত চক্রবর্তী
নিরাময় চেয়েছি

৩। "যে বড়ো আকাশ গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথের
হৃদয়ে শান্তি দিয়েছিল সেই আকাশের নীচে
চলে যেতে চাই
অথচ পারি না,
আকাশ ক্রমশ খুব ছোট হয়ে আসে।"

সুজিত সরকার। ছোট আকাশ
পঁচিশে বৈশাখের কবিতা, প্রথম এবং চতুর্থ সংকলন থেকে

৪। "অথচ মানুষ চায় মানুষে-মানুষে
এক কণ্ঠ দেশ-বিদেশে পরম সম্প্রীতি

অথচ সর্বত্র এর অন্ধকার ফুঁসে
দিগ্বিদিকে ঠাণ্ডা-যুদ্ধ—এই নব্য রীতি !
রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে অথচ দুর্মর মন্ত্র রটে :
যেখানেই বন্ধু পাই, সেখানেই নবজন্ম রটে।"

কবিরুল ইসলাম। কবিকণ্ঠ
'বিদায় কোন্নগর' থেকে

৫। 'মানুষের সাথে তার এতক্ষণ লড়াই ছিল।
মানুষই তাকে কষ্ট দিয়েছে! সে পিছন ফিরে
তাকায়। সে দেখে রবীন্দ্রনাথ! ছবি আঁকতে
থাকে। সে ছবি দেখে পিছন থেকে। রবীন্দ্রনাথ
ছবি আঁকছে নারীর। গভীর গহ্বর থেকে যেন
তুলে নিয়ে আসে ভালোবাসা। সে বোঝে
সাফল্য আর ভালোবাসা পাশাপাশি
চলে না।
তার চোখ থেকে জল পড়ে রবীন্দ্রনাথের ছবির
উপর। রবীন্দ্রনাথ পেছন ফিরে তাকায়।
রবীন্দ্রনাথের চোখ জলে ভরে যায়। বলে, চেষ্টা
করছি, পারেনি না—। সে কিছু বলে না। সে
ঘুরে দাঁড়ায়।

মনোজ চাকলাদার।
'আকাশ তাকে পোশাক পরিয়ে দেয়'
কথা, ১ থেকে।

প্রত্যেক নবীন যুগই তার স্বভাবধর্মে একবার না

একবার বাতাসে ছুঁড়ে দিতে চায় তার ঐতিহ্য-বিরোধী চিৎকার। পরে, সাবালকত্ব অর্জন এবং দীর্ঘ পথ প্রদক্ষিণের জন্যে প্রতিজ্ঞা ও প্রস্তুতির প্রয়োজনে তাঁদের ফিরে তাকাতেই হয় ঐতিহ্যের দিকে, নিজেদের সময়ের সমীকরণে ঐতিহ্যের তাৎপর্য এবং নতুন পুরুষার্থ নির্ণয়ের অবশ্যপালনীয় দায়িত্বে। পঞ্চাশের দশকের ঘোর ঔদাসীন্যকে পাশ কাটিয়ে ষাট এবং সত্তরের তরুণেরা আশির দশকে সাহিত্যের ভবিষ্যৎ-ভাবনার গরজেই রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকাতে বাধ্য হন অবশেষে। সে তাকানোর কোনো কোনো চোখে হয়ত নীল রঙের অনুরাগ, কোনো কোনো চোখে হয়ত অনেক না-পাওয়ার লাল রঙের নালিশ। আবার কোনো কোনো মন্তব্য হয়ত ব্যাপ্ত চর্চার অভাবে, দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতা কিংবা উদ্‌ভ্রান্তির ফলেই, আটকে গেছে নিছক ব্যক্তিগত বেদনা-বিক্ষোভের সমতলে, তার ঊর্ধ্বে উঠে তাত্ত্বিকতার আলোয় ঝলমলিয়ে ওঠে না। তবু এরই মধ্যে কিছু ভাবনার দিকে তাকিয়ে থাকা যায় কিছুক্ষণ।

১। "প্রতিভার দ্বারা মুগ্ধ হয়ে ব্যক্তিগত সামান্য পুঁজিকেও কাজে লাগাতে পারেন নি, আত্মলোপই তুষ্টির পথ বেছে নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের সমকালীন

অনুজ কবিরা। যদি, আচ্ছন্ন না হয়ে আকৃষ্ট হতেন, তাতে অন্তত বিলোপের কাজটা এমন দ্রুত ঘটে যেত না।....

এই পঞ্চাশ ষাট সত্তরের দশকে বসেও কৃত্রিমতা ও শুচিবায়ু গ্রস্ততায় রবীন্দ্রনাথকেও হারিয়ে দিতে পারেন এমন কবির অভাব দেখছি না।....রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম শুচিবাই, সঙ্গে ভিক্টোরিয় রুচি-চর্চা কবিসত্তার অবাধ প্রকাশকে সঙ্কুচিত করেছিল পদে পদে। তাঁর প্রতিভার স্ফূর্তি যতটা, প্রসার ততটা নেই। অন্তত কবিতায়।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

'আগুন নিয়ে খেলা' প্রবন্ধ থেকে।

২। "মৃত্যুর তিন বছর আগে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা সংকলন সম্পাদন করেছিলেন। তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী প্রজন্মের কিছু কবির কবিতা সংকলিত হয়েছিল তাতে। তাঁর এই 'বাংলা কাব্য পরিচয়' এর ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন—'প্রেমের কবিতা রচনা অপেক্ষাকৃত সহজ'। তাঁর এই উক্তির সঙ্গে আমি একমত হতে পারি নি। কবিতা রচনা ব্যাপারটাই দুরূহ, এবং প্রেমের কবিতা দুরূহতর। তবে এক ধরনের প্যাচপেচে প্রেমের কবিতা রবীন্দ্রনাথের সময়েও

লেখা হয়েছে এবং তার পরবর্তীকালেও।
হয়ত সেই ধরনের কবিতা লেখা সহজ, কিন্তু
সত্যিকারের ভালো প্রেমের কবিতা অবশ্যই
নয়।

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত।
'প্রেমের কবিতা প্রসঙ্গে' থেকে।

৩। "তাঁরা (আমাদের পূর্বসূরীরা) ব্যর্থ হয়েছেন
কারণ প্রকৃত অর্থে তাঁদের কোনো আন্দোলনই
ছিল না। কেবলমাত্র রবীন্দ্রবিরোধিতা বা
পুরোনো বিরোধিতা (খুবই স্বাভাবিক এবং
অনিবার্য এই উদ্যোগ) এখনো
কোনো আন্দোলনের ব্যাপার হতে পারে না।
বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে অস্তিবাচক কতকগুলো
দিক থাকা চাই, রচনায় এবং তত্ত্বে তার প্রচার ও
প্রতিষ্ঠা চাই।"

অশোক চট্টোপাধ্যায়
'আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে' থেকে।

৩

উপরের এতসব মন্তব্য-সম্ভার থেকে রবীন্দ্রনাথ
এবং না-রবীন্দ্রনাথের, ঝাপসা হলেও এক
ধরনের আকৃতি খুঁজে পাওয়া যায় তবু। এসব
মন্তব্য প্রধানত ব্যক্তিগত, যদিও তা প্রকাশিত

হয়েছে নানা সময়ের নানা লিটল ম্যাগাজিনে। লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েও ব্যক্তিগত, কারণ এসব মন্তব্য সব ক্ষেত্রে লিটল ম্যাগাজিনের নিজস্ব তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক নাও হয়ত। তাই এসবের বাইরেও থেকে যাচ্ছে আর এক রবীন্দ্রনাথ, লিটল ম্যাগাজিনের রবীন্দ্রনাথ। বিশেষ কোনো দায়বদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির রঞ্জন-রশ্মি ফেলে তরুণেরা যেখানে তাকাতে চাইছে তাঁর দিকে। অবশ্য এই মুহূর্তে আমাদের হাতের সামনে তেমন পত্রিকার অজস্রতা ছড়ানো রয়েছে ভাবলে ভুল হবে। তবু কিছু হাতে আসে, কিছু অন্য পত্রিকার আয়নায় চকিত প্রতিবিম্বের মতো চোখে পড়ে। আর তা থেকেই আমরা অনুমান করে নিতে পারি, কোনো কোনো লিটল ম্যাগাজিনের সেই স্বাতন্ত্র্য সত্তাবোধ, যা দিয়ে তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে মেপে নিতে চাইছেন নিজেদের উদ্দেশ্য, উদ্যম ও বিকাশের উপযোগিতার দাঁড়িপাল্লায়। শিলিগুড়ি থেকে বেরোনো একটি লিটল ম্যাগাজিনের নাম 'শব্দচেতনা',। এর তৃতীয় বর্ষের চতুর্থ 'আলোকপাত' সংখ্যায় একটি নিবন্ধের নাম 'লিটল ম্যাগাজিন : একটি আন্দোলন', সেখানে 'সাবেকি সাহিত্যের

প্রতি অনীহা—সাহিত্যের গতানুগতিক ফর্মকে ভেঙে-চুরে গুঁড়িয়ে দেবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা' ইত্যাদির মধ্য দিয়ে লিটল ম্যাগাজিনের বৈপ্লবিক কর্মসূচি ব্যাখ্যার পর আলোচিত হয়েছে দুটি লিটল ম্যাগাজিন, 'একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে বিশেষ সাহিত্য-আন্দোলন গড়ে তুলতে চায়' যারা। আলোকিত ম্যাগাজিনের প্রথমটি 'কবিপত্র', দ্বিতীয়টি 'সৃজনী সংবাদ'। তাঁদের ভাষায় 'কবিপত্র'—

"জন্মের পর থেকেই বিদ্রোহী। একদিকে তার বিদ্রোহ প্রতিষ্ঠানিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে বিদ্রোহ কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ-ঘেঁষা প্রচারধর্মী সাহিত্যধর্মের বিরুদ্ধে! কবিপত্র এই দুই ধরনের সাহিত্যকে বর্জন করে তৃতীয় পথে সাহিত্যের ধারাকে প্রবাহিত করতে চায়! সেই তৃতীয় পথ বা রীতির নাম দেওয়া হয়েছে 'থার্ড লিটারেচার'।—এঁদের আদর্শ বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ নন। নজরুল-সুকান্ত-মুখোপাধ্যায় নন, এঁদের আদর্শ জীবনানন্দ-বিষ্ণু-দে সতীনাথ ভাদুড়ী। তারাশঙ্করের হাঁসুলীবাঁকের উপকথা ও মানিক বন্দোপাধ্যায়ের পুতুল নাচের ইতিকথা—এই দুটি উপন্যাস থার্ড লিটারেচারের দৃষ্টিকোণে বেশ বড় স্তম্ভ।"

এরপর 'সৃজনী সংবাদ'-এর পরিচয়। তার
আন্দোলন—
"সম্পূর্ণরূপে পশ্চিমী মননশীলতার বিরুদ্ধে।...
যাঁরা বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে চান
পশ্চিমী সাহিত্যের ফলমূলা দিয়ে, এই পত্রিকা
তাদের সমালোচনায় মুখর! এই কারণে মাইকেল
বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ নন, তারাশঙ্কর জীবনানন্দই
এঁদের চোখে বাংলা সাহিত্যের যথার্থ
প্রতিনিধি।"
তারাশঙ্কর ভাগ্যবান। তিনি দু-পক্ষেই আছেন।
গড়ে দু-পক্ষ থেকেই বাদ গেছেন বঙ্কিমচন্দ্র আর
রবীন্দ্রনাথ। কেন বাদ গেছেন তার
পক্ষে যুক্তির বিন্যাস নেই কোনো।
শুধু আচমকা উৎক্ষিপ্ত মন্তব্য।
আবার এসব মন্তব্যেরও নেই কোনো শিকড়,
নেই পূর্বাপর সেই বীজের শক্তি ও সম্ভাবনা।
এদের গায়ের ছায়া পড়ে না কোথাও।
তাই রাজনৈতিক মতবাদের ভয়াবহতা থেকে গা
বাঁচাতে যারা সচেতনরূপে বদ্ধপরিকর, তাঁরাই
যখন বেছে নেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, আবার
সমগ্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুধুমাত্র
'পুতুল নাচের ইতিকথা', আর এদেরই আর
এক পক্ষ যখন পশ্চিমী মননশীলতার বিরুদ্ধে

পুতুলনাচের পুতুলের মতো দড়ি-বাঁধা হাতের
তর্জনী উঁচিয়ে জানিয়ে দেন যে জীবনানন্দে
তাঁরা কিন্তু সশ্রদ্ধ, তখন তু-পক্ষের কাছেই
বাতিল-হয়ে-যাওয়া রবীন্দ্রনাথ সরে যান
আমাদের ভাবনা থেকে, আমাদের উপলব্ধির
স্নায়ুযন্ত্রে ঝনঝনিয়ে বেজে ওঠে তীব্র ধনুষ্টঙ্কারের
টান-টান এক মর্মবেদনা। সেটা বাংলা সাহিত্যের
ভবিষ্যৎ নিয়ে। রাজনৈতিক চেতনা বাদ,
অথচ বিষ্ণু দে গ্রহণীয় এবং মানিক
বন্দ্যোপাধ্যায় পূজ্য ? পশ্চিমী মননশীলতা
বাদ, অথচ জীবনানন্দ শ্রদ্ধেয় ?
তাহলে কি এই রকম ভেবে নিতে
হবে যে 'চোরাবালি'-র পর আর বিষ্ণু দে, 'রূপসী
বাংলা' বা 'বনলতা সেন'-এর পর
জীবনানন্দ, 'পুতুলনাচের ইতিকথা'-র পর
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পড়েন নি এঁরা ?
অবশ্যই পড়েন নি, যেহেতু তার কণামাত্র ছাপ
নেই এইসব ভ্রান্ত উক্তির কোনো ফাঁকে-
ফোকরেও। সুতরাং এ থেকে আমরা অনুমান
করে নিতে পারি সঞ্চয়িতা-র কিছু এলোমেলো
কবিতার বাইরে রবীন্দ্রনাথেরও আর সমস্ত
কিছু রয়ে গেছে এঁদের জানার ঠুনকো
অহংকারের আড়ালে। একটা ছোট দৃষ্টান্ত

তুলে ধরলে বোঝা যাবে এ-জাতীয় অনুমানের ভিত্‌টা কোথায়।

'কবিপত্র'-র ১৯৮৪ মে-জুলাই সংখ্যায় পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের একটি রচনার নাম—'কেন প্রয়োগবাদী কবিতা'। সে রচনার শুরু "এক সময় আমি ঠিক করেছিলাম বাংলার হাটে মাঠে গেরস্থের ঘরে যে লোককথা ছড়িয়ে আছে, তার মধ্যে যে অবদমিত স্বপ্ন, ইচ্ছা, আনন্দ বিষাদ, তার গোপন অশ্রু ও ভাষা, তাকে মুক্ত কোরে দেবো কবিতায়; এর মধ্য দিয়ে আমি আমার দেশের সবসময়ে জীবন্ত কর্মিষ্ঠ মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার সেতু গড়ে তুলতে পারবো।"

লোক-কথা, লোক-গাথা, স্থানিক লৌকিক ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে উদ্যোগী হওয়ার এই পরিকল্পনার পিছনে তিনি অনুভব করছেন আরো বড় দায়, বৃহৎ জনজীবনের সংস্পর্শ থেকে সরে আসা শহুরে সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন। ত্রিশের কবিরা এই কাজ করেন নি বলে তাঁর ক্ষোভ। উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত কবি-লেখকেরা সুরুচি এবং শালীনতার নামে নিজেদের স্বতন্ত্র আভিজাত্য গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন বলে তাঁর অভিযোগ।

তবে স্বীকার করেছেন আলাদা ভাবে কোথাও নাকি ব্যতিক্রম ছিল এর. যদিও তা নগণ্য।

পবিত্রবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যে এখানে আমরা একজন কবি-লেখককে হাজির করতে পারি। ১৮৭৮-এ 'ফোক-লোর সোসাইটি' তৈরী হয়েছিল ইংল্যাণ্ডে, ১৮৯৮-এ 'ফোক-সং-সোসাইটি'। ১৮৮৯-৯০ এর মধ্যে আন্তর্জাতিক ফোকলোর কংগ্রেসের তিনটি অধিবেশন ঘটে যায় ইয়োরোপে। এইসব ঘটনা যখন ঘটছে বাইরের বিশ্বে, তখন সে-সম্বন্ধে অনবহিত হয়েও একজন বাঙালি কবি মেতে উঠলেন বাংলার 'যে সকল কথা ও গাথা সমাজের অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকাল সমাদর পাইয়া আসিয়াছে' যাদের মধ্যে দর্শন, বিজ্ঞান আর ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা, স্বদেশকে সর্বতোভাবে অনুভব করতে হলে যাকে ভালো না বেসে উপায় নেই, সেই রূপকথা, ব্রতকথা গ্রাম্য ছড়া, বাউল-ভাটিয়ালির মতো লোকসংগীতের সংগ্রহে। নিজের উদ্যোগে শুধু সংগ্রহ করলেন না, নানা পত্রিকায় ছাপালেন, বিশ্লেষণ করে দেখালেন সে-সবের ভিতরকার শাঁস-জল। এছাড়া নিজের উদ্যমকে সংক্রামিত

করলেন আরো অনেকের মধ্যে। নিজে বই লিখলেন। অন্যকে দিয়ে লেখালেন। সাগ্রহে ভূমিকা লিখে দিলেন অন্য সংগ্রাহকদের বইয়ের। আশুতোষ আর দীনেশচন্দ্র সেন এর আগ্রহে-অনুরোধে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কবিকঙ্কন চণ্ডী' পড়ানোয় মনস্থির করে যেদিন ঐ বাঙালি কবির সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, সমর্থন জানিয়ে বললেন তিনি -'তুমি ঠিক বই-ই বেছে নিয়েছ। তুমি পড়াতে আরম্ভ করার আগে ঐ বই সম্বন্ধে আমি তোমার সঙ্গে কিছু আলোচনা করব।'

পরে ঐ কবির কাছ থেকেই একদিন এক চিঠি "কবিকঙ্কন এবং অন্নদামঙ্গল পড়ে নোট করে রেখেছি। এক কপি মনসামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল যদি পাঠাতে পার তাহলে মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে আমার যা কিছু বক্তব্য আছে জানতে পারবে।"

১৩০১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্ম। তার মুখপত্র 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যায় ঐ বাঙালি কবি যে প্রবন্ধ লিখলেন তার নাম 'ছেলে ভুলোনো ছড়া'। এগার বছর পরে সাহিত্য পরিষদের সভায় ছাত্রদের সম্ভাষণ করে বললেন—

"দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণপত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষি কুটিরে, প্রত্যক্ষবস্তুকে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা জানিবার জন্য, শিক্ষার বিষয়কে কেবল পুঁথির মধ্য হইতে মুখস্থ না করিয়া বিশ্বের মধ্যে তাহাকে সন্ধান করিবার জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি !"

এই তালিকা দীর্ঘ করা যায় আরো। কিন্তু বাংলার লোকসংস্কৃতির উদ্ধারে ও বিস্তারে ঐ বাঙালি কবির সক্রিয় ভূমিকাকে কোনো একটি দীর্ঘ প্রবন্ধেও আঁটিয়ে ওঠা অসম্ভব। কারণ খুব একটা নগণ্য কাজ তিনি করেন নি। পবিত্র বাবুদের জানা নেই বলেই এখানে উল্লেখ করতে হচ্ছে ঐ বাঙালি কবির নাম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪

পবিত্রবাবুদের নন্দনতাত্ত্বিক অন্বেষণের নাম 'থার্ড লিটারেচার'। সেখানে আন্দোলন অভ্যর্থিত। কিন্তু রাজনীতি নিষিদ্ধ। তবে লিটল ম্যাগাজিনের জগতে থার্ড লিটারেচার ছাড়াও আছে আরো এক 'থার্ড ওয়েভ' বা বাংলায় 'তৃতীয় প্রবাহ'।

'তৃতীয় প্রবাহে' রাজনীতি তো স্বাগত
বটেই, বরং আরো সুস্পষ্টভাবে, মার্কসীয়
দৃষ্টিভঙ্গিই সেখানে নীতি-নির্ধারক।
এই 'তৃতীয় প্রবাহ'র প্রতিষ্ঠাতা যে লিটল
ম্যাগাজিন তার নাম 'এখন যে রকম'। এ পত্রিকার
সবকটি সংখ্যা আমাদের হাতে নেই। মাত্র
তিনটি সংখ্যার উপর নির্ভর করে এখানে
আমরা খোঁজার চেষ্টা করবো এঁদের রাজনৈতিক
চেতনাসম্পন্ন চোখ অন্য সব আত্মবিলাসী
নন্দনতত্ত্ব বিশারদদের চেয়ে আধুনিক রবীন্দ্রনাথের
উন্মোচনে কিভাবে, কোনখানে এবং কতখানি
স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্রতাবে আশ্বাস জাগে অবশ্যই,
এলোমেলো ভাবে পাতা উল্টিয়ে গেলে। কোনো
পাতায় পড়ি—পশ্চিম জার্মানি সম্মিলিত
জাতিপুঞ্জের স্বীকৃত রাজনৈতিক উদ্বাস্তুর
পাসপোর্টকে অগ্রাহ্য করে তুরস্কের নেতৃস্থানীয়
বিপ্লবী হুসেন বলবীরকে আটক করে তুরস্কের
নির্যাতন এবং অবধারিত মৃত্যুর পথে ঠেলে
দেওয়ার পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এঁদের
বড় হরফের ঘোষণা—
'প্রতিবাদে প্রতিরোধে প্রতিশোধ কমরেড
গড়ে তোল গড়ে তোল গড়ে তোল ব্যারিকেড,
আবার কোনো পাতায় এই রকম স্তবক—

"ঐ সময় হাওয়ায় শবের গন্ধ....অশান্তির বারুদ...
চক্রান্তের মাখন মোলায়েম মুখ। ১নং সফদরজং
রোড থেকে শুরু হয়ে যে ঘটনা ছড়িয়ে পড়ল
সমগ্র দিল্লী তথা ভারতবর্ষে, তা সত্যিই নজির-
বিহীন। এভাবেই পাঞ্জাব, আর সঙ্গে পুরনো
কাসুন্দি আসাম। কিন্তু তাতে শবের গন্ধ বয়ে
এনেছে মৃতের শহর ভূপাল—আমরা সক্রিয়
হবার বদলে ক্রোধে সরব হবার কথা ভেবেছি।
অথচ এমত রাজনৈতিক হাওয়া বদল, ঘৃণ্য
বদমাইশি আর মর্মান্তিক ইভেন্টের উত্তরে
প্রতিক্রিয়া কই তেমন? সাংস্কৃতিক
জগত জুড়ে দেখছি নৈঃশব্দের মাঠ,
বাঁজা সময়ের বরফ। কিন্তু ক্রোধ বড়
কানা ছিল, আর বাঙ্ময় সরবতা।"

দেশকাল সম্বন্ধে এই রকম আরো সব তীব্র জ্বলুনি-
পুড়নি আবেগের বেপরোয়া উৎক্ষেপ ছাড়াও
এই পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যার নানা পাতায়
সরাসরি মার্কসবাদের প্রতি আনুগত্য,
মার্কসবাদ সম্বন্ধে নিজেদের অটুট আত্মবিশ্বাস,
মার্কসবাদে অন্যদের দীক্ষিত করে তোলার
ঐকান্তিক আগ্রহ আমাদের ধারণাকে সম্ভ্রান্ত
করে তোলে এই বিশ্বাসে যে, চলতি
হাওয়ার চ্যাংড়ামি-সুলভ মতামত-মন্তব্য-

সিদ্ধান্ত এবং সমালোচনার হালকা শিমুল তুলোর
ওড়াওড়ির বদলে এখানে পেয়ে যেতে পারি
মাটির ভিতরে গাঁথা ইস্পাতের তীক্ষ্ণ ফলার
মতো অথবা ইস্পাত বানিয়ে নেওয়ার মৌল
উপকরণের মতো যুক্তিবিন্যাস।
বিভিন্ন সংখ্যার পাদটীকায়—
"আপনি আমি ও মার্কস
ভবিষ্যৎ গড়ে নেবো
যন্ত্রণায় যুদ্ধে ও প্রেমে"
এ জাতীয় বাঙ্‌ময়, অতি-বাঙ্‌ময় বিশ্বাস-ধ্বনির
চেয়ে আমরা খানিকটা বেশি নিশ্চিন্ততা অনুভব
করি যখন 'তৃতীয় প্রবাহে'-র মণ্ডল হিসেবে
ঘোষিত দেবজ্যোতি চক্রবর্তীর দীর্ঘ রচনার
এক অংশে পেয়ে যাই—
"আমরা বিসর্জন দেবো ছন্দোময়তা কারণ
বুকের মধ্যে এলিয়টের কবিতা
(যোগাড় করেছি, পড়েছি)।
পাশাপাশি মার্কস চর্চা। এহেন অনার্য উক্তিতে
তথায় কমিউনিস্টগণ (!) কুপিত হবেন।
কিন্তু বলো, ভালো লাগার ব্যাপারটা কি মার্কস
বোঝেন নি। নিশ্চয় বুঝেছেন। ক্যাপিটালের
ভূমিকার শেষে ছাখা যায় দান্তের উক্তি।
দান্তে কি কমিউনিস্ট।"

ক্যাপিটালের ভূমিকার শেষে ছাড়াও মার্কস
আরো অসংখ্য বার প্রণতি জানিয়েছেন দান্তেকে,
যেমন শেক্‌সপীয়র আর গ্রীক ট্র্যাজেডিকেও।
মার্কসবাদীর পক্ষে কোনো বড় কবি বা
লেখক বা শিল্পী অচ্ছুৎ নন, এ শিক্ষা
এতদিনে বিশ্বসাহিত্যের সমালোচনায়
দ্বিধাহীন রূপে স্বীকৃত। তথাকথিত
কমিউনিস্ট-মার্কা গোঁড়ামির বিরুদ্ধে 'তৃতীয়
প্রবাহে'-র এই সচেতনতা আমাদের আশ্বস্ত
করে এইখানে যে, এঁদের কাছ থেকে বাংলা-
সাহিত্যের সমগ্রতার এবং রবীন্দ্রনাথের সর্বাধুনিক
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পেয়ে যাওয়াটা অসম্ভব হবে না
আর।

কিন্তু প্রথম খটকা লাগে বর্ষ ৬-এর সংখ্যা
১-এর প্রথম প্রবন্ধে। প্রবন্ধের
নাম 'মেটেবুরুজের শ্রমিক
কবিয়াল—গুরুদাস পাল।' লেখক উৎপলেন্দু
চক্রবর্তী। সে লেখার এক জায়গায়—
"গান-ত নয়, যেন আগুন। প্রবীণ
গণ-সঙ্গীত-শিক্ষক হেমাঙ্গ বিশ্বাস লিখেছেন :
'রবীন্দ্রনাথ কোলকাতায় সেই আসরে
উপস্থিত থাকলে দেখতেন তাঁর বর্ণিত নষ্ট
পরমায়ু কবির দল গণ-সংস্কৃতির সংস্পর্শে চিরায়ু

হয়ে উঠেছে, এবং তাদের অনুপ্রাসের ছটায় জল ঝরে না, আগুন।”

এইটুকু পড়েই মনে পড়ে যায় ৪৮।৪৯-এর সেই ‘মার্কসবাদী’ পত্রিকার আগুন-ঝরানো বা আগুন-ছিটোনো দিনগুলোর কথা, যখন সাহিত্যের তুলনামূলক বিচার হতো এই ভাবেই। প্রশ্ন তোলা হতো বিষ্ণু দে কি পারবেন অমুক কবিয়ালের মতো আগুন-ঝরানো গান লিখতে? একদিকে আগুন-ঝরানো উত্তেজনার তপ্ত বাটখারা চাপিয়ে অন্যদিকে অন্য উপলব্ধির, অন্য অন্তঃশীল উপলব্ধির, অন্য গাঢ়তর সামাজিক উপলব্ধির মাপামাপির ব্যাপারটা আমরা ভেবেছিলাম একই সঙ্গে এলিয়ট-মার্কস এবং দান্তে পড়ানের এই মুক্ত চেতনার যুগে ফসিল হয়ে গেছে কোনো কবরের গহ্বরে। কিন্তু এই লেখা পড়তে পড়তে বুকের মধ্যে সহসা গুরু-গুরু, আবার কি ফিরে আসছে নাকি সেই সাংস্কৃতিক-মাৎসন্যায়?

‘এখন যে রকম’-এর তৃতীয় প্রবাহধর্মী রচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে খুঁজতে গিয়ে এরপর সেই বিভ্রমের ছবিটাই ফুটে উঠতে থাকে ক্রমশ। ক্রমশ আর মেলানো যায় না এঁদের তীব্র সমাজ-সচেতনতার সঙ্গে এঁদের ভাষার বিশৃংখলা। বিশৃংখলা?

নাকি পাঠককে চমকে দেওয়ার সযত্ন-রচিত চাতুর্য? ভাষার কথা থাক। রবীন্দ্রনাথে ফিরি। 'এখন যে রকম'-এর যে মাত্র তিনটি সংখ্যা আমাদের হাতে, তা থেকে সংগ্রহ করা রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত উক্তিগুলো এই রকম—

১। "শুধু বলব, রবীন্দ্রনাথ-পড়া মানসিকতায় গ্রামের কথা বলা হাস্যকর।"

'কচ্ছের ডায়েরী'—প্রসঙ্গে ভূমিকা।

২। "আপদমস্তক বাঙালী আমি—আ মরি ভাষা—হাসা রাবিন্দ্রীক ফুলফল—মধুময় সেন্টিমেণ্টে নাকি আমরা বোবানো। হৃদস্পন্দন দ্রুত হলেও গোয়ে ওঠা সম্ভব—একি লাবণ্যে পূর্ণপ্রাণ....। এই চাই, ওই চাই, তবু নিজস্ব সুখে দুঃখে রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে রাখতে হবে।"

"আমি তেমন যেমন পরিশুদ্ধ সংস্কৃতির সহায়ক পৌ মাত্র। শুধু প্রথমটি যেমন ছিল, জীবনমরণ সুখঃদুঃখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে ধরার চেষ্টায় ঈশপের গল্পের সেই রিয়ালটি হইনি। তেমন কোন প্রাজ্ঞ চিন্তায় নয়, সামান্য কিছু অভিজ্ঞতা লব্ধ তথাকে ভয় করে। জেনেছি বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া মৃতদেহ বহন করার সময় যে লয়-ছন্দের মাত্রাহীন সুর ক্রমে ঘুরে ঘুরে আসে তা গীত-বিতানের পাতায় নেই।"

"কমিউনিস্ট আইদিদ জীবনের শেষ মুহূর্তের
তীব্র বিযুক্তিকে শিল্পীও সুরে ছুঁয়ে দিলেন····
"ঝরা পাতা গো আমি তোমারই দলে"····।
লক্ষ লক্ষ কমিউনিস্ট হত্যা শেষ হলো,
মেশিনগানের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে চমকে
উঠলাম।—

আঃ চুপ করো। ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

৩। "যে কিছু করবে না, সে রবীন্দ্রনাথের পাঠক
—আমার পাঠক নয়। আমি পাঠককে সচেতন
করি, ঘৃণা করতে উসকে দিই।"—

ওয়ার্কশপ নং ১৪

৪। "ধরা যাক আপনার পছন্দে আছে রবীন্দ্রনাথ
বা অবন ঠাকুর। এঁরা প্রত্যেকেই ধরে নিয়েছেন
আপনি বুদ্ধিমান, রসবোধ আপনাতে মিলিয়ে
যায়নি। অথচ অভ্যাসের বশে আপনি এঁদের
কথা বলেন। পছন্দ আপনার কাছে অভ্যাসের
নামান্তর।····
বড় সমস্যা হল প্রবন্ধকে কার ঘরে রাখি?
প্রবন্ধে শিক্ষার একটা দিক থাকবে—রবীন্দ্রনাথ
বলেছেন। অথচ তাঁর একটা প্রবন্ধেও শিক্ষা
পেয়েছেন? 'কাকে কি বলে', 'কিসে কি হয়',
'কেন', 'কোনটা কি', এ ধরনের শিক্ষা তিনি
বিলোতে যান নি। কারণ তিনি শিল্পী; 'কিসে

কিসে কি কি হয়' তাঁর বলার কথা নয়। অথচ আপনার কাছে শিক্ষা মানে তো তাই। রবীন্দ্রনাথ যদিও শিক্ষা বলতে অন্বেষণ, পর্যবেক্ষণ ও আত্মানুসন্ধান বুঝাতেন। তাঁর লেখায় অবশ্যই এসব আছে। তবুও আপনি বিশ্বভারতী নামক ইনস্টিটিউশনে খোঁটা বেঁধেছেন। শান্তিনিকেতনের নাম কচি দূর্বাদল, আহা অমৃত। আপনি রবীন্দ্রনাথ মানতে বাধ্য।''····

"পাঠক, আপনি কি কখনো ভেবেছেন 'আলালের ঘরের দুলাল' আদপে একটি প্রবন্ধই? 'কাহিনী বিন্যাস' যথেষ্ট হওয়ায় লেখাটি বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা নিয়ে এলো। মানিকবাবুও তাঁর 'চতুষ্কোণ'-এ পুরোপুরি প্রবন্ধের এলিমেন্টকে ট্রান্সফার করেছেন দার্শনিক কথোপকথনে। আর রবীন্দ্রনাথ? ওনার ভূমিকা অনেকটা হলুদগুড়ির মত। উনিও কবিতায় প্রবন্ধের আকারকেই নিয়েছেন। আপনি একটু মনে করার চেষ্টা করুন, 'ঐকতান' '১৪০১ সাল'।····

"তবে বলি কবিতার কথা। হ্যাঁ, কবিতা; কোথায় এসে ঠেকলো কবিগুরুর জাহাজ? সুকান্তের কথা বলেছি, এসেছি নজরুল প্রসঙ্গেও। খরতাপে বাংলা কাব্যশিল্পীও অম্বিষ্ট রূপ পরিগ্রহ

কোরে আর যা রেখে গেল তা, ছন্দবিলাসীর
ভাসমান ডোঙা।"

বিপ্লবস্ত কৌশলম্। ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

৫। "না-না-ওসব মৃত্যুচেতনা-ফেতনা কিস্যু না,
ওসব গোঁড়ো ফ্যাতরামি তার জন্যে নয়।
আসলে "মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান"
লাইনটা তাঁরই লেখা উচিত ছিল।
কিন্তু রবি ঠাকুর পেডিগ্রীর দৌলতে
ওটা তাঁর হাতছাড়া—তবে আর হা-পিত্যেশ
করেই বা লাভ কি?
"রবিঠাকুর বেশি পড়লে ভুঁড়ি হয় এটায় যক্ষা....

ভেঙে যাচ্ছে স্কেলিটন। ছন্দম দে

মার্কস, মাও সে-তুং, চে-গুয়েভারা, প্লেটো,
অ্যারিস্টটল, পাসকল, সাত্র, হো-চি-মিন,
এলিয়ট, গ্রামচি প্রমুখদের যথেচ্ছাচার উল্লেখ,
উফ্, আঃ, বাঃ, ফুঃ ওহ্-হোঃ, ওফ্, ছোঃ জাতীয়
ধ্বন্যাত্মক শব্দের মুহুর্মুহু ব্যবহার, আর বিষয়-
নিরপেক্ষ রূপেই খিস্তা-খাস্তার বেলেল্লা পনাকে
শীতের মাফলারের মতো কলমের গলায় জড়িয়ে দিয়ে
বিপ্লবাত্মক বাগাড়ম্বর, এই তিনের যোগফলে
এই বিচিত্র বিকট লিটল ম্যাগাজিনটি খাঁটি
বিপ্লবী চেতনা থেকে যতটা দূরে, আত্মম্ভরী
নৈরাজ্যবাদের ধ্বজা উড়িয়ে খাঁটি অপসংস্কৃতির

ঠিক ততটাই কাছে। বাজার ছেয়ে-যাওয়া
আদর্শহীন, উদ্দেশ্যহীন, গন্তব্যহীন লিটল
ম্যাগাজিনদেরও এর তুলনায় কম ক্ষতিকারক
মনে হয় এই কারণে যে, সেখানকার খ্যামটা
নাচ প্রগতিশীলতার ঘোমটা দিয়ে আড়াল করা নয়।
এ-জাতীয় ঠুনকো, শিকড়হীন বিপ্লব-বিলাসিতা
আসলে ক্ষয়-ক্ষতির রক্ত-পুঁজের ঘা গজিয়ে দেয়
ঠিক সেইখানে, যেখানে আমরা প্রত্যাশা
করতে পারি সংস্কৃতি-চেতনার সমাজ-মুখী
প্রসার, সৌন্দর্যতত্ত্বের মার্কসীয়
বিশ্লেষণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আগ্রহ।
আমাদের দেশে সাহিত্যে শিল্পে মার্কসবাদের
নীতি-নিয়মের প্রয়োগে বিচ্যুতি ও বিশৃংখলা
ঘটেছে নানা সময়েই, শুদ্ধতা সন্ধানের
সমান্তরালেই। কিন্তু এমন বালভাষিত
অথবা ভাঁড়ামি-সুলভ স্বৈরাচার চোখে
পড়েনি কখনো। এখানে রবীন্দ্রনাথকে
নিয়ে যে-কোন রচনার যে-কোনো
প্রসঙ্গে এবং প্রসঙ্গতা-ব্যতিরেকেই, যে-ধরনের
রুচির বিকার, অথবা বিকৃত রুচির আস্ফালন, তা
রবীন্দ্রনাথের 'ভবিষ্যৎ-এর চেয়ে আমাদের ভাবনার
মুখটাকে ঘুরিয়ে দেয় উটকো পঙ্গপালের উপদ্রবে
আক্রান্ত বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যতের দিকে।

৫

আমাদের দেশে এমনটাই হয়তো বা এখন স্বাভাবিক। যেহেতু কলোনিয়াল দাসত্বের আধো-জাগা ঘুমঘোর ঠেলে নিজেদের সম্পূর্ণ আত্মপরিচয়কে জেনে ওঠা এখনো তার অসম্পূর্ণ। শুধু রবীন্দ্রনাথ অথবা শুধু সাহিত্য নয়, অতীত থেকে বর্তমানে ব্যাপ্ত ভারতীয় সমাজ, এমনকি ভারতীয় নয়, শুধুমাত্র এই পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-সংস্কৃতির অন্তঃশীল প্রবাহের গতি-প্রকৃতি অন্বেষণেও এই দেশের কবি-সাহিত্যিক বা সংস্কৃতি-কর্মীদের একটা বড়ো অংশই রয়ে গেলেন নিরুদ্বিগ্ন রূপে উদাসীন। এই বড়ো অংশের মধ্যে যাঁরা ইতিমধ্যেই লগনশা-র রুই-কাতলার মতো চড়া দামের অভ্যার্থনা পেয়ে গেছেন কেনা-বেচার বাজারে, তাঁদের মধ্যে সৃষ্টি-অস্থিরতার বদলে শালগ্রাম শিলার মতো গোল-গাল এক পরিতৃপ্তিই ক্রম সংক্রামিত। পল এলুয়ারের একটা ৬ লাইনের কবিতায় একটি দুর্ভিক্ষ তাড়িত বালককে আমরা যে-কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দিতে দেখেছিলাম—আই অ্যাম ইটিং। এইসব বাজার-হাঁকানো লেখকদেরও যদি আজকের সময়ের বেদনা-বিশৃংখলা, মূল্যবোধের অধঃপতন,

রাজনৈতিক মাৎসন্যায়, সাহিত্যে-শিল্পে অগভীরতার আগ্রাসন, সংস্কৃতির অবক্ষয়, সভ্যতার ভিতরে ঢুকে-পড়া ত্রাসে' ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, উত্তর আসবে ঐ রকমই —আই অ্যাম রাইটিং। নিজেদের অনর্গল সৃজন-রোমন্থনে তাঁরা এতই পুলকিত, আবিষ্ট এবং আত্মসন্তুষ্ট আর অবিকল 'অর্ডার অ্যাণ্ড সাপ্লাইয়ের' ফরমুলা অনুযায়ী লিখে-যাওয়া রচনাবলীর অমরতা সম্বন্ধে এতই স্থির-নিশ্চয় অথবা উল্টো ভাবে, অশন-বসনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুড়ে অকারণে বালি ছিটিয়ে অমরতা-অর্জনের ঝুঁকি নেওয়াকে ভ্রান্ত তপস্যা ভেবে তাঁরা এ-বিষয়ে এমনই অটুট স্থ-মুখর যে, অন্য দেশের অন্য সময়ের সাহিত্য-সংস্কৃতি তো দূরের কথা, নিজেদের সমকালের চারপাশকে তাকিয়ে দেখার সময় নেই তাঁদের। এক এক সময়ে মনে হয়, বাংলা সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষায় এও এক শুভ আশীর্বাদ।

যৌনতা এবং অপরাধ, অথবা হিংসা বনাম যৌনতা, অথবা শয়ন এবং ধর্ষণকে প্রধানতম পুঁজি করে আর করল-খেল-উঠল বসল জাতীয় বর্ণপরিচয়-সুলভ বাক্যবিন্যাসে নিজেদের যাবতীয় প্রতিভাকে উপুড় করে দেওয়ার প্রবলসুখে

যাঁরা পরিতৃপ্ত, চিন্তাশীল প্রবন্ধ-সাহিত্যের সরোদ-সেতার-বীন্-পাখোয়াজের আসরে তাঁদের তাসাপার্টি যে ঝমঝমানো উত্তেজনায় ঢুকে পড়েনি এখনো, সেটাই বরং একদিক থেকে অদূর ভবিষ্যতের সুস্থ সম্ভাবনাময়তাকে জিইয়ে রাখার আশা জোগায় অনেকখানি। বরং যা চলেছে এটাকেই উৎসাহের ফুঁয়ে জ্বালিয়ে রাখা ভালো। একদল বাঙালী লেখক উটপাখির মতো মুখ গুঁজে থাকুক গপ্পো-উপন্যাসের একরঙা চোরাবালিতে। আর মুষ্টিমেয় আর-একদল নিবিষ্টতায় নুয়ে থাকুক সাহিত্য-সংস্কৃতির গভীর শিকড় থেকে ছড়ানো ডালপালার ফুল-ফলের, কাঁটা ও পরাগের বিকাশ-বিন্যাসের গূঢ় অভ্যন্তরে। আর এদের মাঝখানে থাকুক আজকের তরুণ সম্প্রদায়, এই দুয়ের মাঝখানে ঝুলে-থাকা এবং দুলতে-থাকা পেণ্ডুলামের মতো, যাঁরা হয় ক্ষমতা সত্ত্বেও আত্মনির্মাণে অনাগ্রহী, অথবা কোথায় আত্মবিসর্জনে অধিক নিরাপত্তা ও অধিকতর প্রচারসুখ, তারই অনুসন্ধানে ব্যস্ত। আর অতিশয় কৌশলে তাঁরা নিজেদের সাহিত্য-ভাবনাকে মুড়ে রাখুক দুই স্বতন্ত্র জার্সিতে। তাই তাঁদের ভাষাবিন্যাসে থাকুক একদিকে প্রতিষ্ঠান

বিরোধী গরগরে রাগ, অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের সোহাগী দৃষ্টি আকর্ষণের গোপন অভিপ্রায়ে বাজারী সাহিত্যের ছলাকলার মক্‌সো।
এই রকম অনুজ্জ্বল পটভূমিকায় এখন কী দীপ্ত-দীপ্র মনে হয় তিরিশের যুগকে। রেনেসাঁস নামের এক অ-ধরা সময়কে বাদ দিলে তিরিশের যুগই এখনো পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। ঐ একবারই আমরা প্রত্যক্ষ করলাম সেই সোনালী সময়, যখন সমকালীন প্রত্যেক ধীমন্ত কবিই মননের বিস্তারে ও বিচ্ছুরণে নিমগ্ন হয়ে আছেন যাবতীয় সৃষ্টির মূল্যায়নে। এখানে যাবতীয় বিশেষণটা কোনো ছুঁড়ে দেওয়া অতিশয়োক্তি নয় কোনো। তাঁদের মননের পরিক্রমা যে সৃষ্টির সমগ্রতাকে ছুঁয়েই, তা আজ গ্রীষ্মকালীন দ্বিপ্রহরের মতো উদ্ভাসিত। যেহেতু কবি, তাই কবিতা নয় শুধু, গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধের গদ্যসাহিত্য, শিল্পকলা, লোকশিল্প, সংগীত, ভাস্কর্য, রাজনীতি, সমাজনীতি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ধর্ম আর দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, এমনকি বিজ্ঞানও তাঁদের চিন্তাপরিধির অন্তর্গত বিষয়। এমন হতে পারে যে বিষয়ের বহুধাকে তাঁরা যে এড়িয়ে যেতে পারছিলেন না, তার কারণের মধ্যে একদিকে যেমন নিজেদের বিশ্বকে-মেলানো আধুনিকতা অর্জনের দায়,

অন্যদিকে তেমনি সর্বত্রগামী বা বহুমুখী রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষতাকে পার হয়ে যাওয়ার সাধনা। বহুমুখী রবীন্দ্রনাথকে বুঝে ওঠার, ব্যাখ্যা করার গরজে তাঁদেরও বাধ্যতই তাঁর মতো অথবা তাঁর চেয়ে আরো কিছুটা বেশি বিষয়ের দিকে ছড়িয়ে দিতে হয় মনোযোগী অধ্যয়ন।

এক্ষেত্রে গোটের জার্মানির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বাংলার ব্যবধান দুস্তর। স্টিফেন স্পেণ্ডার সম্পাদিত গোটে-সংকলনের ভূমিকায় আমরা পড়ি, গোটে ছিলেন শেষ রোমান্টিক প্রতিভা নয়, বরং প্রথম ও শেষ পরিপূর্ণ এক আধুনিক ব্যক্তিত্ব। 'অ্যান অল-রাউণ্ডার', 'হু কমবাইণ্ড দা রোল্‌স অফ এ পোয়েট, স্টেট্‌সম্যান অ্যাণ্ড সায়েন্টিস্ট'। আর 'আফটার হিম অল অকুপেশনস স্প্লিট আপ ইনটু দেয়ার সেপারেট অ্যাণ্ড স্পেশাল কমপার্টমেন্ট'।

আজকের বাংলার সঙ্গে স্পেণ্ডার কথিত সিদ্ধান্ত মিলে যায় অনেকখানি। কিন্তু তিরিশের যুগের কবিদের সময়ের সঙ্গে মেলে না। আর মেলে না বলেই সে এতখানি স্বতন্ত্র এবং স্বর্ণযুগ অভিধার যোগ্য। আবার হয়তো অন্যভাবেও দেখা যায় এই সময়টাকে। অন্যভাবে বলা যায় যে, তিরিশের যুগটা রবীন্দ্রনাথেরই শেষ-বেলাকার

আলো দিয়ে এমনভাবে রাঙানো যে, তাকে মনে হতে পারে রবীন্দ্র-যুগেরই একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। আবার তিরিশের কবিদের দিকে দাঁড়িয়ে যদি তাকানো যায়, দেখা যাবে তাঁদের সৃষ্টির অধিকাংশকে জুড়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ, প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে।

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেই তাঁদের বিদ্রোহ। আবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেকটা গুরু-শিষ্যের মতোই তাঁদের যোগসূত্র। তাঁদের একদিকে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নির্মাণের সংগ্রাম, অন্যদিকে সমষ্টিগতভাবে রবীন্দ্রনাথকে পেরিয়ে-যাওয়ার এক স্বতন্ত্র আধুনিকতা নির্মাণের প্রাণপাত শ্রম। আবার পরিশেষে, তাঁদেরই নামতে হলো সেই সুকঠিন ব্রতে, স্বদেশ-সীমায় আটকানো রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বসাহিত্যের মহান প্রতিভাদের সমকক্ষরূপে চিনিয়ে দেওয়ার আর চিনে নেওয়ার। তাঁদেরই হয়ে উঠতে হলো রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্বের বিশ্বস্ত ভাষ্যকার। তিরিশের যুগের আগে 'বিশ্বকবি'টা রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে নিছক একটা গৌরব-বাচক বিশেষণ। তিরিশের যুগে বিশ্ববোধের কবি রবীন্দ্রনাথের ক্রম-উন্মোচন। ইতালি তার দান্তেকে ছেঁকে নিতে পেরেছে

মধ্যযুগীয় ধর্ম-বিশ্বাসের অপ্রয়োজনীয় খাদ সরিয়ে। জার্মানি তার গোর্টেকে আলাদা করে নিতে পেরেছে ফিউডাল আভিজাত্য-বিলাসের বিচ্যুতি থেকে সরিয়ে। কিন্তু আমরা, এখনকার আমরা, তিরিশের যুগের কবি ও প্রাবন্ধিকদের গড়ে-দিয়ে-যাওয়া 'আর্মেচার' হাতে পেয়েও তেমন করে গড়ে তুলতে পারলাম না রবীন্দ্রনাথের আধুনিক অবয়ব। আবার যদি বা গড়ে তুলতে চাইছেন কেউ কেউ, সেদিকেও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিক্ষেপ জানিয়ে দেয় না আমাদের ব্যগ্র অনুসন্ধিৎসা।

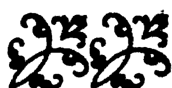
বরং এ ক্ষেত্রে অদ্ভুত এক প্যারাডক্সই ছত্রাকারে ছড়ানো। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে উপনিষদ-ঘেঁষা আধ্যাত্মিকতার অভিযোগ নিয়ত কানে আসে বা চোখে পড়ে আমাদের। সেই অভিযোগে আশ্চর্যভাবে মিলেও যায় অনেক প্রবীণ কণ্ঠস্বর, অজস্র নবীন কণ্ঠস্বরের ঐক্যতানে। অথচ আইয়ুব যখন নতুন করে পুরনো আর এখনকার পক্ষে অদরকারী রবীন্দ্রনাথের, হয়তো একভাবে ভাববাদী রবীন্দ্রনাথেরই, বৃহদাকার মূর্তি বানান, তাকে সমাদর জানানোর আগ্রহে ভাঁটা, অথবা সে-ভাববাদীতার বিপক্ষে কোনো জোয়ার তো চোখে পড়ে না।

আমাদের। কোনো লিটল্‌স ম্যাগাজিন, কোনো তারুণ্যময় কবি তো এগিয়ে আসেন না যুক্তি খণ্ডনের নিজস্ব গরজে।

তাঁর 'দার্শনিক প্রবন্ধাবলী'কে বাদ
দিয়ে যদি ভলতেয়ারের, তাঁর
'মনার্কিয়া'কে বাদ দিয়ে যদি দান্তের
এবং তাঁর রাজনৈতিক মতামতকে বাদ
দিয়ে যদি গ্যেটের অপরিহার্য অন্তঃসারকে
বেছে নিতে পারে আজকের পৃথিবী, তাহলে
তাঁর ঔপনিষদিক উচ্চারণগুলোকে পরিপূর্ণ
উপেক্ষা করে আমরাই বা কেন গড়ে নিতে
পারবো না আমাদের চাহিদার এবং আমাদের
গর্ব-গৌরবের রবীন্দ্রনাথকে। মূর্খ ছাড়া আর
কারো পক্ষেই এমন বিশ্বাসে আস্থা রাখা সম্ভব
নয় যে, তাঁর ছোটগল্প, তাঁর নাটক, তাঁর
উপন্যাস, তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধ এবং তাঁর
ছবিতেও লম্বা ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে
উপনিষদ। আমরা কি অন্বেষণ
করেছি সেইভাবে? আমরা কি কখনো
ভেবে দেখেছি যে, উপনিষদের
আলো-লাগা রচনাংশকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেও
বাকি থেকে যান যে রবীন্দ্রনাথ,
সেও আমাদের পক্ষে কতখানি

প্রয়োজনের এবং বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে
মিলিয়ে দেখলে তা কতখানি
চিরস্থায়িত্বের ?
আরম্ভের যুগে যামিনী রায়, আর বিনোদ-
বিহারী, আর বিষ্ণু দের পর, মাঝখানে
শিবনারায়ণ রায় এবং অতি সম্প্রতি 'নির্মাণ
ও সৃষ্টি'র শঙ্খ ঘোষকে বাদ দিলে এতগুলো
দশক জুড়ে আর কোন কবি, কোন লিটল
ম্যাগাজিন, কোন অতি-বিপ্লবী
প্রশ্নের চোখে এবং উত্তরের অভিপ্রায়ে
তাকিয়ে দেখেছেন তাঁর গণনাহীন
ছবির আধুনিকতার জগতকে ?
সৌমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
'রবীন্দ্র চিত্রকলা' নামের অ্যাকাডেমিক
আলোচনা-গ্রন্থটিকে মনে
রেখেই আমাদের এই প্রশ্ন।
চূড়ান্ত নিষ্ক্রিয়তাও হতে পারে কতখানি
আস্ফালনময় তার যদি কোনো আন্তর্জাতিক
প্রতিযোগিতা হতো, পশ্চিমবঙ্গের এক
শ্রেণীর উন্মার্গগামী বুদ্ধিজীবী যে বিশ্বের হাত
থেকে সোনালী পুরস্কারটি ছিনিয়ে নিয়ে
আসতেন সসম্মানে, ক্রমশই সে-জাতীয়
ভাবনা শক্ত-সমর্থ হয়ে উঠছে সমকালীন

সংস্কৃতি কর্মীদের ব্যবহারে, বচনে ও
বাগাড়ম্বরে।
এত নৈরাশ্যেও ভরসা শুধু এই নয় যে কিছু
মানুষ নিদ্রাহীন। তার চেয়েও বড় ভরসা,
ইতিহাস প্রতিশোধ পরায়ণ।



পারসিক রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথকে কাছে পাওয়ার জন্যে একসময়ে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল সাদী, হাফিজ, ফিরদৌসী, জামি, নিজামী, ওমর খৈয়ামের দেশ।

ইরানের শাহেনশাহ রেজা শাহ পাহ্‌লেভির দু-হাত বাড়ানো উদার নিমন্ত্রণ। এমনকি সে নিমন্ত্রণ যে কবির দোরগোড়া থেকে শুরু হয়ে ঐ দোরগোড়াতেই শেষ, পারস্যরাজ সেটাও ভুললেন না জানিয়ে দিতে। অর্থাৎ ভ্রমণের সমস্ত খরচাটাই তাঁর।

রবীন্দ্রনাথ তখন অসুস্থ, শুভানুধ্যায়ীরা ইরাণের কন্সালকে জানিয়ে দিলেন ডাক্তারের অনুমতি ছাড়া কবির পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। ইরান যাত্রার ধকল অনেক, যা বইবার মতো শক্তি এখন তাঁর অনায়ত্ত। প্রায় ধামাচাপা পড়া ঐ ভ্রমণ প্রসঙ্গ ক'মাস বাদে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো আবার। আবার শুভানুধ্যায়ীদের চোখে-

মুখে পুরনো উদ্বেগ আর গলায় নতুন নতুন প্রশ্ন। কলকাতা থেকে ট্রেন পথে করাচী-সেটাই তো একটা রক্ত-জল-করা জার্নি। তারপর জাহাজে চেপে আরব সাগর থেকে পারস্য উপসাগরে পাড়ি, সে আরেক দফা ভোগান্তি। না, এ-যাওয়া হতে পারে না! খবর পেয়ে ইরানের কন্সাল জানালেন, কবিকে আমরা নিরাপদেই নিয়ে আসব আমাদের দেশে প্লেনে চাপিয়ে। প্লেন? সে তো আরো ভয়াবহ। শুভানুধ্যায়ীরা কবিকে সাবধান করে দিলে আগে-ভাগে। প্লেনে যাওয়ার সম্মতি জানাচ্ছেন নাকি? প্লেনের ঝাঁকুনি প্রচণ্ড শব্দ, ঝড়-ঝাপটায় পড়ে দোল খাওয়া সুস্থ লোককেই তো বানিয়ে তোলে শয্যাশায়ী। প্লেন যদি কোনো কারণে দশ হাজার ফুট উঁচুতে উঠে যায়, তখন তো সহসা বন্ধ হয়ে যেতে পারে কবির হৃৎযন্ত্রের স্পন্দন, শুভানুধ্যায়ীদের মুখে এমন ঘোরতর আশংকা-সংবাদে, আতঙ্কিত কবিও জানিয়ে দিলেন তাঁর না-মঞ্জুর মনোভাব।

ওলন্দাজ হাওয়াই বহর K. L. M. কর্তৃপক্ষের মাথায় হাত। সে কি কথা! আমরা যে গোটা পৃথিবীকে এর মধ্যেই জানিয়ে দিয়েছি

যে কবি পারস্যে আসছেন আমাদের কোম্পানির প্লেনে। এখন সে-সফর বাতিল হলে টি টি পড়ে যাবে দুনিয়ায়। আর আমাদের মুখে পড়বে অপমানের কালি।

সেবারের ভ্রমণের জন্যে কবির সহযাত্রী হিসেবে প্রতিমা দেবী আর অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে নির্বাচিত হয়েছিলেন কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি ছুটলেন ওলন্দাজ কন্সালের কাছে।

শুনুন, আপনারা কি যাওয়ার আগে কবিকে প্লেনে চাপিয়ে ট্রায়াল দিতে পারেন একটা?

কেন পারবো না? নিশ্চয়ই পারবো। আমাদের দেশের সেরা পাইলট ভ্যান ডাইক-কে পর্যন্ত আনতে পারি ডাকিয়ে। তাই করা হল। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে প্লেন উঠল বারো হাজার ফুট উঁচুতে। আরোহণ থেকে অবতরণ সবটাই সুখপ্রদ এবং নির্ভাবনাময়। অতএব মঞ্জুর হল, প্লেন যাত্রা।

যাত্রার ব্যবস্থা যখন পাকা, তখন আর এক উটকো বিপদ। শুভানুধ্যায়ীদের একজন এক ব্যাংলার জ্যোতিষী এনে হাজির। শুরু হল কবির কোষ্ঠী বিচার। অতঃপর গভীর গণনা-গবেষণাজাত রায়, যাত্রা অশুভ। পশ্চিমে যাত্রা করলে প্রত্যাবর্তনের পথে খাড়া হয়ে

দাঁড়িয়ে আছে সম্ভাবনাহীন শূন্যতা।
কেদারনাথকে ডেকে কবি জানিয়ে দিলেন :
ইরান-টিরান আর হলো না, দেখ পূবের রবি
পশ্চিমে অস্ত যাবে এভাবে তা আমি চাই
না। আমি ঐ গঙ্গাতীরেই যাতে শেষযাত্রা
করতে পারি, সেইটেই চাই।
সেটাও যদি বা মেটানো গেল, তখনো ঝুলছে
আর এক জট-পাকানো সমস্যা।
প্লেনে একসঙ্গে তুজনের বেশি যেতে পারবে
না শুনে বিরক্ত কবি জানিয়ে দিয়ে-ছিলেন
তাঁর অসম্মতি। হঠাৎ খবর এল, তাঁরা পাঁচজন
যাত্রীকে নিয়ে যেতে পারে তুটো আলাদা
প্লেনে। সেইভাবেই স্থির হল কর্মসূচী। কেদারনাথ
৪ এপ্রিলের প্লেনে আগে গিয়ে ব্যবস্থা করবেন
কবির থাকা-খাওয়া ইত্যাদির ব্যাপারে।
আর কবি প্রতিমা দেবী ও অমিয় চক্রবর্তীর
সঙ্গে রওনা দেবেন ১১ এপ্রিলের প্লেনে।
শেষপর্যন্ত কবির পারস্য-যাত্রার পথের সব
কাঁটা নির্মূল।
পারস্য কবিকে কেন টানতে চেয়েছিল এতখানি
কাছে, কেনই বা কবিকে নিয়ে পারস্য-বাসের
দিনগুলোয় অতখানি রাজকীয় সমারোহময়
সম্বর্ধনা। তার একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন কেদারনাথ।

১। ‘প্যান-মুশলিম’ আন্দোলন নিভে গিয়ে আর্য-ইরান মনোভাবের বিকাশ। সেই কারণেই ভারতীয় আর্য-ভ্রাতার গৌরবে পারস্য নিজেদের মনে করছে সম্মানিত।

২। ভারত আর ইরানের মধ্যে বহু যুগব্যাপী সম্পর্কের নিবিড়তা। মধ্যযুগে ঘটেছে যে কৃষ্টি-বিনিময়, ছু-দেশের স্মৃতিতেই তা জীয়ন্ত। কিন্তু সম্বন্ধের সূত্রপাত আরো অনেক অতীতে। মাটির ভিতরকার গহ্বর থেকে মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ে প্রত্ন-নিদর্শন যে-সব, তার নকশায় দু-দেশের আত্মীয়তার ছাপ একেবারে খোদাই করা। যেমন দুর্দশায়, তেমনি সমৃদ্ধিতে আর্য জাতির এই দুই শাখার অতীত যেন একসূত্রে গাঁথা।

রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাবনাতেও মিশে আছে ঐ ইণ্ডো-এরিয়ান ভ্রাতৃত্বের নিবিড়বোধ।

“এদের কাছে আমি শুধু কবি নই, আমি প্রাচ্য কবি। সেই জন্যে এরা অগ্রসর হয়ে আমাকে সম্মান করতে স্বভাবত ইচ্ছা করেছে, কেননা সেই সম্মানের ভাগ এদের সকলেরই। পারসিকদের কাছে আমার পরিচয়ের আরও একটু বিশিষ্টতা আছে। আমি ইণ্ডো-এরিয়ান। প্রাচীন ঐতিহাসিক কাল থেকে আরম্ভ করে

আজ পর্যন্ত পারস্যে নিজেদের আর্য-অভিমান
বোধ বরাবর চলে এসেছে, সম্প্রতি সেটা যেন
আরও বেশি করে জেগে ওঠার লক্ষণ দেখা
গেল। এদের সঙ্গে আমার রক্তের সম্বন্ধ।
তারপরে এখানে একটা জনশ্রুতি রটেছে যে,
পারসিক মরমিয়া কবিদের রচনার সঙ্গে
আমার লেখার আছে সাজাত্য।"
আবেকবার পররাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রীর ভাই
ফেরুঘির সঙ্গে আলোচনায়—"আপনাদের
পূর্বতন সুফীসাধক কবি ও রূপকার যাঁরা আমি
তাঁদেরই আপন, এসেছি আধুনিক কালের
ভাষা নিয়ে।"
ইরানের বিধানসভার জনৈক সদস্যের সঙ্গে
আলোচনায় তুললেন পারসি বা ফার্সি ভাষার
কথাও, বাংলাভাষার সঙ্গে যার ওতপ্রোত
মেশামেশি।
"Going further back one discovers
that at one time the Bengali
language fieely borrowed words
from your vocabulary which we
use now without knowing their
origin, when you find this, you
must know that something of

your culture flows through our daily life, for words are merely symbols of thoughts and attitudes which they represent. Even before the Mohamedan rule in India, there was active cultural interchange between india and Iran, in our classical art and literature direct traces of this are to be discovered."

পারস্যেই কবির সঙ্গে বিখ্যাত পুরাবশেষবিৎ জর্মান ডাক্তার হর্টজফেল্ট্ এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। কবির ভক্ত তিনি, বার্লিনে বক্তৃতা শুনে। তাঁর কাছ থেকেই জানা, দিগ্বিজয়ী দারিয়ুসের প্রাসাদ পার্সিপোলিসের ভগ্নাবশেষের মধ্যে রয়েছে এমনসব সেগুনকাঠ যা ভারতবর্ষ থেকে আনা। ঐ অধ্যাপকই মাটি খুঁড়ে-পাওয়া নকশা-কাটা ডিমের খোলার পাত্র দেখিয়েছিলেন কবিকে। সে নকশা মহেঞ্জোদারোর নকশার স্বগোত্র।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও ইরানী আর্যদের পারস্যে পা-দেওয়ার সুদূর ঐতিহাসিক যুগ থেকে ভারত-পারস্য সম্পর্কের সূত্র খুঁজতে খুঁজতে চলে এলেন পারস্যের প্রথম অদ্বিতীয় সম্রাট

বিখ্যাত সাইরসের কাছে, যাঁর প্রকৃত নাম খোরার্স।
তিনি যে সমস্ত পারস্যকে এক করলেন তা
নয়, সেই পারস্যকে এমন এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের
চূড়ায় অধিষ্ঠিত করলেন সে যুগে যার তুলনা
ছিল না। এই বীরবংশের এক পরম দেবতা
ছিলেন অহুরমুদা। ভারতীয় আর্যদের বরুণদেবের
সঙ্গেই তাঁর সাজাত্য।

পারস্য-ভ্রমণের দিনগুলোয় কবি এইভাবেই
নিয়ত আবিষ্কার করে চলেছেন নিজেকে,
নিজের দেশকে। ভারতীয় রবীন্দ্রনাথ কতখানি
পারসিক রবীন্দ্রনাথ, তাও যেন উদ্ঘাটিত
হয়ে চলেছে ক্রমাগত। ক্রমশ নিশ্চিত হয়ে
উঠছেন এই সিদ্ধান্তে যে, একদিন এটাও ছিল
তাঁর আরেক বাসস্থান। হাফেজের সমাধির
পাশে বসে মনে পড়ে গেল তাই :

"আমরা দুজনে একই পানশালার বন্ধু,
অনেকবার নানা রসের পেয়ালা ভরতি করেছি।
আমিও তো কতবার দেখেছি আচারনিষ্ঠ
ধার্মিকদের কুটিল ভ্রূকুটি। তাঁদের বচনজালে
আমাকে বাঁধতে পারেনি। আমি পলাতক,
ছুটি নিয়েছি অবাধ প্রবাহিত আনন্দের হাওয়ায়।
নিশ্চিত মনে হল, আজ কত-শত বৎসর পরে
জীবন-মৃত্যুর ব্যবধান পেরিয়ে এই কবরের

পাশে এমন একজন মুসাফির এসেছে যে মানুষ হাফেজের চিরকালের জানা লোক।"

২

"আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা হাফেজের কাব্যামৃত পান করিয়া নবজন্ম লাভ করিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাবে আত্মহারা হইয়া জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রজনীতে হাফেজের কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে নৃত্য করিয়াছিলেন, সঙ্গীরা অনেক কষ্টে তাঁহাকে খুঁজিয়া পায়। আমাদের সে-যুগ আর এ-যুগ-কত-ব্যবধান! তবু বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত পরলোকগত কবি সত্যেন্দ্রনাথের পুস্তক সংগ্রহের মধ্যে মূল পারসিক ভাষায় হাফেজের কাব্যমালা আর কষ্টেলো প্রণীত The Rose garden of Parsia দেখিয়া মনে করা অসঙ্গত নয় যে, আধুনিক যুগের সত্যেন্দ্রনাথও হাফেজের ভক্ত ছিলেন।"

প্রবন্ধের নাম হাফেজ। লেখক, প্রিয়রঞ্জন সেন। প্রকাশক, প্রবাসী। সাল, ১৩৩৯।

ঐ প্রবন্ধেরই এক অংশে লেখকের প্রত্যাশা ঘুরে গেছে রবীন্দ্রনাথের দিকে।

"যিনি আমাদের দেশের সাহিত্যে ও সাধনায়

হাফেজের স্থান কোথায় তাহা দেখাইয়া দিবেন, তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইবেন সন্দেহ নাই। আশা করা যায়, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জীবনের সায়ং সন্ধ্যায় পারস্যের সেই অতীত কবিপ্রাণের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া গৌড়জনের জন্য অভিনব সুধাভাণ্ড পুনরায় বিতরণ করিতে থাকিবেন।"

প্রবাসীর যে-সংখ্যায় প্রিয়রঞ্জন-এর এই প্রবন্ধ, সেই সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের পারস্য-ভ্রমণের অভিজ্ঞতার প্রথম পর্ব 'পারস্য-যাত্রা'। অভিজ্ঞতার পরবর্তী পর্ব 'পারস্য-ভ্রমণ' নাম নিয়ে ছেপে বেরোয় বিচিত্রায়, ধারাবাহিকভাবে। প্রিয়রঞ্জন যা প্রত্যাশা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের পারস্য-ভ্রমণের কাহিনী তার কতখানি মিটিয়েছিল সে প্রশ্নকে পাশে সরিয়ে আমরা এখন কুড়িয়ে জড়ো করতে পারি পারসিক কবিদের প্রসঙ্গে এবং বিশেষ করে হাফেজ সম্পর্কে কবির উক্তি আর উপলব্ধিমালা, তাঁর ঐ ভ্রমণকাহিনীর প্রকাশিত অপ্রকাশিত নানা রূপ-রূপান্তর ছাড়াও ভাষণ-সম্ভাষণ, সাক্ষাৎকার জাতীয় রচনাকণা থেকেও। পারসিক কবিদের সম্পর্কে তাঁর যাবতীয় উচ্চারণ এক জায়গায় জড়ো করা হয়ে গেলে আমরা বুঝে নিতে পারবো

কেন প্রিয়রঞ্জন শুধুমাত্র হাফেজ প্রসঙ্গেই উন্মুখ আগ্রহে ঘুরে তাকিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের দিকে। যেন তিনি আগাম জেনে গিয়েছিলেন যে, পারসিক কবিদের মধ্যে হাফেজই যেহেতু তাঁর আবাল্য পরিচিত, হাফেজের কবিতার ধূপগন্ধ ঘনিষ্ঠ পিতৃ-সান্নিধ্যে লালিত শৈশব থেকেই তাঁর নিশ্বাসের-প্রশ্বাসের বাতাসের সঙ্গে মিলে-মিশে যেহেতু একাকার, অতএব তাঁর অনেক কথার নক্ষত্র-দীপ্তির মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল ধ্রুবতারাটি হয়ে উঠবেন হাফেজই। হাফেজের সঙ্গে তাঁর অন্তর্স্বভাবের খানিকটা অন্তরঙ্গ মিলের খবরও যেন জানা ছিল প্রিয়রঞ্জনের। হাফেজের এবং রবীন্দ্রনাথের কবিকণ্ঠে তিনি শুনতে পেয়েছিলেন অন্তরঙ্গ এক ঐক্যতানের সুরও।

"হাফেজ ছিলেন কবি। তিনি দার্শনিক ছিলেন না, অর্থাৎ জগৎ সম্বন্ধে, জাগতিক সমস্যা সম্বন্ধে, জীবনমৃত্যুর রহস্য সম্বন্ধে তাঁহার যে জ্ঞান, যে ধারণা, তাহা যুক্তি দিয়া বিশ্লেষণ দ্বারা সত্যান্বেষী দার্শনিকের মত বিধিবদ্ধভাবে লিখিয়া যান নাই, অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন, ভক্তিরসে রসিক ভারতীয় কবিদের মতো তাহা কবির অমর সঙ্গীতে ফুটিয়া

উঠিয়াছে, যে কথা রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলিতে বলিয়াছেন :

গান দিয়ে যে তোমায় খুঁজি বাহির মনে
চিরদিবস মোর জীবনে।
গান দিয়ে হাত বুলিয়ে বেড়াই এই ভুবনে।"

রবীন্দ্রনাথের চেতনায় পারসিক কবিদের ছায়া কতখানি গভীর সেদিকে তাকানো যাক এবার। অর্থাৎ এবার সংকলন করা যাক পারস্থ ভ্রমণের ইতিহাস থেকে সেদেশের কবিদের সম্পর্কে তাঁর সশ্রদ্ধ সব স্বগতোক্তি।

১। "শিরাজের গভর্ণর আমাকে সমারোহ করে নিয়ে গেলেন এক বড়ো বাড়িতে সভাগৃহে। কার্পেট-পাতা মস্ত ঘর। দুই প্রান্তের দেয়াল-বরাবর অভ্যাগতেরা বসেছেন, তাঁদের সামনে ফলমিষ্টান্ন সহযোগে চায়ের সরঞ্জাম ছোট ছোট টেবিলে সাজানো। এখানে শিরাজের সাহিত্যিক দল ও নানা শ্রেণীর প্রতিনিধিরা উপস্থিত। শিরাজের নাগরিকদের হয়ে একজন যে অভিবাদন পাঠ করলেন তার মর্ম এই—শিরাজ শহর দুটি চিরজীবী মানুষের গৌরবে গৌরবান্বিত। তাঁদের চিত্তের পরিমণ্ডল তোমার চিত্তের কাছাকাছি। যে উৎস থেকে তোমার বাণী উৎসারিত সেই উৎসধারাতেই এখানকার দুই

কবিজীবনের পুষ্পকানন অভিষিক্ত। যে সাদীর দেহ এখানকার একটি পবিত্র ভূখণ্ডতলে বহু শতাব্দীকাল চিরবিশ্রামে শয়ান তাঁর আত্মা আজ এই মুহূর্তে এই কাননের আকাশে উত্থিত, এবং এখনি কবি হাফেজের পরিতৃপ্ত হাস্য তাঁর স্বদেশবাসীর আনন্দের মধ্যে পরিব্যাপ্ত।

আমি বললেম, যথোচিতভাবে আপনাদের সৌজন্যের প্রতিযোগিতা করি এমন সম্ভাবনা নেই। কারণ, আপনারা যে ভাষায় আমাকে সম্ভাষণ করলেন সে আপনাদের নিজের, আমার এই ভাষা ধার করা। জমার খাতায় আমার তরফে একটি মাত্র অঙ্ক উঠল, সে হচ্ছে এই যে, আমি সশরীরে এখানে উপস্থিত। বঙ্গাধিপতি একদা কবি হাফেজকে বাংলায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তিনি যেতে পারেননি। বাংলার কবি পারস্যাধিপের নিমন্ত্রণ পেলে, সে নিমন্ত্রণ রক্ষাও করলে এবং পারস্যকে তার প্রীতি ও শুভকামনা প্রত্যক্ষ জানিয়ে কৃতার্থ হল।"

২। "অবশেষে হাফেজের সমাধি দেখতে বেরলুম। নূতন রাজার আমলে এই সমাধির সংস্কার চলছে। পুরনো কবরের উপর আধুনিক কারখানায় ঢালাই করা জালির কাজের একটা মণ্ডপ তুলে দেওয়া

হয়েছে। হাফেজের কাব্যের সঙ্গে এটা একেবারেই খাপ খায় না। লোহার বেড়ায় ঘেরা কবি-আত্মাকে মনে হল যেন আমাদের পুলিশ রাজত্বের অর্ডিনান্সের কয়েদী।

ভিতরে গিয়ে বসলুম। সমাধিরক্ষক একখানি বড়ো চৌকো আকারের বই এনে উপস্থিত করলে। সেখানি হাফেজের কাব্যগ্রন্থ। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, কোনো একটি বিশেষ ইচ্ছা মনে নিয়ে চোখ বুজে এই গ্রন্থ খুলে যে কবিতাটি বেরোবে তার থেকে ইচ্ছার সফলতা নির্ণয় হবে। কিছু আগেই গবর্ণরের সঙ্গে যে বিষয় আলোচনা করেছিলুম সেইটেই মনে লাগছিল। তাই মনে মনে ইচ্ছা করলুম ধর্মনামধারী অন্ধকার প্রাণান্তিক ফাঁস থেকে ভারতবর্ষ যেন মুক্তি পায়। যে পাতা বেরোল তার কবিতাকে দুই ভাগ করা যায়। ইরানী ও কয়েকজনে মিলে যে তর্জমা করেছেন তাই গ্রহণ করা গেল। প্রথম অংশের প্রথম শ্লোকটি মাত্র দিই। কবিতাটিকে রূপকভাবে ধরা হয়, কিন্তু সরল অর্থ ধরলে সুন্দরী প্রেয়সীই কাব্যের উদ্দিষ্ট।

প্রথম অংশ: মুকুটধারী রাজারা তোমার মনোমোহন চক্ষুর দাস, তোমার কণ্ঠ থেকে যে সুধা নিঃসত হয় জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমানেরা তার দ্বারা

অভিভূত। দ্বিতীয় অংশ : স্বর্গদ্বার যাবে খুলে, আর সেই সঙ্গে খুলবে আমাদের সমস্ত জটিল ব্যাপারের গ্রন্থি, এও কি হবে সম্ভব? অহংকৃত ধার্মিক নামধারীদের জন্যে যদি তা বন্ধই থাকে তবে ভরসা রেখো মনে ঈশ্বরের নিমিত্তে তা যাবে খুলে।

বন্ধুরা প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরের সঙ্গতি দেখে বিস্মিত হলেন।”

৩। “প্রকৃতিকে নিমন্ত্রণের ভার বসন্ত ঋতুর পরে। তার সুগন্ধ পুষ্পগন্ধে, পাখির গানে সেই নিমন্ত্রণ। তার আহ্বান স্বদেশী বিদেশী-নির্বিশেষে, তার বিশ্বভাষা তর্জমা করতে হয় না। কবিরা বসন্ত ঋতুর প্রতীক। তারা আপন দেশ আপন কালের মধ্যে থেকে সর্বদেশ সর্বকালকে আমন্ত্রণ করে। একদিন দূর থেকে পারস্যের পরিচয় আমার কাছে পৌঁছেছিল। তখন আমি বালক। সে পারস্য ভাবরসের পারস্য, কবির পারস্য। তার ভাষা যদিও পারসিক তার বাণী সকল মানুষের। আমার পিতা ছিলেন হাফেজের অনুরাগী ভক্ত। তাঁর মুখ থেকে হাফেজের কবিতার আবৃত্তি ও তার অনুবাদ অনেক শুনেছি। সেই কবিতার মাধুর্য দিয়ে পারস্যের হৃদয় আমার হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল।”

৪ । "I have visited Saddi's tomb ; I have sat beside the resting place of Hafiz and intimately felt his touch in the glimmering green of your woodlands, in blossiming roses. The morning sun coming through the iron lattice work wrote its shadow scripts over his tomb ; it was the same sun that lighted up the face of his beloved centuries ago.
It fell upon my forehead with the memory of an eternal love episode in which we all seemed to have taken part."
৫ । "I had my first introduction to Hafez through my father who used to recite his verces to me. They seemed to me like a greeting from a far away poet who was yet near to me."
৬ । "Yes, the path was open for me before I was born. As a matter of fact in our home in Bengal the

spirit of Iran was a living
influence when I was a child.
My revered father and my
elder brothers were deeply
atached to Persian literature
and art."

৩

বাংলা ভাষায় পার্শি শব্দের মিশেল যে কতখানি,
সেটা গবেষণা-যোগ্য বিষয়। তবে মিশলের
পরিমাণ যে নিতান্ত অল্প হওয়ার নয়
তার প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে
কয়েক শতাব্দী আগে ছড়ার সুরে বাঙালী
গৃহবধূদের আন্তরিক প্রার্থনা :
'আর্শি, আর্শি, আর্শি,
সোয়ামী শিখুক ফার্সি।'
তখন ফার্সি না জানলে রাজদরবারে চাকরী আর
চাকরিতে পদোন্নতি অসম্ভব। ক্লাইভ-হেস্টিংসের
রাজত্বের সময়ও কলকাতায় ফার্সির একাধিপত্য।
সেটাই যেন রাজভাষা। এমনকি মুন্সী রেখে
ইংরেজ-শাসকদের শিখতে হতো এ-ভাষা।

আরও আশ্চর্য শেখাতেন কলকাতার হিন্দুরাও।
সে-জাতীয় হিন্দু শিক্ষকদের একজন তো আমাদের
দেশের ইতিহাসের একজন স্মরণীয় পুরুষ।
রামরাম বসু। যাঁর দ্বিতীয় নাম,
কেরী সাহেবের মুন্সী মুন্সীর মানে
সেই দেশীয় শিক্ষক, যিনি ফার্সি
আর হিন্দুস্থানীতে অভিজ্ঞ। ওয়েলেসলীর
আমলে কলকাতায় যখন ফোর্ট উইলিয়ম
কলেজ, তখনও ফার্সির শেখানোর বা
শেখার ব্যাপক আয়োজন।
ফার্সি জানা সবচেয়ে বেশি দরকার আইন-
আদালতের কাজে। কোর্ট অফ জাস্টিস-এর
কাজ চালাতে হিন্দুস্থানী আর ফার্সি।
কালেকটার আর রেভিনিউ আর
কাস্টমস আর সল্ট এজেন্ট
ইত্যাদির কাজ চালাতে বাংলা।
ফোর্ট উইলিয়ম ১৮০০-য়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
তার অনেক পরের মানুষ। সংস্কৃত বেদ
উপনিষদ তাঁর জীবন নয় শুধু,
রক্তমাংসের সঙ্গেও জড়ানো।
অথচ ফার্সিতেও সমান দখল। ফার্সিকেও
মাতৃভাষার মতো ভালোবাসাবাসি।
যেন বেদ-উপনিষদ থেকে তিনি

সন্ধান পেতেন আত্মশুদ্ধির আর ফার্সি
কবিতা, বিশেষ করে হাফেজ থেকে,
সেই আত্মারই শ্রী। যেন মননের জন্যে বাংলা
আর সংস্কৃত আর মনের জন্যে ফার্সি।
প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'আমাদের ভাষা সংকট'
প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছিলেন-'মুসলমান
যুগে কত ফরাসি ও আরবি শব্দ যে
বাংলা হয়ে গেছে তা কি আর বলা
প্রয়োজন? আমরা হচ্ছি কৃষিজীবী জাত,
অথচ 'জমি' থেকে 'ফসল' পর্যন্ত
কৃষি সংক্রান্ত প্রায় সকল কথাই হয় ফারসি নয়
আরবি। আর জমিদারি সংক্রান্ত সকল কথাই
ঐ আরবি-ফারসির দান, ও-ভাষার ভিতর
সংস্কৃতের লেশমাত্র নেই। আমাদের
কর্মজীবনের যা ভিত্তি, অর্থাৎ
দেশের মাটি, তারও নাম জমি....
তারপর আমাদের কর্মজীবনের যা চূড়া, অর্থাৎ
আইন আদালত, তার ভাষাও আগাগোড়া
আরবি ফারসি। আর্জি থেকে রায়
ফয়সালা পর্যন্ত মামলার আদ্যোপান্ত
সকল কথাই বাংলা ভাষাতে
মুসলমানের দান। ইংরেজরা আজকাল ডিক্রি
দেন বটে। কিন্তু তা 'জারি' করতে হলেই

ইংরেজি ছেড়ে ফারসির শরণাপন্ন হতে হয়।
একথা যে সত্য, তা যে-কোনো মোক্তারি সেরেস্তার
আমলা হলপ করে বলবে।”

৪

১৯২৭। আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর।
রবীন্দ্রনাথ বেরিয়েছেন ভারতের
দ্বীপময় প্রতিবেশী দেশগুলো দেখতে।
যাবেন মালয়ে, যবদ্বীপে,
বলিদ্বীপে আর শ্যামদেশে। সঙ্গে সহযাত্রী
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
চলতে চলতে জাহাজ এসে থামল সিঙ্গাপুরে।
প্রথম তিনদিন কবিকে অতিথি হতে হল
লাটভবনের। তে-রাত্তির পেরোতেই
সিঙ্গাপুরের শ্রীযুক্ত মোহম্মদ আলী
নামাজীর দু-হাত বাড়ানো আমন্ত্রণ।
সিঙ্গাপুর থেকে আট মাইল দূরে
সিগলাপ্। সেখানে সমুদ্রের ধারে সাদা বালির
উপরে, নারকেল বীথির ঘন-ছায়ার নীচে
তাঁর বাগান বাড়ি। কবির জন্যে সেই
আলো-হাওয়াময় আবাসই নির্বাচিত।

বাড়ির পিছনে তাজা ঘাসের ছোট
মাপের ময়দান। তার পিছনেই
সমুদ্র। তার ওপারে ছোট ছোট দ্বীপ। দ্বীপের
ওপারে আকাশ। আকাশের গায়ে
হেলান দিয়ে দাঁড়ানো নীল সব পাহাড়।
কবিকে থাকার জন্যে বাড়িই দেননি শুধু,
দিয়েছেন প্রকাণ্ড খোলা বারান্দা।
দিয়েছেন গোসলখানার সঙ্গে
সুস্বাদু খাদ্য রচনার রাঁধুনি। ঘুরে বেড়ানোর
প্রয়োজনে সর্বক্ষণের গাড়ি। সেবা-যত্নের জন্যে
একাধিক পর্যবেক্ষক।
নামাজী ইরানের লোক, পারস্যে বাড়ি।
ছেলেবেলাতেই দেশত্যাগী হয়ে ভারতে।
ব্যবসা করতেন মাদ্রাজে।
সেখান থেকেই সিঙ্গাপুরে।
ব্যবসার বাবদেই বিত্তবান। এখন সিঙ্গাপুরের
একজন স্বনামধন্য। বয়স ষাট। স্ত্রী ছাড়া
আট মেয়ে, চার ছেলেকে নিয়ে সংসার। সভ্য-
সংস্কৃত-শিক্ষিত পরিবার।
"যেদিন আমরা সিঙ্গাপুর থেকে বিদায় নিই,
সেদিন শহরে কবির আর তাঁর দলের
একটা মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল।
আমরা সকলে সেখানে গিয়েছিলুম।

তুটোর সময় সেখানকার খাওয়ার ব্যাপার চুকল। নামাজী মহাশয় তাঁর শহরের বাড়িতে কবিকে নিয়ে গেলেন, তুটো থেকে চারটে তুই ঘণ্টা তিনি সেখানে বিশ্রাম করবেন -তারপর চা খেয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে, সাড়ে চারটেয় মালাক্কা যাওয়ার জাহাজে উঠবেন।

....শহরের মধ্যে গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের আবাসভূমি একটি ধনাঢ্য পল্লীতে উঁচু এক টিলার উপরে শ্রীযুক্ত নামাজী মহাশয়ের প্রাসাদ। আমরা পৌঁছলে, তাঁর কাছে খবর যেতেই নামাজী মহাশয় স্বয়ং নীচে নেমে এলেন, বললেন যে কবি উপরে আছেন ; তাঁর বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে কবি কথাবার্তা কইছেন, তাঁরা তাঁকে চা জলখাবার খাওয়াচ্ছেন। শ্রীযুক্ত নামাজী আমাদের তুজনে সঙ্গে চা খেলেন, আর তুরকম ফারসী মিষ্টান্ন খাওয়ালেন, তার মধ্যে একটি কি-একটা গাছের রসের সঙ্গে মধু মিশিয়ে তৈরি, চমৎকার খেতে লাগল সেটি। তারপর শ্রীযুক্ত নামাজী আমাদের উপরে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য। এঁরা পারস্যের লোক, সেখানে

এখনও কড়া পরদার রেওয়াজ। কিন্তু কবির
কথা স্বতন্ত্র, তিনি মহিমান্বিত লোকগুরু সকলেই
অসঙ্কোচে তাঁর কাছে আসতে পারে, এবং
এসেও থাকে। উপরে গিয়ে দেখলুম কবি
নামবার জন্যে তৈরি হয়েছেন, আর সেখানে
তাঁকে বিদায় দেওয়ার জন্য শ্রীযুক্ত নামাজীর
পত্নী তাঁর কন্যা আর পুত্রবধূরা ঘিরে আছেন,
বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরাও রয়েছে। শ্রীযুক্ত
নামাজী ফারসী ভাষায় আমার পরিচয় করিয়ে
দিলেন…মেয়েরা আবাসে ফরাসী আর
হিন্দুস্থানীতে, আর কবির সঙ্গে ইংরেজি
আর হিন্দুস্থানীতে কথা কইছিলেন।
এঁদের মধ্যে অসাধারণ সুন্দরী
কতকগুলি মেয়ে ছিলেন
শ্রীযুক্ত নামাজীর কন্যা ইংরেজি বেশ জানেন,
আমি ফারসী জানি শুনে আমায় ফারসীতে
জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কোথায় ফারসী।
পড়েছেন?—

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

এরপরেই কবির বিরুদ্ধে মেয়েদের অভিযোগ :
—'আপনি এতো বড় কবি, কিন্তু
ফারসী জানেন না, ফারসী হচ্ছে কবিতার
ভাষা, এ বড়ো দুঃখের কথা।

মনে মনে কি লজ্জিত হয়েছিলেন ঈষৎ ? ফারসি
না-জানার জন্যে এমন রূপসী সমাবেশে ?
কবির উত্তর :
—আমি তোমাদের দেশে যাবো,
আর তখন চেষ্টা করে দেখবো
যদি শিখতে পারি আর তখন আমার
এই অধ্যাপক বন্ধুর কাছ থেকে প্রথম
পাঠ নেবো।
"আমি স্মরণ করিয়ে দিলুম যে, কবির
পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একজন
উঁচুদরের ফারসী-দাঁ অর্থাৎ পারস্য-জ্ঞ
ছিলেন, আর হাফেজের কবিতা
তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। আর হাফেজের একটা
পদ, যে পদটিতে বাঙলা দেশের উল্লেখ আছে—
(পদটি এই—'শকর-শিকেন শওঅন্দ, হমা
তুতীআন্-ই-হিন্দ, জীন কুন্দ-ই-পারসী কি ব-
বাঙ্গালা-মী-রওয়দ। অর্থাৎ পারস্যের এই
যে শর্করা খণ্ড বাঙলা দেশে যাচ্ছে, ভারতের
শুক পক্ষীরা সেই শর্করাখণ্ড ভেঙে ভেঙে
আস্বাদ করবে,) সেটি স্মরণ করে তার ভাবটি
নিয়ে ইংরেজিতে বললুম :
—'নিশ্চয়ই, এ বড়ো আফশোষের কথা যে,
আমাদের এই কবি ভারতবর্ষের কাব্যোদ্যানের

একমাত্র শুকপক্ষী, তিনি পারস্যদেশের শর্করা
চাখতে পারলেন না।'

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

এরপরে কবি যখন সত্যিই পারস্যে,
তখন ক্ষণে ক্ষণে টের পেতে লাগলেন
পারস্য দেশের শর্করা চাখতে না
পেরে ক্ষতি করেছেন কতখানি।
সেখানকার সম্বর্ধনা সভায় বারে বারেই
সবিনয়ে এবং সবেদনায় উচ্চারণ
করতে হল এই কথাটা যে, ফারসি না
জানায় তিনি দুঃখিত। কতভাবে জানিয়েছিলেন
এই অনুতাপ, তার কিছু দৃষ্টান্তের
দিকে তাকানো যাক।
শিরাজ যাওয়ার পথে হঠাৎ কাজেমরুণ শহরে
কবির একরাতের বিশ্রাম। সেখানে অভ্যর্থনার
আয়োজন বাগ-এ-নজর নামের প্রাচীন আর
প্রসিদ্ধ উদ্যানে। কমলালেবু বাতাবিলেবু,
বাদাম, পিচ, আলু, খোবানি, আখরোট
গাছের সার দিয়ে ঘেরা।
মাঝখানে ফুলের বাগান। বাগানের
ভিতরে চারধারে জলের নালা, পাহাড়
থেকে প্রণালী কেটে আনানো। সেইখানেই
ভোজসভা। গাছের সারির নীচে ত্রিশ-চল্লিশ

হাত লম্বা টেবিল। তার উপরে থরে থরে সাজানো ফারসি খানাপিনা। খাওয়া-দাওয়ার পর স্থানীয় অধিবাসীরা নিজেদের লেপ-কম্বল অতিথিদের দিয়ে নিজেরা রাত জাগল আগুনের পাশে। অভিভূত রবীন্দ্রনাথ এই আন্তরিক আতিথেয়তার উত্তরে বললেন—"আমি আপনাদের সুন্দর ভাষা বলতে বা বুঝতে অক্ষম কিন্তু এই অভ্যর্থনা আমি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করছি। প্রাচীন পারস্যের আত্মার এই প্রকাশ।"

এরপর শিরাজের নাগরিক সম্বর্ধনার উত্তরে :

"যথোচিতভাবে আপনাদের সৌজন্যের প্রতিযোগিতা করি এমন সম্ভাবনা নেই। আপনারা যে ভাষায় আমাকে সম্ভাষণ করলেন সে আপনাদের নিজের, আমার এই ভাষা ধার করা।"

৫

রবীন্দ্রনাথ ফারসী জানতেন না এটা একশভাগ সত্যি। অথচ ইতিহাসের এমনই পরিহাস যে, যে-ভাষার অনভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি সচেতন, নিজের অপরিচয়ের দীনতা সম্বন্ধে অকপট, একদিন তাঁকেই জড়িয়ে পড়তে হল সেই ভাষা

সম্পর্কিত তুমুল বিতর্কে। সে-বিতর্কের শুরু প্রবাসী-র পাতায়। শিশুপাঠ্য বাংলা বইয়ে আরবি ফরাসির অস্বাভাবিক এবং প্রায় গায়ের জোরের প্রচলন প্রবণতার প্রচেষ্টাকে সমালোচনা করে প্রবাসীতে ছেপে বেরোয় 'মক্তব মাদ্রাসার বাংলা ভাষা' নামের একটা প্রবন্ধ। মাস কয়েক পরে রবীন্দ্রনাথও ঐ নামেই একটা প্রবন্ধ লেখেন প্রবাসীতে। বিষয় বা সমস্যা একই। সে প্রবন্ধের অংশবিশেষ :

"এমন কোনো সত্য ভাষা নেই যা নানা জাতির সঙ্গে নানা ব্যবহারের ফলে বিদেশী শব্দ কিছু না কিছু আত্মসাৎ করেনি। বহুকাল মুসলমানের সংস্রবে থাকাতে বাংলা ভাষাও অনেক পারসী শব্দ এবং কিছু কিছু আরবীও স্বভাবতই গ্রহণ করেছে। বস্তুত বাংলা ভাষা যে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই আপন, তার স্বাভাবিক প্রমাণ ভাষার মধ্যে প্রচুর রয়েছে। যত বড় নিষ্ঠাবান হিন্দুই হোক না কেন ঘোরতর রাগারাগির দিনেও প্রতিদিনের ব্যবহারে রাশি রাশি তৎসম ও তদ্ভব মুসলমানী শব্দ উচ্চারণ করতে কোনো সংকোচ বোধ হয় না। এমনকি, সে সকল শব্দের জায়গায় যদি সংস্কৃত প্রতিশব্দ চালানো যায় তাহলে পণ্ডিতী করা হবে

বলে লোকে হাসবে। বাজারে এসে সহস্র টাকার নোট ভাঙানো চেয়ে হাজার টাকার নোট ভাঙানো সহজ। সমনজারি শব্দের অর্ধেক অংশ ইংরেজি, অর্ধেক ফার্সি। এর জায়গায় 'আহ্বান প্রচার' শব্দ সাধু সাহিত্যের ব্যবহার করবার মত সাহস কোনো বিদ্যাভূষণেরও হবে না। কেন না, নেহাৎ বেয়াড়া স্বভাবের না হলে মানুষ মার খেতে তত ভয় করে না, যেমন ভয় করে লোকহাসাতে। 'মেজাজটা খারাপ হয়ে আছে', একথা সহজেই মুখ দিয়ে বেরোয় কিন্তু যাবনিক সংসর্গ বাঁচিয়ে যদি বলতে চাই মনের গতিকটা বিকল কিংবা বিমর্ষ বা অবসাদগ্রস্ত হয়ে আছে তবে আত্মীয়দের মনে নিশ্চিত খটকা লাগবে।.... নেশাখোরকে যদি মাদকসেবী বলে বসি তাহলে খামোকা তার নেশা ছুটে যেতে পারে, এমনকি সে মনে করতে পারে তাকে একটা উচ্চ উপাধি দেওয়া হল। বদমায়েসকে দুর্বৃত্ত বললে তার চোট তেমন বেশী লাগবে না। এই শব্দগুলো যে এত জোর পেয়েছে তার কারণ বাংলা ভাষার প্রাণের সঙ্গে এদের সহজ যোগ হয়েছে।

শিশুপাঠ্য বাংলা কেতাবে গায়ের জোরে

আরবিআনা পার্সিআনা করাটাকেই আচারনিষ্ঠ মুসলমান যদি সাধুতা বলে জ্ঞান করেন তবে ইংরেজি স্কুল পাঠ্যের ভাষাটাকেও মাঝে মাঝে ফারসি বা আরবি ছিটিয়ে শোধন না করেন কেন? আমিই একটা নমুনা দিতে পারি। কীটসের হাইপীরিয়ন নামের কবিতাটির বিষয়টি গ্রীসীয় পৌরাণিক, তথাপি মুসলমান ছাত্রের পক্ষে সেটা যদি বর্জনীয় না হয় তবে তাতে পার্সি-মিশেল করলে তা কিরকম শ্রীবৃদ্ধি হয় দেখা যাক:

Deep in the Saya-i-ghamagin of a
vale.
Far sunken from the nafa s-i-hayat
afza-i-morn.
Far from the atshim noon and
eav's one star.
Sat ba moo-i-safid Saturn Khamush
as a song.

জানি কোনো মৌলবী ছাহাব প্রকৃতিস্থ অবস্থায় ইংরেজি সাহিত্যিক-ভাষায় এ-রকম মুসলমানী করণের চেষ্টা করবেন না। করলেও ইংরেজী যাঁদের মাতৃভাষা এদেশের বিদ্যালয়ে তাঁদের এরকম ব্যাঙ্গীকরণে উচ্চাসন থেকে

তাঁদের মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল হবে।—"

এই প্রবন্ধের পরে প্রায় একই প্রসঙ্গে ঐ প্রবাসীতেই ছেপে বেরিয়েছিল আরও একটা প্রবন্ধ নাম, 'মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা'। মূলত সেটা একটা চিঠি, এম এ আজানকে লেখা। সেখানে লিখলেন :

"বাংলা ভাষায় সহজেই হাজার হাজার পারসী আরবী শব্দ চলে গেছে। তার মধ্যে আড়াআড়ি বা কৃত্রিম জেদের কোনো লক্ষণ নেই। কিন্তু যে-সব পারসী আরবী শব্দ সাধারণ্যে অপ্রচলিত অথবা কোনো একশ্রেণীর মধ্যেই বদ্ধ, তাকে বাংলাভাষার মধ্যে প্রক্ষেপ করাকে জবরদস্তি বলতেই হবে। হত্যা অর্থে খুন ব্যবহার করলে সেটা বেখাপ হয় না, বাংলায় সর্বজনের ভাষায় সেটা বেমালুম চলে গেছে। কিন্তু রক্ত অর্থে খুন চলেনি, তা নিয়ে তর্ক করা নিস্ফল।"

কাছাকাছি সময়ে আবুল ফজলকে লেখা চিঠিতে আবার পুনরাবৃত্তি ঘটল ঐ খুন-খারাবি-র।

"খুন-খারাবি শব্দটা ভাষা সহজেই মেনে নিয়েছে, আমরা যদি তাকে না মানি তবে তাকে বলব গোঁড়ামি। কিন্তু রক্ত অর্থে খুন শব্দকে ভাষা স্বীকার করেনি, কোনো বিশেষ পরিবারে বা সম্প্রদায়ে এই অর্থই অভ্যস্ত হতে পারে তবু সাধারণ বাংলা ভাষা বিমুখ হবে।"

খুন, রক্ত, এবং সাহিত্য নিয়ে কবির লড়াই অবশ্য শুরু হয়ে গিয়েছিল এর অনেক আগেই। শনিবারের চিঠি এবং সজনীকান্ত দাসের নেতৃত্বে বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার চলছে তখন। একসময়ে আক্রান্ত হলেন নজরুল। খুব আলগাভাবে দেখলে মনে হবে সজনীকান্তদের সঙ্গে সায় দিয়েই রবীন্দ্রনাথ নেমেছেন আধুনিকতার বিরুদ্ধে আক্রমণে। নজরুল যখন শনিবারের চিঠি-গোষ্ঠির ঠাট্টা-বিদ্রূপে বিপর্যস্ত, ঠিক তখনই কানে পৌঁছল, রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপর অসন্তুষ্ট, কেননা কবিতায় তিনি ব্যবহার করেন 'খুন'। আহত নজরুল ১৩৩৪, ১৪ পৌষের সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' নামে লিখলেন যে আক্রমণাত্মক জবাবী প্রবন্ধ, সেখানে রবীন্দ্রনাথও রক্তাক্ত।

''আজকের 'বাংলার কথায়' দেখলাম, যিনি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের পক্ষ হয়ে পঞ্চপাণ্ডবকে লাঞ্ছিত করবার সৈন্যাপত্য গ্রহণ করেছেন, আমাদের উভয়পক্ষের পূজ্য পিতামহ ভীষ্মসম সেই মহারথী কবিগুরু এই অভিমন্যুবধে সায় দিয়েছেন। মহাভারতের ভীষ্ম এই অন্যায় যুদ্ধে সায় দেননি বৃহত্তর ভারতের ভীষ্ম সায় দিয়েছেন —এইটেই এ-যুগের সবচেয়ে পীড়াদায়ক।

এই অভিমন্যুর রক্ষী মনে করে কবিগুরু আমায়ও বাণ নিক্ষেপ করতে ছাড়েননি। তিনি বলেছেন, আমি কথায় কথায় ‘রক্ত’কে খুন বলে অপরাধ করেছি।....”

আর এই নজরুলী আক্রমণের সুবাদেই আমাদের জানা হয়ে গেল আরবি বা ফরাসীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতার সমাচার। নজরুল লিখলেন :

‘এই আরবী-ফারসী শব্দ প্রয়োগ কবিতায় শুধু আমিই করিনি। আমার বহু আগে ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি করে গেছন।...কবিগুরু ইটালীকে উদ্দেশ্য করে এক কবিতা লিখেছেন। তাতে ‘উতারো ঘোমটা’ তাঁকেও ব্যবহার করতে দেখেছি। ‘ঘোমটা খোলো’ শোনাই আমাদের চিরন্তন অভ্যাস, ‘উতারো ঘোমটা’ আমি লিখলে হয়ত সাহিত্যিকদের কাছে অপরাধীরই হতাম। কিন্তু উতারো কথাটা যে জাতেরই হোক, ওতে এক অপূর্ব সঙ্গীত ও শ্রীর উদ্বোধন হয়েছে—ও জায়গাটায়, তা তো কেউ অস্বীকার করবে না। ঐ একটু ভালো শোনবার লোভেই ঐ একটি ভিনদেশী শব্দ

ব্যবহার করি। কবিগুরুও কতদিন
আলাপ-আলোচনায় এর স্বার্থকতার
প্রশংসা করেছেন।....কবিগুরু কেন,
আজকালকার অনেক সাহিত্যিক
ভুলে যান যে, বাংলার কাব্যলক্ষ্মীর অর্ধেক
মুসলমান। তারা তাঁদের কাছ থেকে টুপি আর
চাপকান চায় না, চায় মাঝে মাঝে বেহালার
সাথে সারেঙ্গীব সুর শুনতে, ফুলবনের কোকিলের
গানের বিরতিতে বাগিচায় বুলবুলির সুব।"
এই চাপান-উতোর বিতর্কে নজরুল আত্মরক্ষায়
একাকী। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে প্রমথ চৌধুরী।
'আত্মশক্তি'র ৩ ফেব্রুয়ারী সংখ্যায়
প্রমথ চৌধুরী প্রবন্ধ লিখলেন—
'বঙ্গসাহিত্যে খুনের মামলা'।
সে প্রবন্ধ আমাদের একদিকে যেমন জানিয়ে
দিল যে, রবীন্দ্রনাথ 'খুন' শব্দের ব্যবহার নিয়ে
যে কটাক্ষ হেনেছেন তা উদিত কোনো কবি
অর্থাৎ নজরুলকে উদ্দেশ্য করে নয়, উদীয়মান
কোনো কবিকেই, অন্যদিকে তেমনি জেনে গেলাম
আমরা যে নিজের 'বাল্মীকি প্রতিভা'-য় 'খুন'
শব্দটা ব্যবহার করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও।
অবশ্য কেঁদে খুন হওয়া সেটা, রক্তারক্তির নয়।
ফারসী ভাষার চর্চায় রবীন্দ্রনাথের আগ্রহের

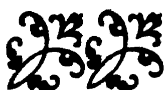
আরও খানিকটা গোপন তথ্য শেষপর্যন্ত
আমাদের যুগিয়ে দেন যিনি তিনি
রবীন্দ্রনাথই। প্রবাসীতে ছাপানো
'মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা ভাষা' নামের
প্রবন্ধের গায়ে গাঁথা ছিল একটা ফুটনোট।
গোপন তথ্যটি সেখান থেকেই পাওয়া।
"পারসী ভাষায় আমার অল্পবিস্তর পাণ্ডিত্য
আছে এমন অমূলক ভ্রমের সৃষ্টি করে
গর্ব করতে চাইনে। ধরা পড়ার পূর্বে
কবুল করছি যে পরের সাহায্য নিয়েচি।
মক্তবে ব্যবহার্য যে পাঠ্যপুস্তকের নমুনা
প্রবাসীতে দেখা গেল তা রচনা করতে
গেলে পরের সাহায্য নিতে হবে। আমি এক
মুসলমান বন্ধুর সঙ্গে কিছু কিছু পারসীর
আলোচনা করি। তিনি যে-পারসী জানেন
তা ভারতে প্রচলিত বিকৃত পারসী নয়,
এ ভাষা যাদের মাতৃভাষা, ভারতবর্ষের
বাইরে তাদের কাছ থেকে তাঁর পারসীর
বিদ্যা অর্জিত ও মার্জিত কিন্তু তিনিও
সূর্য অর্থে তাম্বু শব্দের প্রয়োগ
জানেন না।'
কীটসের কবিতার পারসী-করণের সূত্রেই এই
ফুটনোট। কবির মুসলমান বন্ধুটি কে

সেটা জানার জন্যে অবশ্যই উতলা
হয়ে উঠতে পারে আমাদের আগ্রহ।
কবি নিজে সে নামের ইঙ্গিত দিয়ে
যাননি কোথাও। না দিলেও অব্যর্থ
অনুমান যে মানুষটির দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেয়
আমাদের, তিনি মৌলানা জিয়াউদ্দিন।
লাহোরের মানুষ। বিশ্বভারতীতে
ছিলেন ইসলামিক বিভাগের অধ্যক্ষ।
অধ্যাপক পুরে-দাউদের সঙ্গে পারসী
ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন
রবীন্দ্রনাথের একাধিক কবিতা।
১৯৩৮-এ লাহোরেই কাটাতে গিয়েছিলেন
গ্রীষ্মের ছুটি। সেখানেই অকালমৃত্যু।
শান্তিনিকেতনে শোকসভার
ভাষণ ছাড়াও প্রিয় বন্ধু জিয়াউদ্দিনকে
নিয়ে কবিতাও লিখেছিলেন একটা
'নবজাতকে'। সে কবিতার নাম
'জিয়াউদ্দীন'। সে দীর্ঘ কবিতার প্রথম স্তবক—

"কখনো কখনো কোনো অবসরে
নিকটে দাঁড়াতে এসে,
'এই যে' বলেই তাকাতেম মুখে,
'বোসো' বলিতাম হেসে।

দু-চারটে হত সামান্য কথা,
ঘরের প্রশ্ন কিছু,
গভীর হৃদয়ে নীরবে বহিত
হাসি-তামাশার পিছু।"

শান্তিনিকেতনের শোকসভায় যে ভাষণ তার শেষ স্তবকের শুরু—'আমার নিজের দিক থেকে কেবল এই কথাই বলতে পারি যে এরকম বন্ধু দুর্লভ।'



চতুরঙ্গ, নতুন আলোয়

কখনো কখনো আমাদের মনেই থাকে না যে কবি রবীন্দ্রনাথ একজন ঔপন্যাসিকও। তাই আমাদের মতো কোনো কোনো পাঠকের অবাক লাগে যখন চোখে পড়ে এমন আলোচনা অথবা এমন বই যেখানে আলোচ্য বিষয় রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা অথচ, বিস্ময়করভাবে, তাঁর উপন্যাস অথবা ছবি অনুপস্থিত। তার মানে এই নয় যে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস এবং উপন্যাসের আধুনিকতা নিয়ে আলোচনা নিতান্তই বিরল। হয়তো তেমন করে ক্যাটালগ ঘাঁটলে ধরা পড়বে, এ বিষয়ে বইপত্রের সংখ্যা ধারণার চেয়ে বেশিই। সে-রকম বইপত্র আছে জেনেও যে আমাদের নেই-নেই ভাবটা ঘোচে না তার কারণ একটাই। বাংলার সমালোচনা সাহিত্যের শিং-টা হরিণের মতো ডালপালাময় নয় কখনোই, বরং তার আদলটা গণ্ডারের একশৃঙ্গের সঙ্গেই অনেক বেশি

সাদৃশ্যময়। আর সে বাঁকা শিংটির মুখ যেদিকে ঘোরানো সেটা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুম আর পরীক্ষার খাতা। সাহিত্যের বা শিল্পের ক্ষেত্রে যখন উচ্চারিত হয় 'মর্ডার্ণ' অভিধাটি, তখন এবং তৎক্ষণাৎ নিজেদের স্থানকাল পার হয়ে আমরা পৌঁছে যাই এক আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের আওতায় যেন। পৃথিবীর সব শ্রেষ্ঠ প্রতিভারই জনক তাঁর স্বদেশ, জননী বিশ্ব ইতিহাস। আজকের মডার্ণ বা আধুনিক সাহিত্য ও শিল্প কীভাবে নিজস্ব স্থানকালের খোলা জানলার ধারে বসে পৃথিবীকে দেখে অথবা পৃথিবীকে প্রতিফলিত হতে দেয় নিজের ঘরের রোদে-ছায়ায়, তা হয়তো অনেকখানি জায়গা পেয়ে গেছে পাঠকের অভিজ্ঞতায়। কিন্তু সমালোচনা-সাহিত্যের পালে আধুনিকতার সেই হাওয়া লাগতে-লাগতেও রয়ে গেছে দ্বিধার দূরত্বে। আমাদের দেশের অ্যাকাডেমিক সমালোচকরা কিছুদিন আগে পর্যন্ত বুঝতেই পারতেন না যে, এদেশে বসে কেউ যদি গপ্পো লেখে, তার সঙ্গে বিদেশের বা বিশ্বের বা বিশ্ব সাহিত্যের কি সম্পর্ক। আবার এমন নয় যে বুঝতেন না একেবারেই। রবীন্দ্রনাথের কথাই ধরা যাক। যেখানে আলোচ্য বিষয় তাঁর কবিতা সেখানে তাঁরা বুঝতে পারতেন

ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, শেলী, কীটস্, বায়রন, টেনিসন, ম্যাথু আর্নল্ড এমন কি বের্গসঁ-র প্রসঙ্গ উত্থাপনের যৌক্তিকতা। যেমন নাটকের বেলায় মেটারলিঙ্ক। কিন্তু তাঁদেরই কারো কারো বৃহদায়তন গবেষণাগ্রন্থ কি আমাদের পৌঁছে দিতে পেরেছে এমন প্রত্যয়ের কাছাকাছি, যেখানে আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য যে বিশ্বসাহিত্যই নয় শুধু, তাঁর জীবিতকালের বিশ্বের আরো নানাবিধ ঐতিহাসিক আলোড়ন-আন্দোলনও অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারে তাঁরই উপন্যাসের আলোচনায়?

২

চার বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছিল একটা বই। নাম, 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস'। প্রচ্ছদে বড় হরফের এই দুটি শব্দের নীচে ছোট হরফে আরো দুটি শব্দ 'চেতনালোক ও শিল্পরূপ'। লেখক, সৈয়দ আকরম হোসেন। বেরোনোর চার বছর পরে পড়তে পেরে প্রথমেই মনে হল যথার্থই পরিশ্রমী আর মূল্যবান কাজ। ঠিক এভাবে এ-রকম কাজ খুব বেশি হয় নি আমাদের দু-বাংলায়। উজ্জ্বল ব্যতিক্রম কেবল দুটি। দেবেশ রায়ের 'রবীন্দ্রনাথের আদি গল্প'। আর শঙ্খ ঘোষের 'নির্মাণ ও সৃষ্টি'। সাহিত্য-

বিচারের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীই এই তিনটে বইকে মিলিয়ে দেয় একসূত্রে। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিবিচারে তাঁর সামাজিক, সংস্কৃতিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এমন-কি প্রয়োজনে আধ্যাত্মিক পটভূমিকে খুঁটিয়ে দেখা, এবং সেই পটভূমি থেকে নিজের প্রগতির প্রয়োজনে কি ছেঁকে নিচ্ছেন তিনি শিকড়ের সমৃদ্ধির পানীয় হিসেবে, আর সেই সঙ্গে আগামী সময় ও সৃষ্টির পক্ষে অতীতের কি কি অব্যবহার্য্য তাকে চিহ্নিত করতে করতেই কীভাবে জড়িয়ে পড়েন আত্মনির্মাণের বিরতিহীন সংগ্রামে, সেটাকে চিনিয়ে দেওয়ার দিকেই এই তিন সমালোচকের দায়বদ্ধতা। জর্জ স্টেইনার তাঁর 'টলস্টয় অর ডস্টয়েভস্কি'-র এক জায়গায় চিনিয়ে দিয়েছিলেন দু-ধরনের সমালোচনা যার একটা 'compulsive craft of the reviewer'. অন্যটা 'meditative re-creative art of the critic'। এঁরা তিনজন দ্বিতীয় দফার সমালোচক। দেবেশ রায় তাঁর বইয়ের জন্যে বেছে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের আরম্ভের যুগ। আর শঙ্খ ঘোষের নিবিড় অনুসন্ধান তাঁর জীবনের অন্তপর্ব। সৈয়দ আকরম হোসেনের কাজ এঁদের দু জনের চেয়ে আরো কঠিন আর

দায়িত্বময়। কারণ, যদিও আলোচ্য বিষয় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসই শুধু, তবুও তাঁকে ঝুঁকে পড়তে হয়েছে আদি-অন্ত মিলিয়ে কবির সমগ্র জীবনের বিশাল ব্যাপ্তির দিকে। কেননা কখনো আমাদের তেমন করে মনে না পড়লেও কথাটা সত্যি যে কবি রবীন্দ্রনাথের সমান্তরালেই ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের অগ্রগতি। এক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে তুলনীয় হতে পারেন পৃথিবীর আর তিনটি প্রতিভা। ফরাসি হুগো, জার্মান গ্যেটে আর রুশ লারমনতেভ। এঁদের বাদ দিয়ে আর যাঁরা একই সঙ্গে কবি এবং ঔপন্যাসিক হিশেবে বিশ্বে পরিচিত এবং সমাদৃত, আগে কবি পরে ঔপন্যাসিকরূপেই তাঁদের ক্রমবিকাশ। সৃজনমগ্নতার ভোরবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথ গদ্যসচেতন। তাঁর প্রথম আত্মবিশ্বাসী আত্মপ্রকাশ গদ্যেই। আবার যখন কবিতার দিকে, কবি হয়ে ওঠার দিকে নিবিড়তর মনযোগ, তখনও কাহিনী প্রধান বিষয়ের ঘোর বাল্য-প্রণয়ের মতো ঘিরে রেখেছে তাঁর চেতনা-পরিধি। অর্থাৎ কবিতাতেও গল্প উপন্যাসের উপকরণ, নাটকের সংঘাত অন্তর্সংঘাত ও সংলাপ ঢুকে পড়তে চাইছে তাঁর রচনায়, অচেতন অগোচরে নয়, সচেতন অভিপ্রায়ের সমর্থনে। তাই জীবনের প্রথম সফল

কবিতার বই লেখার আগেই তাঁর লেখা হয়ে গেছে 'বনফুল' নামের কাব্যোপন্যাস, 'বাল্মীকি প্রতিভা' নামের গীতিনাট্য। তারপরই সরাসরি উপন্যাসে। ১৮৮৯-এই করুণা, করুণার চার বছর পরে বৌ ঠাকুরাণীর হাট। যখন করুণা লিখছেন বয়স তখন মোটে ষোলো-সতেরো। গ্যেটের প্রথম ট্রাজেডী, সদ্য শেক্সপীয়র অধ্যয়নের অভিভূত প্রেরণায়, বাইশ বছর বয়সে। প্রথম উপন্যাস যখন পঁচিশে পা। লারমনতেভের প্রথম কবিতা যে বছরে, তার তিন বছর পরে প্রথম অসমাপ্ত উপন্যাস। বয়স তখন কুড়ি। যে বছরে বেরোল প্রথম কবিতার বই, প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের আত্মপ্রকাশের বছরও সেটাই। ১৮৪০। তাঁর বয়স তখন ছাব্বিশ। হুগোর প্রথম কবিতার বই কুড়ি বছরে। পরের বছরেই প্রথম উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ ষোলো-সতেরো থেকে শুরু করে তাঁর উপন্যাসে পূর্ণচ্ছেদ টানলেন মৃত্যুর মাত্র সাত বছর আগে, 'চার অধ্যায়ে'। এ থেকেই অনুমেয়, উপন্যাস তাঁর জীবনের সমগ্রতাকে . জড়িয়েই।

সৈয়দ আকরম হোসেনের এই বইয়েরই 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের আলোচনার পিছনে টাঙানো ইতিহাস-পটের উপর চোখ বোলাতে বোলাতে

হঠাৎ ভিন্নতর অনুভবের হাল্‌কা একটা ঝিলিক খেলে যায় যেন ভাবনায়। যেন আমাদের নজর্‌টাকে ঘুরিয়ে দিতে চান তিনি অন্য এক অনুসন্ধানের দিকে। এখানে সমগ্র পটভূমি থেকে বেশ খানিকটা অংশ উদ্ধৃত না করলে টের পাওয়া যাবে না অনুসন্ধান-সূত্রের। "পঞ্চাশোর্ধ রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জুন ইংলণ্ডে পৌছান, সঙ্গে পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিন মাসের জন্যে তিনি যে ইংলণ্ডকে দেখেছিলেন, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে তার গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে বিপুল। রেনেশাঁসের মানববাদী প্রবর্তনা, ফরাসী বিদ্রোহজাত 'সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা' এবং শিল্প বিপ্লবের জনসুফল তখন নিঃশেষিত প্রায়। কৃষকজীবন বিপর্যস্ত, স্ফীত শ্রমিক শ্রেণী শোষণপীড়িত, মনুষ্যত্বের অবমাননাকর বস্তিজীবন ক্রমবর্ধমান, বিশাল বর্ধিত যন্ত্রকীর্ণ শহরে প্রবল বেগে মধ্যবিত্তশ্রেণী মনীষী সম্প্রদায়ের চিত্তভূমি ছিন্নভিন্ন। ধনবাদী সভ্যতার পাদপীঠ ইংলণ্ড সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে উদ্ধত, তার সভ্যতা অবক্ষয়িত, দারিদ্র অসত্য নীতিহীনতায় সাধারণ জীবন, মধ্যবিত্ত সমাজ বিপন্ন। ধনবাদী শ্রেণীর অর্থকরী যন্ত্রবেগের

পীড়নে সংবেদনশীল মানুষ হয়ে পড়েছি ছিন্ন, ক্ষুদ্র, একাকী, নিঃসঙ্গ, নৈরাশ্যে মজ্জমান ও অন্তর্মনস্ক। বিশাল ধনবাদী শক্তির ঘাত প্রতিঘাতে সৃষ্টিশীল ইউরোপীয় প্রতিভা ক্রমশ হয়ে ওঠে চেতনায় বসবাসকারী ; তারা আত্মসমর্পণ করে কোনো উচ্চাশার কাছে নয়, আত্মবিবরলালিত ভাব-মানসে। বার্গস ঁ-র 'Introduction to Metaphysics' (1904) গ্রন্থের প্রভাবে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ ঘোষণা করেন, 'life is not a series of gig-lamps symmetrically arranged ; life is a luminous[4] halo, a semitransperent envelop... ইউরোপীয় চিত্রশিল্প আন্দোলনে উল্লিখিত বিপর্যস্ত চেতনামগ্ন যুগবৈশিষ্ট্য আরো ব্যাপক ও স্পষ্ট। চিত্রশিল্পীদের প্রথাবিরুদ্ধ রূপতাত্ত্বিক তাৎপর্য সম্পর্কে হার্বাট রীডের বক্তব্য Exactitude is not truth is the basis of the whole of Modern period in art, but as a thesis it was first clearly formulated by Matisse and Faubes. Ganguin and the synthteist formulated a different thesis which we call symbolism : the work of

art is not expressive but representative, a correlative for feeling and not an expression of feeling.

এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে হল এই জন্যে যে, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ (১৮৮২-১৯৪১) স্পষ্টতঃই সাহিত্য-আন্দোলন ও চিত্রশিল্প-আন্দোলনকে পরস্পরিত করতে সচেষ্ট হন। লণ্ডনের গ্রাফ্‌টন আর্ট গ্যালারিতে ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পী সেজাঁ, মাতিস, ভ্যান গগ, পাবলো পিকাশো প্রমুখের চিত্রপ্রদর্শনীর (১৯১০-১২) ব্যবস্থাপক রোজার ফ্রাই-এর সঙ্গে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ জড়িত ছিলেন এবং এ সময়ের অনিবার্য ভূমিকার লক্ষ্য করেই সম্ভবত তিনি মন্তব্য করেন, on or about December 1910 human nature changed। এই তাৎপর্যবহ চিত্র প্রদর্শনী অব্যাহত থাকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত ; এর সমসাময়িক কালেই রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে পৌঁছান, এবং বসবাস করেন মূলতঃ চিত্রশিল্পী ও চিত্রসমালোচক উইলিয়ম রোদেনস্টাইনের সান্নিধ্যে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের প্রারম্ভেই, কলাবিদ্যার ছাত্র শরীর-তত্ত্বের শিক্ষক এবং মনোবিজ্ঞানের গবেষক উইলিয়ম জেমস্

(১৮৪২-১৯১০) মনস্তত্ত্বের নতুন প্রান্ত উন্মোচন করেন। "ব্যক্তিসত্তা এক অখণ্ড অবিভাজ্য চৈতন্যের বহিঃপ্রকাশ নয়; তার মাঝে অগনন ব্যক্তি, অগনন সত্তা, লক্ষ চৈতন্যবিন্দুর গোপন সঞ্চরণশীলতা বিদ্যমান। সময়ের কোনো এক মুহূর্তে সেই বিন্দুগুলো অকস্মাৎ জেগে ওঠে, কখনো দল বেঁধে, কখনো স্রোতাবেগের মতো পর পর।" জেমস তাঁর 'Principal of Psychology' (1890) গ্রন্থে লেখেন :

....Conciousness then does not appear to itself chopped up in bits,...Such words as 'chain' or 'train' do not describe it fitly as it presents itself in the first instance. It is nothing joined ; it flows. A 'river' or 'stream' are the metaphor by which it is most naturally describe. In talking of it hereafter, let us call it stream of thought, of consciousness or subjective life....

বস্তুত, পরিবর্তমান জীবনপ্যাটার্নে চিন্তায় চেতনায় ইংলণ্ডের 'ভাবুকসমাজ' যে সময় অস্থির, আত্মদীর্ণ অন্তর্মনস্ক; প্রতিভাবান তরুণ

সমাজ যখন অষ্টাদশ শতাব্দর কার্যকারণতত্ত্বে, ঊনবিংশ শতাব্দীর আদর্শবাদে আস্থা হারিয়ে তীক্ষ্ণ অনুভববেদ্যতা, সহজাত বৃত্তিও অন্তর্গত চেতনাপ্রবাহকে, নতুন মূল্যবোধও শিল্পাদর্শরূপে অনুধ্যানে অগ্রসরমান—রবীন্দ্রনাথ তখন ইংলণ্ডে, তাঁদের মর্মমূলে।"

এই বৃহৎ পটভূমিকে মনে রাখলে উত্তর খোঁজার দিকে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে উঠতে চায় আমাদের মনের একাধিক প্রশ্ন। আর 'চতুরঙ্গে'র দিকে তাকাতে ইচ্ছে করে নতুন চোখে। আকরম হোসেনেরও তাকানো উচিত ছিল। ঘর্মাক্ত শ্রমে এমন সার্বিক পটভূমি রচনা করেও, মেলাবার উৎসাহে মাতলেন না তিনি কবির উপরে এসবের প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার অন্বেষণে।

৩

এই গ্রাফটন প্রদর্শনীর কোনো প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ প্রভাব পড়েছিল কি রবীন্দ্রনাথের চেতনায়? উত্তর জানা নেই। উত্তর গড়ে তোলার মতো উপকরণ হাতের নাগালের বাইরে। তা সত্ত্বেও, এমন কি রবীন্দ্রনাথ নিজের চোখে প্রদর্শনীটি দেখবার সুযোগ পান নি এটা

মেনে নিয়েও, আমাদের পক্ষে এটা ভেবে নিতে যথেষ্ট অসুবিধে যে, লণ্ডনে থেকেও ঐ রকম একটা ঐতিহাসিক প্রদর্শনীর ব্যাপারে তিনি থেকে যাবেন পুরোপুরি অনভিজ্ঞ, প্রতিক্রিয়ার কোনো সংবাদই এসে পৌঁছবে না তাঁর কানে। এটা যে অসম্ভব হতে বাধ্য তার কারণ একাধিক।

১। তাঁর লণ্ডনের দিনগুলো ঘেরা ছিল শিল্পী-বন্ধু রোদেনস্টাইনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে। যে রোদেন-স্টাইন দেগা-র স্টুডিয়োয় ছাঁচে-ঢালাই করা অপ্সরা মূর্তি দেখে আকৃষ্ট হন ভারতশিল্পে, 'ভারতী'র পাতায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অল্প কয়েকটি রেখাচিত্র দেখেই মুগ্ধ বিস্ময়ে সেই 'রিমার্কেবল ড্রইংস'-এর মূল ছবিগুলো চেয়ে পাঠান ছাপিয়ে প্রকাশ করার স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহে, সেই রোদেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথকে দু-বছর ব্যাপী একটা প্রদর্শনীর বিষয়ে কোনো দিনই বলবেন না কোন কথা, আলোচনা হবে না একদিনও, এটা মেনে নিতে মনের সায় পাওয়া কঠিন। আবার, তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক, রোদেনস্টাইন কিছু বলেন নি। কিন্তু যে দীর্ঘ সময় তিনি লণ্ডনে ছিলেন তখন তার হাতে পড়ে নি এমন কোন দৈনিক-সাপ্তাহিক অথবা

মাসিক পত্রিকা, যেখানে আলোচিত হয়েছে ঐ প্রদর্শনী ? আলোচনা উত্তাল হওয়াটাই প্রত্যাশিত। কারণ ইংরেজ-সমাজের সামনে, রোজার ফ্রাই-এর উদ্যোগে, সেই প্রথম 'পোস্ট ইমপ্রেশনিস্ট' গোষ্ঠীর শিল্পীদের উপস্থিতি। আর রবীন্দ্রনাথ, যিনি পাশ্চাত্যের চিত্রকলা সম্পর্কে চির-আগ্রহী, জাপানের ছবি দেখে যিনি উত্তেজিত আবেগে, জোড়াসাঁকোর দক্ষিণের বারান্দার দুই প্রতিভাধর শিল্পী ভাইপোদের বিদেশে এসে চিত্রকলার জগতের কর্মকাণ্ড নিজেদের চোখে দেখে যাওয়ার নির্দেশ পাঠান চিঠিতে, যিনি বিশ্বভারতীর শিল্পীদের জন্যে সংগ্রহ করে আনেন আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পীদের ছবি এবং ছবির বই, যিনি স্টেলা ক্রামরিশকে ডেকে এনে অনুরোধ জানান আধুনিক শিল্পের ব্যাখ্যা-বিশেষণের, ক্যাণ্ডিনস্কির মূল ছবির প্রদর্শনী ঘটান যিনি শান্তিনিকেতনে, তাঁর পক্ষে এ রকম একটা প্রদর্শনীর বিষয়ে উদাসীনতা অকল্পনীয়।

২। রোদেনস্টাইন কিছু না বললেও, প্রদর্শনী সংক্রান্ত কোনো আলোচনা চোখে না পড়লেও, এই প্রদর্শনীর খবর তাঁর কাছে পৌঁছোনো উচিত ছিল অন্যভাবে, রোদেনস্টাইনের বাড়িতে,

রবীন্দ্রনাথের লণ্ডনবাসের দিনগুলোয় শুধু
সাহিত্যিকেরই আনাগোনা ছিল না।
নিশ্চয়ই আসা-যাওয়া ছিল তখনকার প্রবীণ
এবং নবীন দু-ধরনের শিল্পীদের। তাঁদের
আলোচনাও কবির কানে পৌছনো এবং তাঁকে
জিজ্ঞাসু করে তোলা স্বাভাবিক।
৩। গ্রাফটন প্রদর্শনী ছিল নিছক ছবির প্রদর্শনী
নয়। উদ্দেশ্য দু-মুখো। ফরাসী শিল্পের
সাম্প্রতিকতম পরীক্ষা-নিরীক্ষার তীব্র প্রাণস্পন্দন
থেকে ইংরেজি সাহিত্যের স্থবিরতা শুষে
নিতে পারে কতখানি নতুন রক্ত প্রদর্শনীর
উদ্যোক্তাদের অন্যতম অম্বিষ্ট সেটাও।
এর আগে, ১৮৮০ থেকে, ইংরেজি
কবিতায় পড়েছে 'মোনে'-র প্রভাব,
যেহেতু তিনি ইম্প্রেশননিষ্ঠ শিল্পীধারার নায়ক।
'ইমিডিয়েসি' আর 'সারফেস ইমপ্রেশন'
ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের এই দুটো মূলমন্ত্রের সঙ্গে
ইংরেজ কবিরা ইতিপূর্বেই পরিচিত। গ্রাফটন
প্রদর্শনীর প্রধান আকর্ষণ সেজান আগের ঐ
ধারণাকে যে ঈষৎ পাল্‌টে দিল, তা নিয়ে ইংরেজ
কবিদের মধ্যে তপ্ত আলোচনার আগুন এবং
ধোঁয়ার যে-কোনো একটাও কবি এবং কবিতা
অনুরাগী পরিবৃত্ত রবীন্দ্রনাথের কানের

কাছাকাছি পৌঁছবে না কোনোদিন, এও কি বিশ্বাসযোগ্য ?

পৌঁছতে যে পারেই, তার একটা সম্ভাবনার হদিশ আমাদের জানা। ১৯১৪-র আশ্বিন সংখ্যা 'প্রবাসী'-তে ছেপে বেরিয়েছিল সুকুমার রায়ের লেখা শিল্প বিষয়ক একটি প্রবন্ধ। নাম, 'শিল্পে অত্যুক্তি'। ১৯১২-র গ্রাফটন গ্যালারীর ঐ প্রদর্শনীর দর্শক হিসেবে য়ুরোপীয় আধুনিক চিত্রকলার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। তখন তিনি লণ্ডনে ছিলেন মুদ্রণশিল্পের ট্রেনিং-এ। সুকুমার রায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রবল ঘনিষ্ঠতা ও প্রীতির সম্পর্ক আমাদের জানা। সুতরাং এমন একটা সাড়া জাগানো প্রদর্শনীর বিষয়ে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা হবে না কোনোদিন, এ কি সম্ভব ?

১৯১৯-য়, ঐ প্রদর্শনীর সাত বছর পরে, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ তাঁর 'মডার্ণ ফিকশন' নামের প্রবন্ধে যা ঘোষণা করেছিলেন তা আকরম হোসেন-এর রচিত পটভূমি অংশে আমরা আগেই পড়েছি। তিনি জানিয়েছেন ঐ উক্তির পিছনে রয়েছে বার্গসঁ-র 'ইনট্রোডাকশন টু মেটাফিজিকস্' এর প্রভাব। কিন্তু প্রভাব পড়েছে

এমন দু জনের, চিন্তার জগতে ওলোট-পালোট
হাওয়া বইয়ে দিয়েছেন যারা ইতিমধ্যেই।
বেগর্স আর উইলিয়ম জেমস। যে ভার্জিনিয়া
উল্‌ফকে বলা যেতে পারে 'ষ্ট্রীম অফ
কনশাশনেস' আন্দোলনের নেত্রী,
আর যে 'ষ্ট্রীম অফ কনশাশনেস'
জয়েসে মূর্তিমন্ত, আর ডরোথি রিচার্ডসনের
উপন্যাসের আলোচনায় প্রথম ঐ বাক্যবন্ধটি
ব্যবহার করেছিলেন যে মে সিনক্লেয়ার, তাঁরা
সকলেই উইলিয়ম জেমস-এর কাছে কৃতজ্ঞ।
কারণ ধারণাটার, যা পরে হয়ে দাঁড়াল সাহিত্যের
জগতে একটা স্বীকৃত রীতি-পদ্ধতি, অঙ্কুর
জুগিয়েছিলেন তিনিই। ১৯১০-এর
প্রদর্শনী ইমপ্রেশনিজমের বিরুদ্ধে জেহাদ
ঘোষণার তাগিদেই গড়ে তোলা। আর ঐ
জেহাদের মধ্যে দিয়েই ব্লুমসবেরী গোষ্ঠী ইংরেজি
সাহিত্যের আগামীকালের সামনে টাঙিয়ে দিতে
চেয়েছিল বড় হরফের যে ফেস্টুন তাতে পরিষ্কার
পড়া যাচ্ছিল এই কথাটা যে, চিত্রকলার জগতে
ইমপ্রেশনিজম যা, সাহিত্যের জগতে সেটাই
ন্যাচারালিজম, এর থেকে মুক্ত হতে হবে। মুক্ত
হওয়ার পথপ্রদর্শক তো চোখের সামনেই,
সেজান।

রজার ফ্রাই সেজানকে সামনে রেখে আক্রমণ
হানলেন রাসকিনের দুর্ভেদ্য দুর্গে। শিল্পের জগত
থেকে রাসকিনের ঈশ্বর অথবা ধর্ম অথবা
নৈতিকতাকে নির্বাসনদণ্ড দিয়ে রজার ফ্রাই
জানিয়ে দিলেন সেজান অধ্যয়নের পরিণামে
তাঁর সদ্য-আবিষ্কৃত ধারণা—
"that art had begun to recover once
more the language of design,"
এমন কি ভুল ধরিয়ে দিলেন গ্যেটের সিদ্ধান্তেরও,
র‍্যাফেলের, Transfiguration' ছবির প্রসঙ্গে।
গ্যেটে, রজার ফ্রাই-এর ধারণায় আসলে
'coherence of the design' দেখে মুগ্ধ
হয়েই বলেছিলেন—
"Below, the suffering and the needy ;
above, the powerful and helpful—
—mutally dependend, mutually
illustrative." কিন্তু তাঁর মনে হয়েছিলে যে
ঐ মুগ্ধতার উৎসে রয়েছে কোনো নৈতিকতার
আবেগ।
আর ঐ সেজান-উপলব্দির ফলাফলে ভার্জিনিয়া
উল্‌ফ শিখে নিলেন তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতার
ভিতর থেকে কীভাবে ছেঁকে নিতে হবে
অভিজ্ঞতায় সারাৎসার।

৪

তাঁর লণ্ডনবাসের দিনগুলোয় লণ্ডনের বাতাসে এই যে সব নতুন হাওয়ার ঝাপটা, তার কোনো স্পর্শই কি ছুঁয়ে যায় নি রবীন্দ্রনাথের চেতনা? অথচ 'চতুরঙ্গে'র দিকে তাকিয়ে আমাদের যেন ভাবতে ইচ্ছে করে, সাহিত্যের সঙ্গে শিল্পকে মিলিয়ে ঐ যুগ্ম-আন্দোলনের সবটাই অজানা নয় তাঁর। নাহলে কোথা থেকে পেলেন নিয়ম-ভাঙার এতখানি দুঃসাহস, তাঁর 'চতুরঙ্গে' ? মাত্র ক-বছর আগের 'গোরা'র সঙ্গে কী চমকে দেওয়া ব্যবধান। 'চতুরঙ্গ' প্রসঙ্গে যখন অভিযোগ ওঠে fragmentary-র তখন কি করে আমরা বুঝে নিতে পারি যে এটা তাঁর সচেতন-প্রয়াসেরই উৎপাদন ? সময়-সঙ্কটের প্রবল চাপে যেন একটা গোটা এবং ঘনবদ্ধ কাহিনী অন্তর্গত বিস্ফোরণেই ফেটে ফেটে ছড়িয়ে ছিটকে চলেছে দ্রুত বেগে ? কেন আমাদের মনে হয় যেন রাসকিন আর রজার ফ্রাইয়ের মতো শচীশ আর শ্রীবিলাস তাদের একই জীবনের ছবিকে দেখতে বা দেখাতে চাইছে দুটো ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে। সেজানের ছবি একটা রঙের উপর পার্শ্ববর্তী অন্য রঙের প্রভাব-প্রতিফলন এনে দিয়েও বস্তুর প্রত্যেকটি ভাগের রঙকে দিতে পারেন প্রাপ্য

স্বাতন্ত্র, 'চতুরঙ্গকে'ও কেন মনে হয় ঠিক যেন সেইভাবেই বোনা? শচীশের চেতনাবৃত্তকে ঘিরে যতখানি জ্যাঠামশাই, ততখানিই স্বামী লীলানন্দ। অথচ শচীশ দুয়ের বাইরে স্বতন্ত্র। দামিনীর অস্তিত্বের আধখানা জুড়ে শচীশ বাকি আধখানায় শ্রীবিলাস। অথচ সে কারোর জীবনেই স্থায়ী ঠাঁই না নিয়ে একলা। শ্রীবিলাস যেন সেজানের ছবির সেই পাহাড়ী উপত্যকার কোনো একটা গাছ, যার উপর দিয়ে ক্রমাগত বয়ে চলেছে আকাশের, মেঘের, পাহাড়ের, পাশের অন্য সব গাছের বহুবর্ণ রঙের প্রতিক্রিয়া। অথচ শ্রীবিলাসের অস্তিত্বে না জ্যাঠামশাই, না লীলানন্দ স্বামী, না শচীশ আর শেষ পর্যন্ত দামিনীকে কাছে পেয়েও এবং পেয়েই হারিয়ে না দামিনী, কেউই ফেলতে পারল না পাকা দাগের ছাপ।

'চতুরঙ্গে'র প্রসঙ্গে, শ্রীবিলাস পর্বের দিকে তাকিয়ে যখন ওঠে 'স্ট্রিম অফ কনশাশনেস'-এর কথা, নিমেষে দেশ কাল পার-হওয়া গতিময়তার প্রসঙ্গে কানে আসে বের্গসঁ-র উল্লেখ, যখন 'নভেলিস্ট এ্যাজ মেডিয়েটর' হওয়ার প্রথা ভেঙে 'চতুরঙ্গে'ই প্রথম জয়েস বা উল্‌ফ বা ডরোথি রিচার্ডসনদের মতোই নিজে উইংস-এর আড়ালে

চলে গিয়ে কাহিনীর চরিত্রকেই মঞ্চের আলোয়
ঠেলে দিলেন অন্তরঙ্গ কথকের ভূমিকায়, তখন
বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে লণ্ডনবাসের দিনগুলোয়
রোদেনস্টাইনের সান্নিধ্যে ঘেরা প্রশান্ত
পরিমণ্ডলের বাইরে যে ঝোড়ো হাওয়ার মাতন,
দূর থেকে হলেও তার খানিকটা গ্রহণ করেছেন
নিশ্বাসে।

হয়তো সমস্তটাই অহেতুক অনুমান।

আবার হয়তো কোনো একদিন আর কেউ নতুন
আলো ফেলবে আমাদের এইসব উৎসুক জিজ্ঞাসার
ধাপগুলোর উপর।